শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩০শ বর্ষ, ৩০শ খণ্ড ১ম সংখ্যা।	বৈশাখ।	১৩৩০ সাল। ১৮৪৫ শকাব্দাঃ

মঙ্গলগীতি।

(লেখক—শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল।)

যাঁহার ইচ্ছায় হয়
সৃজন-পালন-লয়,
পরমা প্রকৃতি যিনি বিশ্ব-প্রসবিনী;
জলে স্থলে শূন্যকোলে
অনলে অনিলে জ্বলে
অচিন্ত্য মহিমা যাঁর দিবস-রজনী;
কভু জননীর বুকে,
কভু স্রোতস্বতী-মুখে,
দয়ার প্রবাহ যাঁর সদা প্রবাহিত;
যাঁহার স্নেহের ছায়া
সন্তানে মায়ের মায়া,
ফলশস্যে যাঁহার করুণা প্রকটিত;

তপনে অনলে আর
চপলা-হৃদয়ে যাঁর
অসীম তেজের ছায়া সদা শোভা পায়;
বিধুর বিমল ভাতি
দেহ-দ্যুতি অনুকৃতি,
ফুলের সুষমা যাঁর সুষমা জানায়;
অসংখ্য নয়ন যাঁর
গগনের অলঙ্কার
নক্ষত্র-আখ্যায় খ্যাত অবনীর মাঝে;
অসংখ্য চরণে যিনি
ত্রিভুবন-বিহারিণী,
অসংখ্য মস্তক যাঁর গ্রহরূপে রাজে;
অসংখ্য করেতে যিনি
জীবোন্নতি বিধায়িনী,
অগম্য যাঁহার তত্ত্ব মনের অতীত;
স্বরূপ-কীর্ত্তনে যাঁর
বাক্ রুদ্ধ বিধাতার,
দর্শন দর্শনে যাঁর সতত বঞ্চিত;
জীব-জনমের আগে
যেই জন স্নেহাবেগে
করেন মাতার স্তনে অমিয়-সঞ্চার,
ভূমিষ্ঠ হইলে পরে
আপনি মায়ের করে
অসহায় শিশুটির পালনের ভার;
অনন্ত যাঁহার লীলা—
বুঝিবার তরে ভোলা
যোগমগ্ন যোগীশ্বর শ্মশান-সদন;
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে
যাঁহার মহিমা সুখে
সনাতন বেদ-গাথা করেন কীর্ত্তন;

বিশ্বপাল নারায়ণ
ধ্যানযোগে অনুক্ষণ
প্রয়াস করেন যাঁর স্বরূপ-দর্শনে ;
মুনি-ঋষি-যোগিজন
অনাশ্রয় অনশন
যাঁর তরে ভ্রমণ করেন বনে বনে ;
জনমিয়া অংশে যাঁর
গার্হস্থের অলঙ্কার—
মাতা পত্নী কন্যাগণ স্নেহ-নিকেতন ;
শেষরূপে ধরাধর,
সূর্য্যরূপে দিবা-কর,
প্রাণরূপে প্রাণি-দেহে যিনি অনুক্ষণ ;
কভু বা মোহিনী বালা
রূপে দশদিক্ আলা
অচল-মহিলা-কোলে উমা সুবদনী,
কভু দক্ষ-সুতা সতী—
দশভুজা ভগবতী—
কভু বা ভীষণরূপা কালী কপালিনী ;
সাধুর রক্ষার তরে,
দুষ্কৃতেরে নাশিবারে,
নানারূপ রূপবতী করেন ধারণ,
কভু পূর্ণিমার শশী,
কভু অমাবস্যা নিশি,
কভু বা রমণীরূপা, পুরুষ কখন ;
সেই ভব-ভাবিনীর
শ্রীচরণ-নলিনীর
মধুপানে মনোভৃঙ্গ মজুক সবার,
মাতিয়া বিষয়-মদে,
ডুবিয়া কলুষ-হ্রদে,
না ভুলে মানবে যেন চরণ তাঁহার ।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চন-যশোলিপ্সার বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও সমালোচনা করিতে যায়। প্রত্যক্ষতঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ না ঘটায় যাহাদের মধ্যে কোন কোন গোপীর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ অনুভব করিয়াছিল, পাঠকগণ বুঝুন ইহা কি সাধারণ নায়ক-নায়িকা-গত প্রেম? কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে, গোপী-প্রেম শিক্ষা! এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় ধীরে ধীরে সেই চরমলক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদনের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা বিদ্যমান। এখানে গুরু শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর, স্বর্গ, সব একাকার। ভয়ের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে, আছে মাত্র প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না; ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। তখন তিনি সর্ব্ব প্রাণীতে কৃষ্ণদর্শন করেন। তখন তাঁহার মুখ কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তখন তাঁহার আত্মা পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহামহিমাময় কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা। যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই ভাব প্রবিষ্ট হইবে, তখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই প্রেম কি বস্তু জানিতে পারিবে। যখন হৃদয়ে অন্য কোন কামনা থাকিবে না, যখন চিত্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইবে, সত্যানুসন্ধান-স্পৃহা পর্য্যন্ত থাকিবে না, তখনই হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে। তখনই গোপীদের অহেতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাই লক্ষ্য। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি এক রকম। সাহেবরাও উহা বড় পছন্দ করেন না।

অমুক পণ্ডিত এই গোপী প্রেমটাকে বড় সুবিধা মনে করেন না। তবে আর কি? গোপীদিগকে যমুনার জলে ভাসাইয়া দাও। সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টিকেন কি করিয়া? মহাভারতের দুই এক স্থল,—সেগুলিও বড়

উল্লেখযোগ্য স্থল নহে,—তা ছাড়া গোপীদের প্রসঙ্গই নাই। কেবল দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে শিশুপাল বধে, শিশুপালের বক্তৃতায়, বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র। এ সবগুলি প্রক্ষিপ্ত। সাহেবরা যাহা না চায় সব উড়াইয়া দিতে হইবে। গোপীদের কথা, এমন কি কৃষ্ণের কথা পর্য্যন্ত প্রক্ষিপ্ত। যে সকল ব্যক্তি এইরূপ বণিকবৃত্ত, যাহাদের ধর্ম্মের আদর্শ পর্য্যন্ত ব্যবসাদারিতে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাদের সকলের মনোভাব এই যে, তাহারা ইহলোকে কিছু করিয়া স্বর্গে যাইবে। ব্যবসাদার সুদের সুদ, তস্য সুদ, চাহিয়া থাকে। তাহারা এখানে এমন কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া যাইতে চায়, যাহার ফলে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করিবে। ইহাদের ধর্ম্ম প্রণালীতে গোপীদের অবশ্য স্থান নাই। সেই আদর্শ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া নিম্নস্তরে নামিয়া একবার গীতা-প্রচারক কৃষ্ণের কথা আলোচনা করা যাক্। এখানেও আমরা দেখিতে পাই, গীতার ন্যায় বেদের ভাষ্য আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য্য বুঝা বড় কঠিন, কারণ, নানা ভাষ্যকার সকলেই নিজ নিজ মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা সেই ভগবান স্বয়ং আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন। আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা প্রণালীর যেমন প্রয়োজন আর কিছুই তত নয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরবর্ত্তী শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতৃগণ এমন কি গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবদুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

গীতায় বেদের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে, এমন কি, কর্ম্মকাণ্ড পর্য্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে। আর ইহা দেখান হইয়াছে যে, কর্ম্মকাণ্ড সাক্ষাৎভাবে মুক্তির সাধন নহে, গৌণভাবে মুক্তির সাধন, তথাপি উহা সত্য, মূর্ত্তিপূজাও সত্য, সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য। কেবল একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয় তবেই উপাসনা সত্য হয়। আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট দুষ্ট লোকের কৃত। তাহারা কিছু অর্থ লালসায় এই সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। একথা একবারে ভ্রমসঙ্কুল। জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রয়োজনে ঐ গুলির সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা-নিবৃত্তি করিবার জন্য সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। যতদিন সেই প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তাহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিলেও তাহা থাকিবে। তরবারি বন্দুকের সাহায্যে জগৎকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিলেও প্রতিমা-পূজা থাকিবেই থাকিবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান

পদ্ধতি, ধর্ম্মের বিভিন্ন সোপান সকল অবশ্যই থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে আমরা বুঝিতে পারি সেগুলির কি প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই ভারত ইতিহাসের এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমরা গীতাতেই সম্প্রদায় সমূহের বিরোধ কোলাহলের দূর প্রতিধ্বনি শুনিয়া থাকি। আর সেই সামঞ্জস্যের অদ্ভুত উপদেষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাঝে পড়িয়া বিরোধভঞ্জন করিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—

মযি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণাইব। (গীতা)

যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই সমস্ত ওতপ্রোতভাবে আছে। সম্ভবতঃ ভগবানের উপদেশে এ বিরোধ কিছুকাল মন্দীভূত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে তুমুল জাতিগত বিরোধ উপস্থিত হইল। আর সহস্রবর্ষ ধরিয়া সে তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসাইয়াছিল। তাহার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আমরা এক মহা মহিমাময় মূর্ত্তি দেখিতে পাই। তিনি আর কেহ নহেন, আমাদেরই গৌতম শাক্য মুনি। আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করি। তিনি কর্ম্মযোগীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কৃষ্ণই যেন নিজের শিষ্যরূপে তাঁহার নিজ মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। আবার সেই বাণী আবির্ভূত হইল, যাহা গীতায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

এই ধর্ম্মের সামান্য অনুষ্ঠান করিলেও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে। শ্রীকৃষ্ণের বজ্র-গম্ভীর মহতী বাণী, সকলের বন্ধন, সকলের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দেয়, সকলেরই সেই পরম পদ লাভের ঘোষণা করে।

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

যাহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম, সমভাবাপন্ন ও নির্দ্দোষ; সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
নহিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং।

পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সমস্থিত দেখিয়া তিনি আপনার দ্বারা আর আপনার হিংসা করেন না, সুতরাং পরম গতি লাভ করেন। এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গীতার উপদেষ্টাই আবার অন্যরূপে মর্ত্ত্যধামে আসিলেন। ইনি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেই জন্য দেবভাষা পর্য্যন্ত

ত্যাগ করিলেন। ইনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া সামান্য দরিদ্র ভিক্ষুকদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ইনি দ্বিতীয় রামের ন্যায় চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু মহা মহিমাময় শাক্য মুনির সম্প্রদায় মধ্যে অনেক অসভ্য অশিক্ষিত জাতি স্থান পাইল। তাহারা মহামুনির উপদেশ ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষাগত কুসংস্কার ও বীভৎস উপাসনা-পদ্ধতি কিছুদিন পরেই চালাইতে লাগিল। এইরূপে ভারত কুসংস্কারের পূর্ণ লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। এই সময় যজ্ঞাদি ক্রিয়া লোপ পায়; তৎপরিবর্ত্তে বড় বড় ঐশ্বর্য্যশালী অনুষ্ঠানপদ্ধতি, আড়ম্বরপূর্ণ পুরোহিতদল, বড় বড় মন্দির আবির্ভূত হইল। এইরূপে সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্মরূপ প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। আর চূর্ণ হইবার পর যে ভগ্নাবশেষ রহিল তাহা অতি বীভৎস। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির ফলে যে বীভৎস ব্যাপারসকল আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করিবার প্রবৃত্তি নাই। অতি বীভৎস অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থসমূহ, যাহা মানুষের হাত দিয়া আর কখনও বাহির হয় নাই; অথবা মানব-মস্তিষ্ক আর কখনও কল্পনা করে নাই—অতি ভীষণ অনুষ্ঠানপদ্ধতি যাহা আর কখনও ধর্ম্মের নামে চলে নাই, এ সবই অবনত বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি। কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল। যিনি বলিয়াছিলেন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই আসিয়া থাকি, তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের লেখায় আধুনিক সভ্যজগৎ বিস্মিত হইয়া আছে, এবং তিনি স্বয়ংও অদ্ভুত প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। মহা দার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই।

তবে বুদ্ধদেবের শিষ্য প্রশিষ্যগণ আচার্য্যদেবের উপদেশের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া নিজেরা হীনাবস্থ এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক হইয়াছিল। শঙ্কর ইহাই দেখাইলেন; তখন সকল বৌদ্ধই তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা এই সকল অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সেগুলির সম্বন্ধে কি হইবে, এই এক মহা সমস্যা সমুপস্থিত হইল। তখন মহানুভব রামানুজের আবির্ভাব হইল। শঙ্কর মহামনীষী ছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার হৃদয় রামানুজের ন্যায় প্রশস্ত ছিল না। কারণ যে সকল নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি দাঁড়াইয়াছিল, রামানুজ, সেইগুলি লইয়া যথাসাধ্য তাহাদের সংস্কার করিলেন। এবং নূতন নূতন উপাসনাপদ্ধতি

সৃষ্টি করিয়া যাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহাদের জন্য ঐ "সকল" উপদেশ করিতে লাগিলেন। এই সময় মধ্বাচার্য্য, নিম্বাদিত্য প্রভৃতি কতিপয় আচার্য্য উক্তভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন ; শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি সমগ্রদেশে প্রেম ভক্তি প্রচার করেন। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না, সাধু, পাপী, হিন্দু, মুসলমান, পবিত্র, অপবিত্র, বেশ্যা, পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল। যদিও তৎপ্রণীত সম্প্রদায় ঘোর অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবুও উহা আজ পর্য্যন্ত অনন্যোপায় পতিতের আশ্রয়স্থল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, দ্বৈতবাদী ছিলেন। জীব, ঈশ্বরের নিত্যদাস, ইহাই তাঁহার অভিমত। তবে বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে শান্ত দাস্যাদি পাঁচ প্রকার ভাব কথিত হয়, তন্মধ্যে মহাপ্রভু মধুর ভাবের আধার-ভূত ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দীর্ঘকাল পুরীধামে বাস করেন, সুতরাং তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গলিত সারতত্ত্ব তদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দ সংগ্রহ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তথা হইতে বহুতর বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণ-স্পর্শে বঙ্গভূমি চরিতার্থ হইয়াছে। তিনি প্রেমভক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, যেমন তীব্র বৈরাগ্য, যেমন ত্যাগ, তেমনি প্রেম। তিনি নিজে কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার শিষ্যগণই তাঁহার অভিপ্রায় মত বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কাম, কামিনী, কাঞ্চন, মনেও স্থান না পায় ইহাই তাঁহার অভিমত। বাসনার গন্ধ পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকিলে ভগবল্লাভ হইবে না, ইহাই তাঁহার মত। মহর্ষি নারদ কৃত ভক্তিসূত্রের তাৎপর্য্যানুযায়ী তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলেন নাই, বরং চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন। ভগবান নিশ্চয়ই আছেন এবং তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে, তখন ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে। সাক্ষাৎকার হইলে প্রাণে অপার শান্তি আসে। তখন ক্রিয়া কলাপ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি সমস্তই আপনা হইতে পরিত্যক্ত হয়। তাহাতে কোনও দোষ নাই। ভবতিনিশ্চয়দার্ঢ্যাৎ সর্ব্বশাস্ত্রসংরক্ষণং। ভগবান নিশ্চয়ই আছেন এমত দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়া গেলে, আর কোনও কর্ত্তব্য অবশেষ থাকে না। তাহা হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। বৌদ্ধযুগের পর শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যদিও অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে ভারতে প্রচার হইয়াছিল, ইহা সত্য ; কিন্তু তাঁহার

তিরোভাবের পরেই আবার ভারতে সেই বৌদ্ধযুগের বীভৎস বামাচার মত প্রচারিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের দাস মানুষ, দলে দলে সেই দিকে ঝুঁকিতে লাগিল। ক্রমশই দল পুষ্ট হইতে লাগিল।

সমাজের সেই দারুণ শোচনীয়াবস্থায়, দুই একটী মহানুভব সাধু মহাত্মা প্রাণের সহিত ভগবানের নিকট যুগাবতারের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ভক্তের প্রাণস্পর্শী আহ্বানে ভগবান যুগধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীনবদ্বীপ ধামে শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সময় শাস্ত্রীয় বোধে এমন কি পণ্ডিত-সমাজেও মদ্য-মাংসাদি চলিতেছিল। মানুষ যেটী প্রিয়বোধে মরণ কামড়ে কামড়াইয়া ধরে, তাহার সমর্থনার্থ সে অশেষ যুক্তি প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। এই সময়, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের বৈধত্ব প্রমাণের জন্যও তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এমন কি তান্ত্রিক আচার ব্যবহার তখনকার মানুষের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে, মস্তকোপরি তীক্ষ্ণধার খড়্গ উত্থিত হইত। এই ভয়ঙ্কর সময়ে, আচণ্ডাল পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি বিতরণ করিবার জন্য অপার করুণাসিন্ধু, বঙ্গ-গগন-ইন্দু, শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

কি অদ্ভুত সাহস! ঐ সময় সমাজে ঐরূপমত প্রচার করা অসীম সাহসের পরিচয়। তবে, ঐ কার্য্যের জন্য বিপক্ষদল তাঁহাকে বাধা দিতে কিছুমাত্র বাকী রাখে নাই। এমন কি রাজকীয় সাহায্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু যাহা সত্য, যাহা পবিত্র, তাহার গতি দুর্নিবার। কেহই তাহাতে বাধা জন্মাইতে পারিল না। দলে দলে লোক, তাঁহার শান্তিময় ভুক্ততরুচ্ছায়ায় আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। সে প্রবল প্রবাহ সমগ্র দেশ ভাসাইয়া লইয়া গেল। সবাই শান্তির সুখ-সমীরণ উপভোগ করিতে লাগিল। সবাই বুঝিল তুল্যরূপে সবাই ধর্ম্মের অধিকারী। শ্রীমহাপ্রভু সমগ্র জগতে প্রেমভক্তির প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি লোক-পূজ্য। স্বল্পায়ুঃ আধিব্যাধি-নিপীড়িত কলিযুগের মানবের উপযোগী ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি গোঁড়া, বেদোক্ত আশ্রম-ধর্ম্ম নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অনুষ্ঠানমাত্রই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তাহা উঠিয়া গেলে ক্ষতি কি? অমৃত, উদরে না গিয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত গেলে, তাহাতে অমরত্ব জন্মে না। চিরকালে কতকগুলি লোককে অষ্ট-নাগপাশে বাঁধিয়া

রাখিয়া আমরা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিব, এ উদ্দেশ্য সৎ নহে। যাহা সত্য, তাহা কোনরূপেই অপ্রকাশিত থাকিবে না। মহাপ্রভু সত্য ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন, ভগবল্লাভের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এবং কলিযুগে ভক্তিই শক্তিহীন মানবের প্রকৃত সিদ্ধিলাভের উপায়, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

(ক্রমশঃ)

শক্তির দ্বন্দ্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

(লেখক—শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।)

প্রলয়ের পূর্ব্বে অনুকূল শক্তি আপনার স্ফীত অস্বাভাবিক দেহভার লইয়া অক্ষমের মত বসিয়া থাকে। সুখ শান্তির নামে ঔদাসীন্য, আলস্য ও জড়তারই সেবা করে। তখন প্রতিকূল শক্তি নববলে বলীয়ান হইয়া সেই অনুকূল শক্তিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। জড়বৎ অনুকূল শক্তি প্রতিকূল শক্তির করাল আলিঙ্গনে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয়। প্রলয়কালে অসুর-গণের পূর্ণ প্রতাপে দেবতারা পরাজিত। দেহাত্মবাদের পাদমূলে আধ্যাত্মিকতা নতশিরে দণ্ডায়মান। বাহ্য ভোগেরই সম্পূর্ণ প্রাবল্য। দেবতাদের মধ্যে কতকগুলি অসুরগণের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া বিজন অরণ্যে লুকাইয়া রহিল। কতকগুলি বা অসুরগণের অনুগত হইয়া তাহাদের নিকট মস্তক বিক্রয়করতঃ ক্রীতদাসের মত সেবা করিতে লাগিল। হৃদয়-রাজ্যের অসুর কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ হুহুঙ্কারে দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। আধ্যাত্মিক দেবতা দয়া, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা,-সংযম, ত্যাগ ও বস্তুবিচার প্রভৃতি সঙ্কুচিত হইয়া এক পার্শ্বে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রলয় আসিল। বন্যা, ঝটিকা, ভূমিকম্প, অগ্নিবৃষ্টি, বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত হইতে লাগিল। একই আকাশে এক স্থানে দ্বাদশ আদিত্যের অভ্যুত্থান। ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর একত্র একসঙ্গে আবির্ভাব। আবর্ত্ত সংবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘ-দলে অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন। চারিদিকে উল্কাপিণ্ড জ্বলিতেছে। গ্রহসমূহ বিপর্য্যস্তভাবে

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। শত শত ধূমকেতু পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আছে। নক্ষত্রপাতে পৃথিবী চূর্ণিত হইতেছে। সমস্ত পৃথিবী রসাতলে নামিবার উপক্রম করিতেছে। দেব-প্রকৃতিও তখন দানব-ভাবাপন্ন হইয়াছে।

প্রলয়ের দেবতা মহাদেব তখন ত্রিশূল-হস্তে তাণ্ডবনৃত্যে উন্মত্তপ্রায়। রক্ষা-কর্ত্তা বিষ্ণু সেই ধ্বংস-প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম উপাদান-রূপ কারণ-সলিলে অনন্ত শয্যায় শয়ান। শ্রীভগবান্ তখন শিশুর মত সেই কারণার্ণবে ভাসমান। এ এক অদ্ভুত কল্পনা !

হৃদয়-রাজ্যে ঐ একই দ্বন্দ্ব — আমাদের হৃদয়-রাজ্যে ঐ একই দ্বন্দ্ব। হৃদয়ের মধ্যে দুইটী বৃত্তি—সুবৃত্তি ও কুবৃত্তি। সুবৃত্তি অনুকূল শক্তি, কুবৃত্তি প্রতিকূল শক্তি। সুবৃত্তি সৎবৃত্তি, প্রকাশশীল বলিয়া দেবতা, (দ্যোতনশীল) অন্তঃকরণের রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া দেবতা ; কুবৃত্তি অসৎ বৃত্তি—অসুর (অসূন্ প্রাণান্ রাতি ক্লিশ্যতি যঃ সঃ অসুরঃ) প্রাণকে ক্লিষ্ট করে বলিয়া ক্রোধাদি রিপুগণই অসুর। অন্তঃকরণকে ক্লিষ্ট করিয়া আত্মাকে পর্য্যন্ত পতিত করে বলিয়া দৈত্য দানব পদবাচ্য। এই উভয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব প্রতি নিয়তই ঘটিতেছে। কখনও সৎবৃত্তি জয়ী, কখনও বা অসৎ বৃত্তি জয়ী। প্রথম পাপ করিবার সময় সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব মনে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সৎকার্য্য বা অসৎকার্য্য করিবার সময় দুইটী মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব বিধাতার বিধানে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। তুল্যবল স্থলে কোন বৃত্তি জয়ী কোন বৃত্তি বিজিত হয় না। তুল্যবল হইলে ঔদাস্য ও জড়তা আসিয়া এমন ভাবে বুদ্ধি-বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তখন যে কেহ যে দিকেই লইয়া যাইতে চাহে অনায়াসেই তাহাকে সেই দিকেই লইয়া যাইতে পারে। আর কুবৃত্তির পরাজয়ে সুবৃত্তির জয়। ফলে কর্ত্তা পাপমুখ হইতে প্রত্যাগমন করে। আবার সুবৃত্তির পরাজয়ে কুবৃত্তির জয়—তখন পাপপঙ্কে অধিকতর নিমজ্জিত হইয়া থাকে। প্রথম পাপ করিবার কালে অনেকে বিবেকের অস্ফুট বাণী—(অস্ফুটভাবে) শুনিতে পান, কিন্তু তাঁহারা শুনিতে পান না—যাঁহাদের প্রকৃতি পাপময়ী হইয়া গিয়াছে, জন্মান্তরীণ সুদৃঢ় সংস্কার মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। সে স্থলে পাপী আপনার কৃত পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে না। আপনার দারুণ দুর্দ্দশাতেই সন্তুষ্টবৎ থাকে। তাহাদের মনে পাপ কার্য্যের জন্য সেইরূপ অনুতাপ হয় না। তাহাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয় না।

রাজ্যে ঐ একই দ্বন্দ্ব } পার্থিব রাজ্যে ঐ একই শক্তির দ্বন্দ্ব। ভারতীয় আর্য্যগণ অনুকূল শক্তির ফল ঋদ্ধি বৃদ্ধিলাভ করিয়া পরম ফল শান্তি ও সন্তোষাদির অধিকার পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি অন্তর্ম্মুখীন, ... ধর্ম্মভাবপূর্ণ, বুদ্ধি সম্যক্ বিশুদ্ধ হইয়াছিল। অনুকূল শক্তির শুভফল প্রথম সুখ, সন্তোষ ও সহিষ্ণুতা। শেষফল বশিত্বাদি ঐশ্বর্য্য, অন্তর্ম্মুখিতা ও ধর্ম্মানুরক্তি। কিন্তু অনুকূল শক্তির সম্পূর্ণ সম্প্রসারণে সেই ভারতীয় আর্য্যের বংশধরগণ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত, সন্তোষে, সুখে, শান্তিতে লালায়িত, পার্থিব ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়িল। প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ তখন নাই, ক্রমে তাহারা স্থিতিশীল সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে লাগিল। প্রকৃতির বিধানে প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্বের অভাবে অনুকূল শক্তি ক্রমে অনাবশ্যক স্ফীত, স্থূল হইতে আরম্ভ করিল। স্থিতিশীলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, শান্তি ও সন্তোষ পার্থিব ব্যাপারে উদাসীনতা আনিয়া দিল। অনুকূল শক্তির পরিণতি অবস্থার যাহা ফল তাহা ফলিল। আর্য্যবংশধরগণ তখন ধর্ম্মভাবান্বিত, সুখী ও শান্তিপ্রিয় হইয়া শেষে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম হইয়া পড়িল। যেখানে প্রতিকূলতা নাই, বাধা নাই, সেখানে বস্তুর স্থায়িত্ব সম্ভবপর হয় না। বাধা বিঘ্ন বস্তুর বিকাশকে যেমন প্রতিহত করে, আবার বাধার অভাবও তদ্রূপ বস্তুর স্থায়িত্বকে নষ্ট করে। বাধার অভাবে কোন বস্তুরই কালের কষ্টি পাথরে বহুদিনব্যাপী রেখা অঙ্কিত থাকে না। বাধা বিঘ্ন প্রতিকূল শক্তিরই কার্য্য। যদি কোন বাধা, কোন প্রতিযোগিতা না থাকে, তবে কালে তাহার পরাভব ও অধঃপতন অনিবার্য্য। যে রাজ্যে সহজেই জীবিকা উপার্জ্জন হয়, সকল দিকেই সুখ শান্তি বিরাজ করে, কোনরূপ অত্যাচার উপদ্রব, যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকে, কোন্ বাধা ও প্রতিযোগিতা না দেখা দেয়, সেই রাজ্যে স্থিতিশীলতা, ধর্ম্মপ্রবণতা, সুখ শান্তি, সন্তোষ সহিষ্ণুতা, শেষে আলস্য ঔদাসীন্য আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। তখন সেই দেশের অধিবাসীরা সত্বরই অলস, বিলাসী, ভীত, যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে অনিচ্ছুক, শেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেই দেশে আপাততঃ সুখ শান্তি দেখা দেয় বটে, কিন্তু সেই সুখ শান্তি আবার নাশের কারণ হইয়া থাকে। নব উদীয়মান প্রতিকূল শক্তি আসিয়া যখন উপস্থিত হয় তখন আর তাহাকে রোধ করিবার কাহারও শক্তি থাকে না। অনুকূল শক্তি তখন অনাবশ্যক স্ফীত ও বর্দ্ধিত দেহভার লইয়া পঙ্গুর মত বসিয়া থাকে। অধিবাসীরা জড়বৎ অবস্থিতি করে। তখন দেশের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা নষ্ট হইয়া যায়; আলস্য, ভীরুতা, জাড্য ও

উদাসীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আমোদে-প্রমোদে বিলাসে জাতি ডুবিয়া থাকে।

আদর্শ রাজকীয় মহাসভাতেও এই শক্তির দ্বন্দ্ব। সাধারণতঃ রাজ্য-শাসননীতি পরিচালনা করিয়া থাকে অনুকূল শক্তি। আর প্রতিকূল শক্তি যেমন অনুকূল শক্তির স্বচ্ছন্দগতির বাধা উৎপন্ন করে, তদ্রূপ স্বেচ্ছাচারের পথে বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া থাকে। শেষে একটী সুন্দর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় আনিয়া দেয়। বিরোধী শক্তি না থাকিলে অনুকূল শক্তির দ্বারা বহুদিন সুফলের আশা করা যায় না।

সৃষ্টি যতদিন বিদ্যমান, বুঝিতে হইবে যে অনুকূল শক্তি মোটের উপর জয়যুক্ত হইতেছে। অনুকূল শক্তির সম্প্রসারণ কাঙ্ক্ষনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিকূল শক্তির বিলোপ ঘটান উচিত নহে। বিরোধী শক্তির রক্ষা অনুকূল শক্তির স্থায়িত্বের জন্যই আবশ্যক।

পুরাণে দেবাসুর যুদ্ধ অনুকূল শক্তি ও প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্বই সূচিত করে। এই সংঘর্ষে সাধারণতঃ দেবতারা জয়লাভ করে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে পরাজিত, স্বর্গচ্যুত, তেজঃশূন্য দীনহীনের মত কাল যাপন করিতে হইত। দেবগণ যখন অভিমানে আত্মহারা হইয়া বিলাস মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া বাহ্য সুখভোগে উন্মত্ত হইতেন, তখনই দানবগণের ভীষণ হুহুঙ্কার শুনা যাইত। তখন দানব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবতাদিগের বিলাসমোহ ছুটিয়া যাইত, অভিমান অহঙ্কার দূর হইয়া যাইত। ফলে তখন দেবতাদের দেবতাত্ব ফিরিয়া আসিত। যে কল্যাণের পথ হইতে দেবতারা ভ্রষ্ট হইতেন, আবার সেই কল্যাণের পথে চলিয়া আপনাদিগকে অমরপদে আরূঢ় থাকিবার যোগ্য করিতেন। এইরূপে দেবতাত্ব রক্ষা পাইত। বিশ্বদেবের রোগ বিদূরিত হইয়া পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিত। রক্তিম লাবণ্য আবার মুখে চক্ষুতে দেখা দিত। অনুকূল শক্তি প্রকৃতপক্ষে জয়যুক্ত হইত, তখন আবার প্রতিকূল শক্তি কিছুকালের জন্য বলহীন থাকিয়া অনুকূল শক্তির অধীনে আসিয়া সৃষ্টিরক্ষার উপকার করিত। এই অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির রহস্য বস্তুতই অবোধগম্য। অনুকূল শক্তির দেবতা বিষ্ণু যেমন আমাদের শ্রীভগবান, উপাস্য। প্রতিকূল শক্তির দেবতা মহাদেবও আমাদের শ্রীভগবান্, উপাস্য। সৃষ্টি যতদিন বিদ্যমান, ততদিন ব্যবহারিক ভেদেরই আরোপ। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুও যে, মহাদেবও সে, একই শ্রীভগবান্। অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি একই মহাশক্তির দুইটী দিক্

মাত্র। যিনি মহামেধা, মহাস্মৃতি, তিনি আবার মহামোহে, মহারাত্রি। যিনি যোগিনী তিনিই আবার কালরাত্রি। যিনি সৃষ্টি-স্থিতিকারিণী তিনিই আবার সংহাররূপা। একই মহাশক্তি কোথাও অনুকূল শক্তিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-বিধায়িনী, কোথাও বা প্রতিকূল শক্তিরূপে সংহারকর্ত্রী। পরমার্থতঃ দুইই এক, ব্যবহারতঃ দুইই ভিন্ন মাত্র।

আত্মা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান সরস্বতী তত্ত্বনিধি কাব্যভূষণ কাব্যতীর্থ।

(৫১)

মিশে যথা পাত্র সব পাইলে বিনাশ
জলে জল তেজে তেজ আকাশে আকাশ
মুনির উপাধি তথা পাইলে বিলয়
নির্ব্বিশেষে একমাত্র ব্রহ্মে পান লয়।

(৫২)

যেই লাভ হতে লাভ নাহিক অপর
যেই সুখ হতে সুখ নাহি কোন স্থান
যেই জ্ঞান হতে আর নাহি কোন জ্ঞান
সেই খাঁটি ব্রহ্মতত্ত্ব পরম অক্ষর।

(৫৩)

দৃশ্য নাহি থাকে যার করিলে দর্শন
যা' হলে কিছুই হতে হয় না কখন
যাহারে জানিলে আর বেদ্য নাহি রয়
তাহারেই ব্রহ্ম বলে জ্ঞান যেন হয়।

(৫৪)

উর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দিকে যিনি অবস্থিত
অদ্বয় সচ্চিদানন্দ পূর্ণ বিরাজিত;

অনন্ত স্বরূপ ব্যাপ্ত যিনি সর্ব্বক্ষণ
একমাত্র ব্রহ্ম তারে করিবে ধারণ।

(৫৫)

অতদ্‌ব্যাবৃত্তিরূপে বেদান্তে নির্ণীত
অখণ্ড আনন্দরূপ দ্বিতীয়-রহিত
স্বজাতীয় ভেদশূন্য যিনি সর্ব্বক্ষণ
তাহারেই ব্রহ্ম ব'লে করিবে চিন্তন।

(৫৫)

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ
উপাধির অনুরূপ যথাযুক্ত যার
পরিপূর্ণ আনন্দের কণা মাত্র তার
প্রাপ্ত হয়ে অতিশয় পরিতৃপ্ত হন।

(৫৭)

সংযুক্ত নিখিল বস্তু পরম আত্মায়
তাহাতে অন্বিত হয় যত ব্যবহার
সর্ব্বাংশে ব্যাপিয়া ঘৃত দুগ্ধে যে প্রকার
সর্ব্বগত ব্রহ্ম স্থিত ব্যাপি সমুদয়।

(৫৮)

অক্ষুদ্র অস্থূল অজ যে বস্তু অব্যয়
অহ্রস্ব অদীর্ঘ আর যাহা লিপ্ত নয়
রূপ গুণ বর্ণ আদি উপাধি নিকরে,
তাহারেই ব্রহ্ম বলে জানিবে অন্তরে।

(৫৯)

ভাস্করাদি প্রকাশিত যাহার প্রভায়
কিন্তু তারা প্রকাশিতে নাহি পারে যায়
সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত প্রকাশে যাঁহার
তাহারেই কর জ্ঞান ব্রহ্ম বস্তু সার।

(৬০)

প্রতপ্ত লৌহের পিণ্ডে অনল যেমন
অন্তর্ব্বহিঃ ব্যাপ্ত থাকি প্রকাশিত হয়

নিখিল জগত ব্যাপ্ত রহিয়া তেমন
আপনি প্রকাশ পান ব্রহ্ম সর্ব্বময়।

(৬১)

দৃশ্যমান বস্তু হতে ব্রহ্ম বিলক্ষণ
ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাহিক কখন
ভ্রমহেতু ব্রহ্ম বিনা যাহা দেখা যায়
মিথ্যা বলে জান মরু-মরীচিকা প্রায়।

(৬২)

যাহা শুনি যাহা দেখি ব্রহ্ম সমুদয়
ব্রহ্ম বিনা কিছু নাহি হলে জ্ঞানোদয়
মনে হয় জগতের যা কিছু সকল
অদ্বয় সচ্চিদানন্দ আত্মাই কেবল।

(৬৩)

ব্রহ্ম তার দৃশ্য হন জ্ঞান চক্ষু যার,
পায় না দেখিতে অন্ধ সূর্য্যে যে প্রকার
কিন্তু সূর্য্য নিত্য রহে যথা বিরাজিত
অজ্ঞানান্ধে তথা ব্রহ্ম নহে প্রকাশিত।

(৬৪)

শ্রবণাদি-সন্দীপিত জ্ঞানের অনল
জীবের অজ্ঞান মল করিলে বিনাশ
যথা শোভা পায় শুদ্ধ স্বর্ণ নিরমল
স্বয়ং বিশুদ্ধ জীব হয় সুপ্রকাশ।

(৬৫)

হৃদয়ে উদিত আত্মা জ্ঞানসূর্য্য প্রায়
অজ্ঞান তিমির রাশি করেন বিনাশ
সর্ব্বধারী আত্মাস্থিত ব্যাপি সমুদয়
আত্মই সকল বস্তু করেন প্রকাশ।

(৬৬)

দিগ্‌দেশ কালাদিতে
অনপেক্ষ নিরঞ্জন

ক্রিয়াহীন সর্ব্বগত
শীত-গ্রীষ্ম-বিনাশন
নিত্যসুখ স্বার্থতীর্থে
করেন ভজনা যিনি
সর্ব্বজ্ঞানী সর্ব্বগত
মৃত্যুহীন হন তিনি।

হিন্দুর পরিণাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিকদার

মহামিলনের পথে বাধা আচার ব্যবহার আহার্য্যাদি। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর শাস্ত্রাদি-নিহিত সার সত্য বেদ-বিরোধী নহে। এই সব কারণে অপরকে নিজ ধর্ম্মামৃতদানের পথে বাধা কোথায়? অপরকে ধর্ম্মদান দ্বারা ধর্ম্মের পথে, অমৃতের পথে লইয়া যাওয়া ধর্ম্মলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। কৃষ্ণ গীতায় বলেন—

"য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥

যিনি আমার এই পরম গুহ্যতত্ত্ব অপরকে বুঝাইয়া দিবেন তিনি আমাকে পাবেন এবং মনুষ্যলোকে তাহা অপেক্ষা আমার প্রিয় আর কেহ নাই। হিন্দুর মহতী শিক্ষা, অপূর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম সমন্বয় জগতের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণ্যে বিতরণ করিতে হইবে। তোমার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামানুজ, নানক, কবীর প্রেমের পথ—নিষ্কাম কর্ম্মের পথ—জীবনের পথ, আত্ম-প্রসারণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তোমার সম্মুখে এক-দিকে তাঁদের নির্দ্দেশিত অমৃতের পথ, আর একদিকে ক্ষুদ্রতার পথ, মৃত্যুর পথ—সয়তান-নির্দ্দেশিত হীন স্বার্থপরতার পথ। এখন কোন্ পথে যাইবে? একদিকে আনন্দ, অমৃত, জীবন, আর দিকে ধ্বংস। যদি বাঁচিতে চাও, তবে

৩

মহাপুরুষের অবলম্বিত আদর্শ গ্রহণ কর, তাঁদের নাম লইয়া সয়তানের কূপ-মণ্ডূকের পথ ত্যাগ কর; আর যদি কূপ-মণ্ডূকের পথে যাও তবে ইহলোকে দুঃখ ও মৃত্যু, পরলোকে নরক! তুমি যাহা চাহিবে, অবলম্বন করিবে, কল্পতরুর নিকট তাহাই পাইবে। তোমার বর্ত্তমান, তোমার অতীত কর্ম্মের ফল, ভবিষ্যতের স্থষ্টিকর্ত্তা তোমার বর্ত্তমান কর্ম্ম।

জগৎবাসী যুদ্ধ-বিগ্রহে বিধ্বস্ত—তাহাদের পরিত্রাহি আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ-প্রায়। তবুও শকুনী গৃধিনীর মত পরস্পরের মাংস উদরস্থ করিতে পরস্পরের প্রতি ধাবিত। তোমার মহতী শিক্ষাই তাহাদিগকে বাঁচাইতে সমর্থ। তাহারা তোমার ভাবের ভিখারী। তোমার অহিংসা প্রেম ত্যাগ—তোমার অপূর্ব্ব আবিষ্কার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জগতবাসীকে দিবার জন্য তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ। তুমি ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অধ্যাত্ম জীবন তোমার আদর্শ। অধ্যাত্ম জীবনই তোমার পরম গতি। এখানে তোমার জীবনীশক্তি নিহিত। তোমার জাতীয় বিশেষত্ব, তোমার ক্ষাত্রতেজ, বৈশ্যসম্পদ্, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞানের নিম্নে এবং তল্লাভের সহায়ক। শূদ্রত্ব, বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, ব্রাহ্মণত্ব জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির পথের ক্রমোন্নত স্বাভাবিক বিভাগ মাত্র। তুমি জান আত্মা দেহ ও মনের মধ্য দিয়া কার্য্য করে; তাই দেহ ও মনের উন্নতি আত্ম-সাক্ষাৎকার পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য।

জ্ঞান কর্ম্ম প্রেমের সুমনোহর সমন্বয় তোমারই পূর্ব্বপুরুষগণ জগতে সর্ব্বপ্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তোমারই পূর্ব্বপুরুষগণ বিভিন্ন প্রকৃতির জাতিগণের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন যাহাতে সকল প্রকৃতির মানবই মঙ্গলের পথে যেতে পারে, উচ্চতম আদর্শকে লাভ করিতে পারে। তাহা মাত্র শুধু প্রেমের দ্বারা বিভিন্ন জাতিকে এক মহান সভ্যতার মধ্যে একীভূত করিয়াছিলেন। এ মিলন যুগে যুগে সাধিত হইয়াছে। আজ ভারতে বিধাতার কৃপায় জগতের সকল জাতি উপস্থিত। আবার হিন্দুই মাত্র সকল প্রকৃতির মানবকে আশ্রয় দিতে সমর্থ। এখানে সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইলে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা এক জটিলতম প্রশ্নের মীমাংসা সাধিত হয়। তোমারই শ্রীকৃষ্ণ তৎকাল প্রচলিত সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করেন। বর্ত্তমানে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ার্থ রামকৃষ্ণের আগমন। বেদ বেদান্ত গীতাদি নিহিত সত্যসমূ তুমি দায়স্বরূপে পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ। এ পিতৃঋণ তোমাকে শোধিতে হইবে; নচেৎ তোমার জীবন ব্যর্থ। জগৎবাসীকে তোমার

ও মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষীভূত সত্যসমূহ দান না করিতে পারিলে তোমাকে জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। যেদিন হইতে ঋষি ও অবতার পুরুষগণের স্থাপিত আদর্শ তুমি ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, বেদ পদদলিত হইয়াছে, অবতার পুরুষগণের পূজার ভাণে বা তদাবরণে ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাচারিতার পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছ, সেইদিন হইতে তোমার ইহজীবন লাঞ্ছনাময় ও পরজীবন অন্ধকারময়। মহাপুরুষগণের শুধু নাম উচ্চারণে তাঁহারা ভুলেন না, তাঁহাদের আদর্শের গ্রহণ চাই, তবেই মঙ্গল লভ্য। তোমাদের পাপ কোথায় পরীক্ষা করে দেখ; তারপর প্রতিকার ক'রে বীরের মত মঙ্গলের পথে অগ্রসর হও।

পাপাচরণ যেমন পাপ, পাপের প্রশ্রয় দেওয়াও তেমন পাপ। ভীতি দুর্ব্বলতা তামসিকতা-প্রসূত ও তাহা জড়ত্বে পরিণত করে, তাই পাপ। হে হিন্দু! উঠ, জাগো, কল্যাণের পথে অগ্রসর হও, মঙ্গলময় বিধাতা সহায় হবেন। আর ক্ষুদ্র স্বার্থসেবা-রত হইয়া মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইও না। মানুষকে মানুষের অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া বা তাহাকে মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে অবসর না দিয়া বা সাহায্য না করিয়া যে অপকার্য্য করিয়াছ, তাহার কৈফিয়ত কোথায়? ইহকালে ত দিতে পার নাই তাহার প্রমাণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ। পরলোকে যে ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত তাহাও সহজে অনুমেয়। এ পথে বর্ত্তমানে ধ্বংস ফলছে, এখন সাবধান না হইলে ভবিষ্যৎ আরও ভীষণ। মধ্যকালের পাপযুগে বেদাদি দূরে নিক্ষিপ্ত, মহাপুরুষগণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শিত, তাঁহাদের বাণী পদদলিত। সে পাপে কত স্বধর্ম্মী স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে; যারা করে নাই, তারা আজ বিদ্রোহী বা হীনবীর্য্য। এই পাপহেতুই আজ তোমার জীবনশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত; তাই বিদেশে পদাঘাত-ক্লিষ্ট, স্বদেশেও লাঞ্ছিত ও সদা লাঞ্ছনা-ভয়-ভীত। আজ প্রেমাশ্রু দ্বারা ব্যথা-কাতর ভাইয়ের ক্ষত-চিকিৎসার সময় আসিয়াছে। উঠ, অগ্রসর হও; "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" যদি না পার বুঝিব তোমার দেহে রক্ত নাই, তোমাতে হৃদয় নাই, বুদ্ধি নাই, মনুষ্যের সকল গুণ হারাইয়াছ। তুমি মানুষাকারে মানুষ ছাড়া আর কিছু। যদি এখনও স্বদেশ বিদেশে লক্ষ পদাঘাতে ব্যথা বোধ না কর, তবে বুঝিব তুমি মরিয়াছ বা তভোধিক জড়ত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি ভীতিভূত হও, তবুও মৃত্যু। মানুষের মত প্রতিকারে অগ্রসর হও। প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন কর। ধর্ম্মের পথে আত্ম-বিভূতি ব্যতীত

উপায়ান্তর নাই। কে আছ জীবিত, উঠ—জীবনের পথে, আত্মবিস্তৃতির পথে, অগ্রসর হও। ঐ দেখ মহাচীন—তোমার ঘরের শিষ্য চীনও জাগিয়া উঠিয়াছে, ভাই বলে তাহাকে আলিঙ্গন কর, বুদ্ধের চরণতলে একদিন চীন ভারত ও অন্যান্য কত দেশ মিলিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিল। আবার বুদ্ধের চরণরেণু মাথায় তুলিয়া লও, দেখিবে এখনও তোমরা পৃথিবীর অর্দ্ধাধিক। আবার মহাজাতি-গঠনে অগ্রসর হও। এখনও না জাগিলে রক্ষা নাই, মৃত-বোধে উদর-পুর্ত্তির লোভে শ্বাপদকুল চারিদিকে ভীষণ চীৎকার করিতেছে।

মনে রেখ—"তুমি তোমার নিজ পরিবারের দশের ও দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী" (সত্যানুসরণ।) নিজের পরিবারের ভরণপোষণ ও আনন্দ-বিধান যেরূপ কর্ত্তব্য, দেশ, সমাজ, জাতির প্রতিও তোমার সেইরূপ বা ততো-ধিক কর্ত্তব্য। দেশ, সমাজ ও জাতির জীবন দুষ্ট বা রুগ্ন হইলে তুমি বা তোমার পরিবার কিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিবে ? সমস্ত দেহ রুগ্ন হইলে কি কোনও অঙ্গ সুস্থ থাকে ? সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। প্রেমের দ্বারা জগৎকে জয় কর। জগৎবাসী বড় বিপদ্‌গ্রস্ত। আজ তোমার দ্বারে জগৎবাসী অতিথি, অতিথিকে অমৃতদানে তৃপ্ত কর। এস সমাজ-সমুদ্র-মন্থন করে অমৃত উদ্ধার করি—সেই অমৃতপানে আমরা অমৃতত্ব লাভ করিব। শঙ্কর সহায় হউন। হে অমৃতের পুত্রগণ—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধম্মপদ।

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ।

(শ্রীকৃষ্ণের যেমন গীতা শ্রীবুদ্ধের তেমনই ধম্মপদ। ধম্মপদ নিহিত সত্য সার্ব্বজনীন। মানুষের জীবনকে পবিত্র ভাবে গঠিত করিবার পক্ষে ধম্মপদের বাণী কত উপযোগী তাহা বাক্যে শেষ করা যায় না। যে বুদ্ধ আজও পৃথিবীতে [illegible] কোটী মানব দ্বারা অবতার রূপে পূজিত তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী। যাঁর করুণার সুশীল ছায়ায় ভারতবাসী একদিন জ্ঞান কর্ম প্রেমের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল— যাঁর শিক্ষার প্রভাব জগতে বর্ত্তমান খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মে বর্ত্তমান, তাঁহারই বাণী। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, পাঠক প্রায় আজই

হাজার বৎসর পূর্ব্বের মহামহাযোগী ত্যাগী প্রেমিকের কথা স্মরণ করুন, চিন্তা করুন, মানসনয়নে ভাবিয়া দেখুন, তাঁহার শ্রীমুখের পূতবাণী-সমূহ শ্রবণ করুন)

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।
ভগবৎ অরহৎ বুদ্ধ অবতার
সম্যক্ সম্বুদ্ধ যেই তাঁরে নমস্কার।

(১)

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
মন সা যে চ পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা
ততোনং দুক্‌খ মন্বেতিচক্কং ব বহতোপদং। ১।

মন ধর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বগামী হয়,
মন ধর্ম্মমধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনোময়
প্রদূষিত মনে বাক্য বলে যেইজন
কিম্বা হেন মনে কার্য্য করে সম্পাদন
ভারবাহী বলীবর্দ্দে যথা চক্র ধায়
দুঃখও তাহার তথা পিছে পিছে যায়॥ ১।

(ধর্ম্ম—পদার্থ, কর্ম্ম, মানবীয় স্বভাব ও চিন্তা। মনই সকলরূপ বোধের কারণ। মনের রঙ্গে সংসার রঞ্জিত। মনের অস্তিত্বহেতুই অন্য বিষয়ের অনুভূতি। মনোময়—মন হইতে উৎপন্ন।)

(২)

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
মনসা য়ে প্রসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা
ততোনং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী॥ ২।

মন ধর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বগামী হয়
মন ধর্ম্ম মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনোময়
প্রসন্নমনেতে বাক্য বলে যেইজন
কিম্বা হেন মনে কার্য্য করে সম্পাদন
ছায়া যথা দ্রব্যে করে সদানুগমন
সুখ তথা লয় সেই জনের শরণ। ২॥

(৩)

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসিমে
যে চ তং উপনয্হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥ ৩।

করিয়াছে কেহ মোর কভু তিরস্কার
পরাজয় দ্রব্য চুরি অথবা প্রহার
হেন চিন্তা সদা যার হৃদয়ে উদয়
বৈরভাব তার নাহি প্রশমিত হয়॥ ৩

(৪)

অক্কোচ্ছিমং অবধিমং অজিনিমং অহাসি মে
যে তং ন উপহনধ্‌হন্তি বেরং তে সূপসম্মতি॥ ৪।

তিরস্কার পরাজয় অথবা প্রহার
দ্রব্যের হরণ কেহ করেছে আমার
হেন চিন্তা মনে যার স্থান নাহি পায়
বৈরভাব তাহা হতে সুদূরে পলায়॥ ৪।

(৫)

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মতি এসধম্মো সনগুনো॥—৫।

বৈরীভাব দ্বারা কেহ শত্রুতা কথন
এ জগতে পারে নাই করিতে দমন
মৈত্রভাবে সম্পাদিত বৈরিতা হরণ
এই হয় সত্য সত্য ধর্ম্ম সনাতন॥ ৫।

(৬)

পরে চ ন বিজানন্তি মর মেত্থ যমামসে
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা। ৬।

হেতা হতে যেতে হবে মূর্খে নাহি জানে,
সকল কলহ থামে জ্ঞান আগমনে॥ ৬॥

মেধগা—কলহ, পরে—মূর্খ ব্যক্তিরা, এত্থ—ইহ সংসার।

(৭)

সুভানুপস্সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং
ভোজনম্হি অমত্তঞ্ঞুং কুসীতং হীনবীরিয়ং।
তং বে পসহতী মারো বাতো রুক্খং ব দুর্ব্বলং॥ ৭।

বাহ্য শোভা রত মন ইন্দ্রিয় সেবায়
ঔদরিক হীনবীর্য্য অলসতাময়

মার সদা পরাভব করে হেন জনে
বলহীন বৃক্ষে যথা বায়ুর তাড়নে ॥ ৭।

কুসীদ—অলস

(৮)

অসুভানপস্সিং বিহবরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং
ভোজনম্‌হি চ মত্তঞ্‌ঞুং সদ্ধং আরদ্ধ বীরিয়ং ;
তং বে নপ্প সহতী মারো বাতো সেলং ব পব্বতং। ৮।

মার—মায়া, সয়তান=কুপ্রবৃত্তি।

(৯)

অনিক্কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্‌সতি,
অপেতো দমসচ্চেন না সো কাসাব মরহতি ॥ ৯।

যদিও পাপাত্মা নরে কাষায় পরয়
দমসত্যহীন তাহে উপযোগী নয় ॥ ১০।

(ক্রমশঃ)

নূতন ও পুরাতন।

লেখক—সম্পাদক।

ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারে বর্ত্তমানের অস্তিত্ব নাই। যে স্বল্পাদপি স্বল্প কালকে তুমি বর্ত্তমান বলিয়া ধরিতে চাও, ধরিতে চাহিবামাত্র সে অতীতে পরিণত হইয়া বসিয়াছে, তাহার বর্ত্তমানত্ব নাই। ভবিষ্যৎই বা কোথায়? ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অনাগত; তাহার অনুভূতি আমাদের নাই। সুতরাং সূক্ষ্ম বিচারে কেবল অতীত কালই সুপ্রতিষ্ঠ। একমাত্র অতীতকাল সুপ্রতিষ্ঠ হইলেও, আমরা নিকট অতীত এবং অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকালকে বর্ত্তমান কাল বলিয়া বিবেচনা করি। অতীতের কতদূর বা ভবিষ্যতের কতদূর বর্ত্তমানের মধ্যে পরিগণনা করা কর্ত্তব্য, তাহারও কোন একটা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দৃষ্ট হয় না। গ্রহ নক্ষত্রাদির বিশেষ সমাবেশ, রাজনীতিক বা সামাজিক বিশেষ পরিবর্ত্তন, বা প্রাকৃতিক কোন বিশেষ বিপ্লবের দ্বারা অতীতকে বর্ত্তমান হইতে পৃথক করা হইয়া থাকে। যে রূপেই হউক ব্যবহারিক জগতে আমরা অনন্ত অখণ্ড কালকে

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে বিভাগ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। দিন পক্ষ, মাস, বর্ষ, যুগ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিভাগ সকলেরই পরিজ্ঞাত। দিনেরও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে।

কাল চক্র অবিরাম গতিতে ঘুরিতেছে; কোন সময়েই তাহার বিরাম নাই। কালের এই অবিরাম গতির মধ্যে আমরা এক একটি সময়কে লক্ষ্য করিয়া—পুরাতনকে পশ্চাতে রাখিয়া—এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাই। যাহাদের পুরাতন স্মৃতি মধুর, তাহারা মধুরতর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, যাহাদের পুরাতন কেবল দুঃখের স্মৃতি, তাহারা পুরাতন ভুলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু পারে না। পুরুষকার ও অদৃষ্টের ঘাত প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবন সুখ বা দুঃখ ভোগ করে।

হিন্দু জাতির অতীত চিন্তা করিলে মনে যে কত প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। যাহারা বর্ত্তমানে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন তাহারা অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে তাহাদের বর্ত্তমান নামটি পরপ্রদত্ত। পঞ্চ নদ বা পাঞ্জাব (পঞ্চ-আপ) প্রদেশেই পারশিক জাতির সহিত তৎকালীন ভারতবাসীর সংস্পর্শ হইত, এবং এই পারশিক জাতিই সিন্ধু নদী তীরস্থ ভারতবাসীদিগকে হিন্দু বলিতেন। হিন্দু শব্দটী সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ। সকল দেশের লোকেরা সকল বর্ণ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না, এবং প্রাচীন পারশ্যবাসীরা সিন্ধু শব্দ হিন্দু উচ্চারণ করিতেন। একটি বিশেষ নদী তীরস্থ ব্যাক্তিদিগের নাম ক্রমে সমস্ত ভারতবাসীদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইল। ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য উভয় স্থলের অধিবাসীরাই হিন্দু বলিয়া আখ্যাত হইতে লাগিলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বাধীনতা-চ্যুত হন নাই, ততদিন এ নাম দ্বারা নিজেরা আপনাদিগকে অভিহিত করেন নাই। বিদেশীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর সমগ্র ভারতবাসীর হিন্দু নাম প্রচলিত হয়, এবং তাহাদের বাসস্থানের নাম হয় হিন্দুস্থান। সুতরাং হিন্দু শব্দের দ্বারা আর্য্য, দ্রাবিড়িয়, মোঙ্গলীয়, সেমিটিক প্রভৃতি আকার বর্ণ ও বংশগত ভেদসূচক জাতিবিশেষ বুঝায় না, ইহাদ্বারা কোন ধর্ম্মও বুঝায় না। হিন্দু শব্দ বলিতে বস্তুতঃ ভারতবাসী বুঝায়, এবং হিন্দুস্থান বলিতে তাহাদের দেশ বুঝায়।

এক হিসাবে ধরিতে গেলে হিন্দুস্থানের সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই হিন্দু শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সকল ভারতবাসীকেই হিন্দু বলা হয়।

বর্ত্তমানে হিন্দু শব্দের দ্বারা ভারতবর্ষে একটি বিশেষ ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগকেই বুঝায়। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি অ-হিন্দু। হিন্দুশব্দে বর্ত্তমানে যে কেবল আর্য্যবংশ-সম্ভূত ব্যক্তিকে বুঝায় তাহা নহে, যে সমুদয় জাতি, যথা—দ্রাবিড়, মঙ্গোলিয়, শক, গ্রীক বা যবন ইত্যাদি যে সমুদয় জাতি কোন না কোন সময়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন, সে সমুদায়কেই বুঝায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন, তাঁহারা কাস্পিয়ান (কাশ্যপ হ্রদ) হ্রদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। দ্রাবিড় ও মঙ্গোলিয় জাতিই এ দেশের আদিম নিবাসী। এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। লোকমান্য তিলক ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আর্য্যদিগের আদিম নিবাস ছিল উত্তর মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত য়ুরোপের উত্তর অংশ কেহ বা উহার মধ্যাংশ আর্য্যদিগের পূর্ব্বনিবাস স্থির করিয়াছেন। এ সমস্ত মতভেদের বিচার এই প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। তবে সংক্ষেপে এ কথা বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং হিমালয় প্রদেশই আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল বলিয়া অনুমান। এ সম্বন্ধে আমরা অন্য এক সময় আলোচনা করিব।

এই প্রবন্ধে আমরা এই বলিতে চাই যে বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ বহুজাতির সঙ্গম-স্থল হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে আমরা যাহাদিগকে হিন্দু বলি তাহাদের মধ্যে আর্য্য এবং আর্য্যেতর অনেক বংশই পরিদৃষ্ট হয় এবং এই সমস্ত জাতির মিলনে অনেক সঙ্কর বর্ণেরও উৎপত্তি হইয়াছে।

বিশুদ্ধ বর্ণ ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে অতি বিরল। যাহারা আর্য্যবংশধর বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাহাদের ধমনীতে কতটুকু আর্য্য শোণিত আছে, তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য। ভিতরে কিছু না থাকিলে কেবল বংশ বিশেষে জন্মের বা বর্ণের দাবি কার্য্যকর নহে। আর্য্যেরা শ্বেতবর্ণ এবং ভারতের আর্য্যেতর জাতিরা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। কিন্তু আর্য্যেরা যে আর্য্যেতর জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে বর্ণহেতু নহে গুণ হেতু। আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতির সংমিশ্রণে নূতন হিন্দু জাতি আর্য্য ও আর্য্যেতর সংমিশ্রণে যে জাতি তাহার নাম হিন্দু। পারশিক দত্ত হিন্দু নামটি কেবল স্থান সূচক না হইয়া ধর্ম্ম-সূচকও হইল। এই ধর্ম্ম আর্য্য ও আর্য্যেতর ধর্ম্মের সন্ধি স্থাপন করিল এবং নবাগত বিদেশীয় দিগকেও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে লাগিল। শক ও হুন প্রভৃতি জাতিও হিন্দুর মধ্যে স্থান পাইল। বর্ণভেদ অর্থাৎ বর্ণের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন প্রথ

উঠিয়া গেল। কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ও শ্বেতকায় শূদ্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমাজে অসবর্ণ বিবাহ চলিল। এবং তাহার ফলে বহু শঙ্কর বা মিশ্র-বর্ণের নূতন জাতি গঠিত হইল। আর্য্য শব্দের নূতন অর্থ হইল। বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বোধক না হইয়া উহা গুণনীত শ্রেষ্ঠত্ব বোধক হইল। কর্ত্তব্যমাবরণ ...মমকর্ত্তব্যমনাবরণ, তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বৈ আর্য্য ইতি স্মৃতঃ। কুলং শীলং ...। দানং ধর্ম্মঃ সত্যং কৃতজ্ঞতা, অদ্রোহ ইতি যত্রৈতৎ তানার্য্যান্ সংপ্রচক্ষতে॥ ...ক্ষণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব শ্বেতকায়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিল না—কৃষ্ণকায় ...ক্তিরাও উহার অধিকারী হইলেন। মাদ্রাস অঞ্চলের অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণকায়, অন্যান্য স্থানেও কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ বিরল নহেন। ক্রমে বর্ণহেতু ভেদ উঠিয়া গেল। তখন ভৃগু বলিয়া উঠিলেন যে বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মা মিদং জগৎ, ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং কর্ম্মভিবর্ণতাং গতম্। তখন "গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" গীতায় এই কথা শুনা যাইতে লাগিল।

বিভিন্ন বর্ণের লোকের সান্নিধ্য হেতু, বর্ণহেতু ভেদ উপস্থিত হইল। বর্ণের সংমিশ্রণে বর্ণের ভেদ তিরোহিত হইল। তখন কেবল গুণ ও কর্ম্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচিত হইল। সুতরাং হিন্দুর মধ্যে যে বর্ণভেদ লুপ্ত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর্য্যেতর বহু বংশও যে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ণহেতু ভেদ নাই বটে, কিন্তু বর্ণ নামটি আছে। বর্ণহেতু ভেদ নাই বটে, কিন্তু ভেদ আছে, সে ভেদের নিরাকরণ করা সহজ নহে। সে ভেদ ছোট ছোট জাতি লইয়া, সে ভেদ অসংখ্য। এই অসংখ্য ভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া হিন্দু জাতিকে এক বিশাল জাতিতে পরিণত করার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই উহা হিন্দু সমাজের ভেদ ভঙ্গ করিতে না পারিয়া নূতন ভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান যে ভেদ দৃষ্ট হয়, যে ভেদের মূলে শাস্ত্র বা যুক্তি আছে কি না, তাহার বিচার আমরা করিতে চাহি না, উহা হিন্দু সমাজের মঙ্গলজনক বা অমঙ্গলজনক তাহাও দেখিতে চাহি না। যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই চলিতেছে। হিন্দুর দেশে বিদেশীয় প্রভুত্বের কারণ, কেনই বা মুষ্টিমেয় মুসলমান বিশাল হিন্দু জাতিকে করতলস্থ করিতে পারিয়াছিল, কেনই বহুদূরস্থ ইংরাজ জাতি এদেশে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারও বিচার করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। কেনই পৃথিবীতে হিন্দুজাতির মধ্যে একজনও স্বাধীন রাজা নাই, কেনই হিন্দুজাতির মধ্য হইতে প্রতি বৎসর

বহু ব্যক্তি অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, কেনই বা আমরা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, কেনই পূর্ব্বের ন্যায় অভ্যাগতদিগকে হিন্দু-সমাজে স্থান দিতে পারি না, এ বিষয়ে চিন্তার অভাব দেখা যায়। কেনই হিন্দু সমাজে জনবল, ধনবল, ধর্ম্মবল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইতেছে, কেনই বা হিন্দু জাতি পীড়িত ও লাঞ্ছিত, তাহা আমরা কখনও ভাবি না।

নববর্ষে হিন্দুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গিয়া হিন্দু জাতির উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও পতন চিন্তা করিলে প্রত্যেক হিন্দুর মনে এমন একটি বিষাদ উপস্থিত হয় যে তাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

হিন্দু সমাজের উন্নতির ভিত্তি। *

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভি
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

আমরা যেন কর্ণের দ্বারা মঙ্গল শুনিতে পাই, আমরা যেন কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও দেবতা-ভাবাপন্ন হইয়া চক্ষুর দ্বারাও মঙ্গল দেখিতে পাই। আমরা যেন সকল ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া মন্ত্রদ্বারা ভগবানের স্তুতিগান করিতে করিতে বিগতক্লেশ হইয়া দেবহিত বিশ্ব-মঙ্গলজনক আয়ুঃ লাভ করিতে পারি।

অসীম বিশ্বের তুলনায় মানবের মাতৃভূমি এই পৃথিবীকে একটী ক্ষুদ্রস্থান বলিয়া বর্ণনা করিলে ইহার গৌরবের কিছুমাত্র লাঘব করা হয় না। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও মানবের জন্মভূমি বলিয়া ইহাকে আবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠস্থানস্বরূপে বর্ণনা করিলেও অতিশয়োক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। বিশ্বপতির এই বিশালরাজ্যে এ পর্য্যন্ত আমরা মানব অপেক্ষা কোনও শ্রেষ্ঠ জীবের পরিচয় পাই নাই। মানবের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি তাহার মননশক্তি। এই মননশক্তিবলেই

* খুলনা জেলার অন্তর্গত খালিশপুর গ্রামে বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবি সভার একবিংশ সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত বাচস্পতি বিদ্যাবারিধি এম্, এ, বি, এল, সি, আই, ই, এম, এল, এ, মহোদয়ের কর্ত্তৃক পঠিত।

মানব 'মানব'। এই মননশক্তি-বলেই মানব এই পৃথিবীতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যে যত শ্রেষ্ঠ তাহার কর্ত্তব্যের পরিধি তত বিস্তৃত। মানব শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার কর্ত্তব্য কেবল মানবসমাজের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ নহে; ইতর প্রাণী, এমন কি, উদ্ভিদাদির প্রতিও তাহার কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

যে মননশক্তি দ্বারা মানব মানবেতর জগতের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই মননশক্তি দ্বারাই কোনও বিশেষ মানব-সমাজ অপর মানব-সমাজের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারক হইয়া থাকে। একই সমাজে মননশক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠত্ব ও অপকৃষ্টত্বের কারণ। মানবের মননশক্তির প্রয়োগ জড়জগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ উভয়ত্রই হইয়া থাকে। উভয়বিধ প্রয়োগের সমন্বয়ের উপরেই শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্বের তারতম্য বিন্যস্ত দৃষ্ট হয়।

মননশক্তির দ্বারা মানুষ দ্বিবিধ সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকে, এক জড়সম্পদ্, অপর অধ্যাত্মসম্পদ্। দ্বিবিধ সম্পদই পরস্পরাপেক্ষ। যেমন শরীর ও মন। শরীরকে উপেক্ষা করিয়া মনের উৎকর্ষ-সাধন এবং মনকে উপেক্ষা করিয়া শরীরের উৎকর্ষ-সম্পাদন উভয়ই অসম্ভব।

ঐরূপ ধন এবং জ্ঞানও পরস্পরাপেক্ষ। সাধারণের ধারণা যে, দরিদ্রদেশও জ্ঞানী হইতে পারে, কিন্তু এ ধারণা যে ভ্রমমূলক, তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনায়াসে বুঝা যায়। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন্, রোম, গ্রীশ, চীন ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্যপ্রদান করে যে, তত্তদ্দেশ যখন জ্ঞানে উন্নত, তখনই ধনেও সমৃদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান উন্নতিশীল দেশসমূহের ইতিহাসও ঐ সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে।

যে দেশে জনকের মত জ্ঞানী রাজা থাকেন এবং তিনি যদি ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য সহস্র স্বর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ-গাভী দান করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন, সেই দেশেই যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মবাদিগণের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়। বিক্রমাদিত্যাদি না থাকিলে কালিদাসাদির অসদ্ভাব হইত। ব্যক্তিগত ত্যাগের দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল না হইলেও, দরিদ্রসমাজে জ্ঞানের ক্রমোন্নতি যে অনেকটা অসম্ভব—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অর্থের আকাঙ্ক্ষার অভাব এবং অর্থের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও উহার অভাব, এই দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু। বিদ্যার অর্জ্জনেও অর্থের প্রয়োজন, বিতরণেও অর্থের প্রয়োজন। অর্থের প্রতি অনাদর হেতু "বুনা" রামনাথের প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী কেহ হইতে পারে নাই।

তিনি নিজে যে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাও স্বজন বা পরজন কাহারও অর্থ-সাহায্য ব্যতীত তিনি লাভ করিতে পারেন নাই।

সুতরাং অর্থ ও বিদ্যা উভয়ই বীজাঙ্কুরবৎ পরস্পরাপেক্ষ। যাহারা জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ধনোপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখেন, কিংবা ধনকে উপেক্ষা করিয়া কেবল জ্ঞানার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাঁহাদের লক্ষ্যবেধের আশা দুরাশা মাত্র।

উন্নতিশীল সমাজ মাত্রেরই উভয়দিকে তুল্যদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

মানুষের শরীর আছে। এই শরীর রক্ষা করিতে হইলেই ধনের প্রয়োজন। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার, ধর্ম্ম-নীতি-শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতি, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-জলপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতের প্রতীকার ও অন্যান্য সহস্র প্রকারেও ধনের প্রয়োজন। স্বীয় প্রাণরক্ষার জন্যও ধনের প্রয়োজন। সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও নিজের আহারের জন্য গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়।

ঋষিরা বলেন যে মানুষের তিনটী 'এষণা' আছে। সকলেরই বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়—ইহার নাম প্রাণৈষণা। বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই যে ধনোপার্জ্জনের ইচ্ছা হয়—তাহার নাম ধনৈষণা। এই দুইটী এষণার অতিরিক্ত আর একটী স্বাভাবিক এষণাও মানুষের আছে, যে এষণা বিশ্বমঙ্গলের জন্য, তাহাকে বলে ধর্ম্মৈষণা। এই এষণা আছে বলিয়াই মানব-চরিত্রে পরদুঃখকাতরতা ও তাহার বিমোচনে ব্যগ্রতা পরিদৃষ্ট হয়, এবং এই এষণা আছে বলিয়াই মানুষ তাহার প্রাণৈষণা ও ধনৈষণা সংযত করিতে পারে। যে সমাজে এই তিন এষণার যত অধিক সামঞ্জস্য, সে সমাজ তত অধিক মঙ্গলভাগী হইয়া থাকে। এই তিন এষণার মূলে মানুষের সেই মননশক্তির বিকাশ।

বহুপ্রাচীন বৈদিকযুগ, মধ্য পৌরাণিকযুগ ও তৎপরে অনতিদূর-অতীত মুসলমান্ রাজত্বের যুগের কথা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান ইংরাজরাজত্বের যুগের কথা আলোচনা করিতে গেলে হিন্দুসমাজের এই এষণার স্রোত কিরূপে প্রবাহিত হইতেছে—তাহা চিন্তা করা সমগ্র হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ আমাদের এই ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় সমাজের মঙ্গলের জন্যও প্রয়োজন। কারণ আমাদের এই সমাজও বিশাল হিন্দুসমাজ-সমষ্টির একটী ব্যষ্টিমাত্র।

প্রথমে শরীরের কথা আলোচনা করিব। এক শরীরের কথা আলোচনা করিতে গেলে বহু সামাজিক প্রথার আলোচনার প্রয়োজন হয়। আমার শরীরটী আমার নিজের নহে। এই শরীরের মূল অংশ পিতা ও মাতার প্রদত্ত। পিতা

মাতাই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সেই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পিতামাতার স্থান ঈশ্বরের পদবীতে উন্নত করিয়াছেন। এই জন্যই মহাকবি কালিদাস ঈশ্বরকে পিতৃ-মাতৃরূপে বন্দনা করিয়াছেন—যথা, "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।" ব্রহ্ম যেমন জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, এই পিতামাতাই তদ্রূপ শরীরের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাহা হইলে পিতামাতার দেহের পূর্ণাবয়বতা স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপরই সন্তানের শরীর নির্ভর করে। অপরিণতবয়স্ক রোগ-গ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের শরীর কখনও ভাল হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবান্ আমাদের যে মননশক্তি দিয়াছেন, সেই মননশক্তির পরিচালনা দ্বারাই আমাদের শুভ লাভ ও অশুভ পরিহার করিতে হইবে।

বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা মননশক্তির কিছুমাত্র পরিচালনা করি না, কেবল প্রথা দ্বারাই পরিচালিত হই। এই যে খর্ব্ব দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় বাঙ্গালী-হিন্দুশরীর দেখিতে পাই, ইহার প্রধান কারণ কি? অপরিণতবয়স্ক দম্পতির সন্তানোৎপাদনই ইহার প্রধান কারণ। উপযুক্ত ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং স্থানের অস্বাস্থ্যকরতাও বাঙ্গালী-শরীরের অবনতির কারণ বটে, কিন্তু উহার মুখ্য কারণ নহে। একবিংশ বর্ষের পূর্ব্বে রমণী ও পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পুরুষ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেন না। অপ্রাপ্তবয়স্কের সন্তান কখনও সুস্থ, সবল বা দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ গর্ভাধানের কাল—ন্যূনকল্পে পুরুষের পক্ষে ২৫ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৬ বৎসর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বাল্যবিবাহপ্রথা থাকাতেই প্রধানতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতামাতার সন্তানের আবির্ভাব হয়। প্রাচীনকালে নানাবিধ সামাজিকশাসন যাহা ছিল, তাহার জন্য বাল্য-বিবাহসত্ত্বেও পূর্ণাবয়বলাভের পূর্ব্বে প্রায় সন্তান জন্মিতে পারিত না, কিন্তু বর্ত্তমানে উহার অভাবে এইরূপ সন্তানের বাহুল্য ঘটিয়াছে।

সমগ্র হিন্দুসমাজেরই এ বিষয়ে মননশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতামাতার সন্তান মানসিক বা শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—ইতি আত্মজঃ। জায়তে অস্যাং ইতি জায়া।" আত্মাই পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন—এজন্য পুত্র "আত্মজ" এবং স্ত্রীর গর্ভে নিজে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়া স্ত্রী "জায়া"। সন্তান পিতামাতার শরীরের সংযোগসমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎপর তাঁহাদের দ্বারাই লালিত পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই লালনপালনের জন্যও

প্রয়োজনীয়। সন্তান যেমন পিতামাতার শরীরের অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ তাঁহাদের সমস্ত মানসিক বৃত্তির অংশ লইয়াও জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই পিতৃমাতৃদত্ত ধনের বৃদ্ধি বা হ্রাস করার ভার তাঁহার নিজের হস্তে। পিতৃমাতৃপ্রাপ্ত সম্পদ্ অদৃষ্ট, আর স্বোপার্জ্জিত সম্পদ্ তাঁহার পুরুষকার। কিন্তু মূলে যদি পিতামাতার নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে তিনি কিসের বৃদ্ধি করিবেন? ইহাকেই ইংরাজীতে বলে Heredity বা বংশানুক্রম। সুতরাং সৎপুত্র লাভ করিতে গেলেই পিতামাতার যেরূপ সুস্থ, সবল ও পূর্ণাবয়ব হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ তাঁহাদের নিজেদের ধার্ম্মিক হওয়া আবশ্যক। এক সৎপুত্র উৎপাদনের বিষয়ে যদি মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই কেবল শরীরের উন্নতি নয় পরন্তু মনেরও উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। কোনও রুগ্ন, দুর্ব্বল বা হীনচেতা ব্যক্তি বা জাতি কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে শরীরের উন্নতির জন্য আমাদিগের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত এবং এই শরীরের উন্নতির জন্য যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত নিদ্রা, যুক্ত জাগরণ, যুক্ত শ্রম, যুক্ত বিশ্রাম আবশ্যক। আর ইহাই হইল সকল উন্নতির ও সকল ধর্ম্মের মূল। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন— "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" এই কারণেই আমি হিন্দু সমাজের নেতৃবর্গের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি—যে তাঁহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক দম্পতীর সন্তানোৎপাদন-জনিত অনিষ্টের প্রতিবিধান করুন। তাঁহারা শিশুপালনের সুব্যবস্থা সমাজে প্রচার করুন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন এবং শরীররক্ষার জন্য পুষ্টিকর আহারের বিধান করুন। অন্ততঃ এই সব দিকে তাঁহারা মনোনিবেশ করুন এবং লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। সংকল্প স্থির করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধির পথ সুগম হয়। লক্ষ্য স্থির করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। এই সমুদয় কার্য্য করিতে গেলেই একতার প্রয়োজন এবং ঐ একতা স্থাপন করিতে গেলেই সভার বা পরিষদের প্রয়োজন, সেই সভা একটী জাতি লইয়াই হউক্ বা বহু জাতি লইয়াই হউক। আমাদের এই ক্ষুদ্র সভা যেরূপ ভাবে সংগঠিত হইয়াছে, সমগ্র হিন্দু-সমাজ মধ্যে যদি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সভা সংস্থাপিত হয় এবং তাঁহাদের সকলের শিরঃপ্রদেশে সকল জাতির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত জন্য একটী সমগ্রবঙ্গীয় হিন্দু সভা স্থাপিত হয় ও তদ্রূপ অন্যান্য

প্রদেশেও যদি ঐরূপ করা যায়, তাহা হইলে কোনও না কোনও সময়ে সমগ্র হিন্দুসমাজে একতাপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধন আশ্রমের উদ্যোগে দুইটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। একটী চাঁদপুরে এবং অপরটী বাবুরহাট নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীর বালক বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্তই স্থাপন করা হইয়াছে। যাহাতে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে তজ্জন্য আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

টাকার পরিমাণ অনুসারে নোটের আকার পরিবর্ত্তন।ঃ—বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট নোটগুলির চেহারার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। নোট টাকার পরিমাণ অনুসারে হইবে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণ আকার দেখিয়া টাকার পরিমাণ স্থির করিতে পারেন। আপাততঃ দশ টাকার নোট নূতন চেহারায় এই মাসেই নাকি বাহির করা হইবে। পরে নবসাজে সবাই দেখা দিবেন। আমরা ভবিষ্যৎ প্রতিক্ষায় রহিলাম।

[illegible] বৈবাহিক ব্যাপারে মহত্ব প্রদর্শন।ঃ—নদীয়া জেলার দরিয়াপুর গ্রামে জনৈক দরিদ্রা বিধবার কন্যার সহিত জনৈক ধনীর সন্তানের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু ধনীপুত্র অন্য কোথায় মস্ত যৌতুক আশায় বিবাহের দিন ঐ দরিদ্রার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন নাই। তাহাতে ঐ দরিদ্রা বিধবা কিরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু ইছামালী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চৌধুরী নামক কোন সহৃদয় যুবক ঐ দিবস তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এই শেষ দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৬ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড
২য় সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ।

১৩২৯ সাল।
১৮৪৪ শকাব্দা

জাগরণ।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার)

ওগো সুপ্ত, জাগো জাগো, ঘুমায়ো না আর,
চেয়ে দেখ মেলি ওই তন্দ্রালস আঁখি;
জাগে তব সূর্য্যরশ্মি—নব চেতনার.
প্রাণ-স্পর্শী মুক্তিমন্ত্র গাহে শুন পাখী।
ভ্রমর গুঞ্জন-ছলে বলিছে তোমায়—
"অতীতের কথা সব হ'য়ে বিস্মরণ
সর্ব্বস্ব হারাতে এবে বসিয়াছ হয়!
এখনও না জাগিলে জাগিবে কখন?"
মুক্তি-সমীরণে আজি পূর্ণ চারিধার,
তুমি কি রহিবে শুধু বদ্ধ রুদ্ধ গেহে!
দূর করি এই দণ্ডে নিদ্রার বিকার
বাহিরে আসিয়া লভ নববল দেহে।

যায় নাই কিছু তব, অনন্ত বৈভব—
জাগিয়া লভহ পুনঃ পূর্ব্বগৌরব।

শরণাপত্তি।

(লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ, পি এইচ্ ডি)

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতার এই বাক্য গভীরজ্ঞানপূর্ণ, মুমুক্ষুর স্থিতিলাভের পরমভিত্তি, সাধারণ মানবের জীবন-প্রবাহের শতব্যথার পরমশান্তি। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যোগ, কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ নিষ্ঠা-বিষয়ক উপদেশ দান করিবার পর, সর্ব্বশেষে অর্জ্জুনকে তাঁহার শরণাপন্ন হইবার জন্য আদেশ করিলেন; ফল নির্দ্দেশ করিলেন,—সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি এবং আনন্দে স্থিতি। কতদিন কতবার কত সাধক অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া, গীতার এই বাক্যসুধা পান করিয়াছেন। শান্তিরূপ স্ফটিকজলের আশায় কত ভক্তের চিত্ত চাতকের ন্যায় ভক্তিমেঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। জীবনের শান্তি যখন চলিয়া যায়, সাধক শতপুরুষকারেও যখন জ্ঞানের বা প্রেমের স্বরূপের সন্ধান পান না, সমস্ত জীবনটা যখন একটী নিষ্ফলতায় শুষ্ক হইয়া ওঠে, সাধনার শতচেষ্টায়ও যখন বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তি হয় না, শত ঘাতপ্রতিঘাতে যখন জীবন একটী প্রহেলিকা—একটী করুণ নিশ্বাস,—একটী দীর্ঘ অতৃপ্তি,—একটী বিরাট শূন্যের আবর্ত্তন বলিয়া মনে হয়, তখনই পুরুষকারের অভিব্যক্তির স্রোত প্রতিহত হইয়া, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অন্তঃকরণের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে প্রবাহিত হয়। চিত্তবৃত্তি সম্যক্ মার্জ্জিত না হইলে, মানবের সাধারণকর্ত্তৃত্ববুদ্ধি, ইচ্ছার দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া, নানাবিধ ভোগ-স্পৃহায় ব্যস্ত থাকে। অর্থ, বিদ্যা, যশ, অভ্যুদয় প্রত্যেকেই প্রবৃত্তিকে চালিত করে। ইহাদের ভিতর যে সত্য নিহিত আছে, তাহা প্রাণময় স্তরের। জীবনের উপর একটী ভালবাসা, জীবনে শত অভ্যুদয়ের চেষ্টা, মানবের স্বভাবজাত সহজ

সংস্কার ; কিন্তু এখানে মন প্রাণকে অবলম্বন করিয়া, অহংবুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া, শতসহস্র সংকল্পের সৃষ্টি করিতেছে। এস্তর আঁধার-আলোর স্তর, ভেদের স্তর, ভোগের স্তর। এই প্রাণের স্তরে প্রবৃত্তির চেষ্টা যখন আশানুরূপ ফলভোগ না করে, তখন সংকল্পের ব্যর্থতায়, চেষ্টার বহির্মুখীবৃত্তি প্রশমিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়, তাহার ফলে বোধের স্তর ফুটে ওঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকল্পের ব্যর্থতাই মানবের চিন্ময়স্বরূপানুভূতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, যদি এই ব্যর্থতায় মানুষ অবসন্ন না হইয়া, শান্তচিত্তে ইহার গভীরতা, ও ইহার প্রকৃত রহস্যের অনুসন্ধান করেন। বুদ্ধির স্তরে সব সময় থাকিবার জন্য সাধক নানাবিধ সাধনা-কৌশল অবলম্বন করেন। এ অবস্থাতেও শরণাপত্তি তাঁহার প্রধান উপায়। ভগবান্‌কে দেখি নাই,, তাঁহার স্বরূপ অনুভব করি নাই, কিন্তু একটী স্থির বিশ্বাস আছে যে, তিনিই একমাত্র জীবনের পথে পরিচালক, মরণের আঁধারে বর্ত্তিকা,—এইরূপ দৃঢ়বোধ সাধককে সংসারের সব অবলম্বন ত্যাগ করাইয়া ভগবানের শরণাপন্ন করায়। এ বোধের পিছনে থাকে শাস্ত্রের অনুজ্ঞা, সিদ্ধগণের আদর্শ। এ স্তরেও শরণাপত্তি জ্ঞানের ভূমিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না ; মধ্যে মধ্যে সংশয়ের আবরণ আসিয়া চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বিশ্বাসের দৃঢ়তা নষ্ট করে। গুরুবাক্য এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আবার অন্ধকার ভেদ করিয়া বিশ্বাসকে জাগাইয়া তোলে। এ অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি নাই ; চাঞ্চল্য, সংশয় এবং দুঃখ আসিয়া হৃদয়কে অবসন্ন করে, কিন্তু ভগবৎকৃপা এরূপ অবস্থা হইতেও সাধককে রক্ষা করেন। ভগবদ্ বিষয়ক চিন্তা, তাঁহার নামজপ, তাঁহার ধ্যান, বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়া তোলে। এরূপ সংশয়দোদুল্যমানচিত্ত নানাপথগামী হইয়া অবশেষে ভগবানে নিষ্ঠালাভ করিয়া বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করে। এখানে ইহা দ্রষ্টব্য যে, শরণাপত্তি ও বিশ্বাস পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, শরণাপত্তি তত গভীর হইবে, এবং শরণাপত্তি যত স্থিতি অবলম্বন করিবে, বিশ্বাস ততই অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া জ্ঞানের স্তর প্রকাশিত করিবে। বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা সত্যসত্যই অনুভূত্যাত্মক বা অপরোক্ষজ্ঞানের প্রথম সোপান। নানাশাস্ত্রবিৎ, তর্কবাদ-বিতণ্ডায় সুপণ্ডিতের বুদ্ধির পরোক্ষবৃত্তিগুলি বেশ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ অজ্ঞানের ধ্বংস কখনই হইতে পারে না। এই প্রত্যক্ষীভূত অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে হইলে, বুদ্ধির একটী স্থিতি চাই। বুদ্ধির এই স্থিতি, মন বা

প্রাণের চাঞ্চল্য থাকিলে কখনই লাভ করা যায় না। এই স্থিতির জন্যই আচার্য্যেরা গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। রজস্তম অপগত হইলে, অন্তঃকরণে শ্রদ্ধার বিশেষ রূপ আমাদের নিকট সম্যক্ স্ফুরিত হয়।

এইরূপে শরণাপত্তি এবং শ্রদ্ধা সাধককে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির অপরোক্ষ-বৃত্তিকে গ্রহণ ও সম্যক্ অনুভব করিতে শক্তিসম্পন্ন করে। এই অপরোক্ষ-বৃত্তিরূপ সূত্র পাইয়া, বুদ্ধি, সারা জীবনের সাধনাকে জ্ঞানে পর্য্যবসিত করে। শত শত জীবনের মোহ ছেদ করিয়া, সংসার-গ্রন্থি নষ্ট করিয়া, জীবত্ব বুদ্ধি খণ্ডন করিয়া, জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া উঠে। জীবন ধন্য হয়, কামনা পরিপূর্ত্তি লাভ করে, সর্ব্বপ্রচেষ্টা মহাশান্তিতে বিলীন হয়। এইরূপ অবস্থা-লাভ হইলে, সাধক—যিনি এখন সিদ্ধ-ভূমিতে, জীবন্মুক্তির পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন, তিনি শান্ত ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন হইয়া থাকেন। মায়ার বৈচিত্র্য অপগত হওয়ায় ব্রাহ্মীস্থিতি ও শান্তিতে নিবৃত্তকাম হইয়া, সাধক, শাশ্বত-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন, নির্ম্মল অখণ্ডজ্ঞানে নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন। এই হইল সাধনা-জীবনের আরোহক্রম, কিন্তু এ অবস্থাও তো আর বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পূর্ব্বকর্ম্মফলে জ্ঞানী বা ভক্ত অপরোক্ষজ্ঞানের ভূমি হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া পুনরায় প্রাণময়স্তরে কার্য্য করিতে থাকেন। সূর্য্য ডুবে গেলে যেমন পশ্চিমগগন ঐ অস্তমিত সূর্য্যের কিরণ-রশ্মির দ্বারা আরক্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ অপরোক্ষ অনুভূতির অন্তে বুদ্ধির পূর্ব্বস্বরূপ পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, সে একটী দীপ্তিবিশেষ প্রাপ্ত হয়। জগদ্বৈচিত্র্যের অনুভূতি ফুটিয়া উঠিলেও জ্ঞানী আর পূর্ব্বজগৎ দেখিতে পান না। তাঁহার বুদ্ধি, জ্ঞানের সংস্কারে এরূপ ভাবে প্রোজ্জ্বলিত হইয়া উঠে যে, উহা বিশ্বের প্রতিস্তরে একটী সৌন্দর্য্যের মধুরিমা, জ্ঞানের গভীরতা, প্রেমের নিরাবিল প্রবাহ ও আত্মদানের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে পারে। মন এখন আর ক্ষুদ্র সংকল্প করে না, প্রাণ আর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আকৃষ্ট হয় না, হৃদয় মন প্রাণ, ইন্দ্রিয়-শক্তি, কর্ম্মশক্তি আজ সকলেই বুদ্ধির প্রশান্তি স্থিতির যুক্তি হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। বুদ্ধি ধারণ করে অনন্ত জ্ঞানকে, হৃদয় ধারণ করে বিশ্বমৈত্রীকে, ইন্দ্রিয়গণ অনুভব করে বিশ্বসৌন্দর্য্যকে, কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হয় বিশ্বসেবায়। আজ অনন্তবিশ্বের ভিতর দিয়া নিত্য মিলনের নবীন পুলক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যথা নাই, ভেদ নাই, বিচ্ছেদ নাই; জীবন পূর্ণ, মরণ পূর্ণ, ঊর্দ্ধ পূর্ণ, অধঃ পূর্ণ, পূর্ণে পূর্ণের স্থিতি, পূর্ণে পূর্ণের শান্তি, পূর্ণে পূর্ণের তৃপ্তি—ইহাই হইল সিদ্ধের অবরোহক্রম। এ অবস্থায়ও সিদ্ধপুরুষের একটী শরণাপত্তি আছে, কিন্তু তাহা সাধকের শরণাপত্তি হইতে ভিন্নপ্রকারের। ইহার স্থিতি জ্ঞানে। জীবত্ববুদ্ধির লয় হওয়ার পর জ্ঞানী পরমসত্যকে অনুভব করিয়া, জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, যতদিন না প্রারব্ধকর্ম্মের শেষ হয়, ততদিন সত্যের শরণাপন্ন হন। অবশ্য দার্শনিক আলোচনায় সবিশেষ-নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদে পরস্পর তত্ত্বভেদে শরণাপত্তিরূপেরও ভেদ হইবে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—
মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনার উপযোগিতা।

ভাবনানুরূপ ভবিষ্যং।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-"ব্যাপ্তিপঞ্চক" প্রভৃতি প্রণেতা।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আচার্য্য-মতবাদের বৈশিষ্ট্য।

এইবার দেখা যাউক, আচার্য্য যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহার বিশেষত্ব কি? এককথায় বলিতে গেলে বেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চরমপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া, সাধ্য ও সাধন নির্ণয় করাই আচার্য্যমতের একটী বিশেষত্ব। যুক্তিতর্কাদিরূপ সর্ব্ববিধ প্রমাণ সহায়ে বেদের একবাক্যতা প্রদর্শন করিয়া, সেই বেদপ্রতিপাদ্যকে চরমসত্যরূপে গ্রহণ করায় এবং সেই সত্যলাভের উপায়কেও সেই বেদ হইতে নির্দ্দেশ করায়, আচার্য্য যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার এবং মানবপ্রকৃতিরহস্যাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

বেদ কেন প্রমাণ?

অবশ্য ইহা বুঝিতে হইলে, বেদ কেন প্রমাণ—তাহা ভালরূপে বুঝা

আবশ্যক, ও বেদভিন্ন যে চরমসত্যলাভের উপায় নাই, তাহা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক হয়।

'প্রমাণ' শব্দের অর্থ।

প্রথম দেখা যাউক, প্রমাণশব্দের অর্থ কি? এবং বেদকে প্রমাণ বলা হয় কেন? প্রমাণ শব্দের অর্থ যাহা প্রমার জনক বা কারণ। যাহা যেরূপ, তাহাকে সেইরূপ বুঝিলে যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান, অথবা যে জ্ঞান কখন মিথ্যা হইবে না, তাহাই প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান, আর যাহার দ্বারা এই প্রমাজ্ঞান হয় তাহাই প্রমাণ। বেদ প্রমাণ, অর্থাৎ যথার্থ-জ্ঞানের জনক। প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান আদি প্রমাণের ন্যায় শব্দরূপে বেদও একটী প্রমাণ, কিন্তু তাই বলিয়া, যাহা প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণদ্বারা জানা যায়, তাহার নিমিত্ত বেদকে প্রমাণ বলা হয় না। বেদ অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ। যাহা অন্য প্রমাণদ্বারা জানা যায় না, তাহাই বেদ বলিয়া দেয়, বেদরূপ শব্দ একটী প্রমাণ। যাহা অন্য প্রমাণদ্বারা জানা যায়, তাহা যদি বেদ বলিতে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে তাহাকে প্রমাণই বলা হইত না, তাহা হইলে তাহা অনুবাদক নামে অভিহিত হইত। বেদ যে অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্মের বিষয় বলে, অথবা তাহার সাধনের কথা বলে, কিংবা যে স্বর্গাদিসাধক যাগযজ্ঞাদির কথা বলে, তাহা অন্য কোনও উপায় দ্বারা জানা যায় না, এজন্য তাহা অলৌকিক বিষয় মধ্যে পরিগণিত, আর সেইজন্য এই সকল বিষয়ে বেদই প্রমাণ।

'ব্রহ্ম' বিষয়ে বেদ প্রমাণ কেন?

কেহ হয়ত বলিবেন, যাগযজ্ঞাদির কথা পরিত্যাগ করিলেও এই বিষয় দুইটীত আমরা অনুমান দ্বারাও বুঝিতে পারি—এজন্য বেদকে ওরূপ প্রমাণ বলিবার আবশ্যকতা কি? বেদ অনুবাদক বা পোষক প্রমাণরূপে পরিগণিত হউক্ না কেন? আর অনুবাদক বা পোষক প্রমাণকে যদি প্রকৃত প্রমাণ না বলা হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। কারণ, অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্ম যে যুক্তির দ্বারা স্থির করা হইবে, তাহা কখনই প্রতিপক্ষের বিরোধী যুক্তির পথরোধ করিতে পারে না। কেননা, পরিবর্ত্তন-শীল ও দ্বৈত বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, অপরিবর্ত্তনশীল ও অদ্বৈতের জ্ঞান স্বীমার্য্য হয় বলিয়া, যদি মূলে অপরিবর্ত্তনীয় ও অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকার করা আবশ্যক হয়, আর তাহার সহিত পরিবর্ত্তনশীলের ও দ্বৈতের সম্বন্ধ স্বীকার

করিতে গেলে, যদি অপরিবর্ত্তনীয় ও অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকার করা হয় না বলিয়া পরিবর্ত্তনশীল ও দ্বৈত পদার্থকে মিথ্যা বলা হয়, তাহা হইলে, প্রতিপক্ষ যদি সেই অপরিবর্ত্তনের এবং অদ্বৈতের জ্ঞানকেই মিথ্যা বলিতে চাহেন অথবা উভয়কেই সত্য বলিতে চাহেন, অপরিবর্ত্তনশীলকে পরিবর্ত্তনস্বভাবই বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরাশ করিবার প্রবলতর যুক্তি অলভ্য না হইলেও দুর্লভ হইয়া উঠে; পক্ষান্তরে যাহা জগৎকারণ, যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, তাহা অসঙ্গই হইতে পারে না, ইহাই সাধারণের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। এইরূপ কেবল যুক্তি,-সাহায্যে অসঙ্গ অদ্বৈততত্ত্ব প্রমাণে যতই চেষ্টা করা যাইবে, প্রতিপক্ষও ততই তাহার বিরোধী যুক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, তর্কের শেষ আর হয় না। সুতরাং যুক্তির দ্বারা এতাদৃশ ব্রহ্মের নিশ্চয়জ্ঞান অসম্ভবই হয়। ব্রহ্মসূত্রকার "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্রে এই কথাই বলিয়াছেন, আর এই কারণে অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্ম বা তাহার সাধন কিছু স্বীকার করিতে হইলে, বেদ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ, বেদ স্পষ্টভাবেই অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাহার লাভের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্মশান।

(লেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত।)

পৃথিবীর সুখ শোক,—
সমান করিয়া লয়েছ শ্মশান,
পাতিয়া আপন বুক।
কত না কালের হাসি কোলাহল,
কত ক্রন্দন, খেদ অবিরল,
দিক্ হ'তে এসে এক হ'য়ে শেষে
একাকার এক(ই) ভোগ।
উৎসব-গীতি, মিলনের প্রীতি,
বিরহবেদনা, মরণের ভীতি

পাশেই শয়ান পাশেই প্রয়াণ,
হে শ্মশান শেষলোক।

প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্।

(লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অপিচ,— মৃতানামপিজন্তূনাং শ্রাদ্ধঞ্চেত্তৃপ্তিকারণং
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সম্বর্দ্ধয়েচ্ছিখাং ॥

(সশিষ্যচার্ব্বাকের প্রবেশ)

চার্ব্বাক। (শিষ্যের প্রতি) বৎস! জান, দণ্ডনীতিই একমাত্র শাস্ত্র, "বেদ,—ধূর্ত্তের প্রলাপ মাত্র"—এই অতি সত্য কথাটী যা'র অন্তর্ভুক্ত—

কর্ত্তৃ ক্রিয়া দ্রব্যনাশে যদি স্বর্গ হয়,
দাব-দগ্ধ বৃক্ষে তবে হোক্ ফলোদয়!
মৃত জীবের শ্রাদ্ধ যদি তৃপ্তির কারণ,
তৈলে হোক্ নির্ব্বাপিত দীপের বর্দ্ধন!

শিষ্যঃ। আচলিঅ! জই এসোজ্জেব পুলিসখো জং
খজ্জএ জংপিজ্জএ তাকিং এদেহিং তিত্থিএহিং
সংসালসোখ্খং পলিহলিঅ অপ্পা ঘোলঘোলেহিং
পলাঅ সট্ঠআল পহুদিহিং ব্বদেহিং খবিজ্জই? *

শিষ্য। আচার্য্য! যদি পান-ভোজনই পুরুষার্থ হয়, তা হ'লে এই সকল তীর্থবাসিগণ অত্যন্ত কষ্টকর 'পরাক' 'ষষ্ঠকাল' প্রভৃতি ব্রতাবলম্বন ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেন কেন?

চার্ব্বাক। ধূর্ত্তপ্রণীতাগমপ্রতারিতানামাশামোদকৈস্তৃপ্তিরিয়ং মূর্খানাং। পশ্য;—

---

* আচার্য্য! যদ্যেষএব পুরুষার্থ যৎখাদ্যতে যৎপীয়তে তৎ কিমেতৈস্তীর্থিকৈঃ সংসারসুখং পরিহৃত্য আত্মা ঘোরঘোরৈঃ পরাক-ষষ্ঠকাল-প্রভৃতিভিঃ ব্রতৈঃ ক্ষেপ্যতে। ইতি সং।

কালিঙ্গনং ভুজনিপীড়িতবাহুমূল-
ভুগ্নোন্নতস্তনমনোহরমায়তাক্ষ্যাঃ ॥
ভিক্ষোপবাসনিয়মার্ক মরীচিদাহৈ-
র্দেহোপশোষণবিধিঃ কুধিয়াংক্বচৈষঃ ॥

চার্ব্বা। ধূর্ত্তপ্রণীত শাস্ত্রে প্রতারিত মূর্খগণের ওচ্ছি আশামোদকের তৃপ্তি!

বেহাগ—খেমটা—

অবোধের ব্যাপার দেখে বড় হাসি পায়।
(বড়হাসি পায় তারে বলিহারি যাই)
সুখ সুখ ব'লে তারা, মাথায় বহে দুঃখের ভরা,
ব্যাটারা কি দিশেহারা উল্‌টাপথে ধায় (সদা উল্‌টা ইত্যাদি)
থাক্‌তে এমন্ রমণ-সুখ তারে মানে মহাদুখ
হেরে না কভু নারীর মুখ, বলে দুঃখহেতু হয় (তারা বলে দুঃখ ইত্যাদি)
সুখ সুখ ব'লে তারা, অনাহারে হ'য়ে সারা
সূর্য্য করে শুক্‌না সারা দগ্ধকাষ্ঠ প্রায় (পড়ে থাকে দগ্ধকাষ্ঠ প্রায় ✠)।

শিষ্য। আচালিঅ! এবং তিত্থিআ আলবন্তি দুখমিস্‌সিদং সংশালসোক্খং পলিহলনিজ্জং ত্তি। ✱

শিষ্য। আচার্য্য! তীর্থবাসিগণ বলেন যে, সংসারে সুখ আছে সত্য, কিন্তু উহা দুঃখমিশ্রিত, সুতরাং উহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

চার্ব্বা। (বিহাস্য) আঃ দুর্ব্বুদ্ধিবিলসিতং পশূনাং—

ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্মপুংসাং।
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা ॥
ব্রীহীন্‌জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্।
কোনাম ভো! তুষকণোপহিতান্‌হিতার্থী? ॥

(হাস্য করিয়া) আঃ! পশুগণের কি দুর্ব্বুদ্ধি!

বিষয়ের সুখ দুঃখ-মিশ্র একারণ
অবশ্য করিবে ত্যাগ, বলে মূর্খ জন ॥

✠ মূল শ্লোকটির অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিলে বিশেষ অশ্লীল হইবার আশঙ্কায় ভাবানুবাদ করিলাম।　　লেখক।

✱ আচার্য্য এবং তীর্থিকা আলপন্তি দুঃখমিশ্রিতং সংসার সুখং পরিহরণীয়ং ইতি সং।

শুভ্রোত্তম তণ্ডুলাঢ্য ধান্য কোন্ জন
বল ত্যাজে দেখি তাহে তুষের বেষ্টন ?

মহা। অয়ে! চিরেণখলু প্রমাণবহির্বচনানি কর্ণসুখমুপজনয়ন্তি। (বিলোক্য সানন্দং) হন্ত! প্রিয়সুহৃদস্মাকং চার্ব্বাকঃ!

আহা! বহুকাল পরে এই প্রমাণপূত বাক্যগুলি আমার কর্ণসুখ উৎপাদন কোর্‌ছে (দেখিয়া সানন্দে) ওঃ! আমাদের প্রিয় সুহৃৎ চার্ব্বাক্ যে!

চার্ব্বা। (বিলোক্য) এষ মহারাজো মহামোহঃ। (উপসৃত্য) জয়তি জয়তি মহারাজএষ চার্ব্বাকঃ প্রণমতি।

(রাজাকে দেখিয়া) এইত দেখ্‌ছি মহারাজ মহামোহ। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক—আমি চার্ব্বাক, প্রণাম হই।

মহা। চার্ব্বাক! স্বাগতন্তে? ইহোপবিশ্যতাং।

চার্ব্বাক! তোমার মঙ্গল ত? এখানে বোস।

চার্ব্বা। (উপবিশ্য) দেব! কলেঃ সাষ্টাঙ্গপাতঃ প্রণামঃ

কলি সাষ্টাঙ্গে আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন।

মহা। অথকলের্ভব্যমব্যাহতং?

কলির কুশলত?

চার্ব্বা। দেবস্য প্রসাদাৎ সর্ব্বমব্যাহতং নির্বর্ত্তিতকর্ত্তব্যশেষশ্চ দেবস্য পাদমূলং দ্রষ্টুমিচ্ছতি যতঃ,—

আজ্ঞামবাপ্যমহতীং বিষতাং নিপাতাৎ।
নির্ব্বর্ত্ত্যতাং সপদি লব্ধমুখপ্রসাদঃ
উচ্চৈঃ প্রমোদমনুমোদিতদর্শনঃ সন্
ধন্যোনমস্যতি পদাম্বুরুহং প্রভুনাং॥

মহারাজের অনুগ্রহে সব দিকেই মঙ্গল, সামান্য কিছু কাজ বাকী আছে, সেটুকু শেষ হ'লেই কলি এসে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কোর্‌বেন। শত্রু-বিনাশাদি কোনও মহৎকার্য্যভার প্রাপ্ত হ'য়ে শত্রু-বিনাশ কার্য্য সম্পন্ন কোরে প্রসন্নমুখে প্রভুর আদেশ পেয়ে যে ভৃত্য তাহার পাদমূলে প্রণাম কো'র্‌বার সৌভাগ্যলাভ কোর্‌তে পারে সেই ধন্য!

মহা। অথ তত্রকিয়ৎসম্পন্নং?

" কলির কাজ কতদূর হ'য়েছে?

চার্ব্বাক। দেব!

ব্যতীতবেদার্থপথঃ প্রথীয়সীং যথেষ্টচেষ্টাং গমিতোমহাজনঃ।
তদত্রহেতুর্ন কলির্নচাপ্যহং প্রভুপ্রভাবোবিতনোতি পৌরুষং॥

তত্রোত্তরপাধিকাঃ পাশ্চাত্যাশ্চ ত্রয়ীমেবত্যাজিতাঃ শমদমাদীনাস্তু কৈব-চিন্তা অন্যত্রাপি প্রায়শোজীবিকামাত্রফলৈব ত্রয়ী। যথাহাচার্য্যঃ :—

অগ্নিহোত্রংত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাংজীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥

তেনকুরুক্ষেত্রাদিষু তাবদ্দেবেন স্বপ্নেঽপি নবিদ্যাপ্রবোধোদয়ঃ শঙ্কনীয়ঃ।

চার্ব্বাক। দেব!—

ত্যজি বেদপথ অ'জ মহাজনগণ
হইয়াছে দেখ স্বেচ্ছাচারপরায়ণ॥
এ বিষয়ে হেতু নই আমি কিম্বা কলি,
প্রভুর প্রভাব ইহা জানিও সকলি॥

রাজন্! উত্তর ও পশ্চিমদেশীয় লোকেরা বেদই ত্যাগ কোরেছে। শম-দমাদির কথা আর কি বোল্‌ব? অন্যত্র যেখানে একটু আধটু বেদের চর্চ্চা দেখা যায়, সে কেবল জীবিকার জন্য! আচার্য্য ঠিক্‌ই বলেছেন,—

অগ্নিহোত্র ত্রিদণ্ড বেদ ভস্মাবগুণ্ঠন।
জীবিকা পৌরুষবুদ্ধিহীন যেইজন॥

অতএব কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে স্বপ্নেও আর বিদ্যাপ্রবোধচন্দ্রের উদয়ের আশঙ্কা কোর্‌বেন না।

মহা। সাধুসম্পাদিতং মহৎখলুতীর্থং ব্যর্থীকৃতং

ভাল, ভাল, অতি উত্তম কাজ কোরেছে, একটা বড় তীর্থ ব্যর্থ কোরেছে।

চার্ব্বাক। অন্যচ্চ বিজ্ঞাপ্যমস্তি

আর একটী নিবেদন আছে।

মহা। কিন্তৎ?

কি?

চার্ব্বাক। অস্তি বিষ্ণুভক্তির্নাম মহাপ্রভাবা যোগিনী সাচ যদ্যপি কলিনা বিরলপ্রচারাকৃতা তথাপি তদনুগৃহীতান্বয়মবলোকিতুমপি প্রভবামঃ তত্র দেবে-নাবধাতব্যং।

চার্ব্বাক। 'বিষ্ণুভক্তি' নামে মহাপ্রভাবসম্পন্না একটি যোগিনী আছে।

কলির প্রভাবে তাহার প্রচারও অতিবিরল, তবুও যে দুটি একটি লোক তাঁর অনুগৃহীত, তাঁদের দিকে আমরা তাকাইতেও সাহস পাই না—এবিষয়ে মহারাজের যা কর্ত্তব্য হয় কোরবেন।

মহা। (সভয়মাত্মগতং) আঃ! প্রসিদ্ধা মহাপ্রভাবা যোগিনী সা স্বভাব-বিদ্বেষিণী চাস্মাকং দুরুচ্ছেদাচ ভবতু (প্রকাশং) অলমনয়াশঙ্কয়া কামক্রোধাদিষু প্রতিপক্ষেষু কুতোঽয়মুদেষ্যতি? তথাপি লঘীয়স্যপি রিপৌজনে হবহিতেন জিগীষুণা-ভাব্যং যতঃ ;—

বিপাকদারুণোরাজ্ঞাং রিপুরল্পোঽপ্যরুন্তুদঃ।
উদ্বেজয়তি সূক্ষ্মোপিচরণং কণ্টকাঙ্কুরঃ॥

কঃ কোঽত্র ভোঃ?

মহা। (সভয়ে) (আত্মগত) উঃ! সে যোগিনী ত মহাপ্রভাবসম্পন্ন হ'লে বিশেষ প্রসিদ্ধা এবং স্বভবতঃই আমাদের প্রতি বিদ্বেষিণী, আমাদের পক্ষে তার উচ্ছেদসাধন দুষ্করও বটে। (প্রকাশ্যে) যাক্—ও আশঙ্কা আমার বৃথা। কাম ক্রোধাদি প্রতিপক্ষ থাক্‌তে কি কোরে বিষ্ণুভক্তির উদয় হবে? তা হ'লেও নিশ্চিন্ত থাকা নয়। শত্রু যদি সামান্যও হয়, জয়েচ্ছু ব্যক্তির তাকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়।

হ'লেও সামান্য রিপু পরিণামে হায়
হইয়া দারুণ মহা অনর্থ ঘটায়॥
অতি সূক্ষ্ম কণ্টক(ও) বিদ্ধ হ'লে পায়
সর্ব্বদেহে উদ্‌বেগ জনমে নিশ্চয়॥

কে আছ এখানে?

(ক্রমশঃ)

রাবণ-বধ।

(লেখক—সম্পাদক।)

কহিল মাতলী:—"মৃত্যুকাল উপস্থিত
এবে রাবণের, অগস্ত্য-প্রদত্ত শরে
দুরাত্মার প্রাণনাশ কর অবিলম্বে"।
অমনি ছুটিল, বজ্রি বাহু বিসর্জ্জিত
দুর্দ্ধর্ষ বজ্রের ন্যায়—দীপ্তানলসম
শর দ্রুতবেগে, অবার্য কৃতান্তপ্রায়,
দীর্ণ করি পাপাত্মার পাষাণহৃদয়;
বজ্রহত বৃত্র প্রায়, পড়িল ভূমিতে
রাক্ষসেন্দ্র লঙ্কেশ্বর দিব্যরথ হ'তে।
অনাথ রাক্ষসসেনা, হাহাকার-রবে
পলাইল দ্রুতবেগে রণক্ষেত্র হ'তে।
বানরের জয়ধ্বনি উঠিল গগনে;
কাঁপিল রাক্ষসগণ লঙ্কাপুরীমাঝে।
হনুমান্, বিভীষণ, অঙ্গদ, সুগ্রীব,
ত্বরা করি আসিলেন রাম-সন্নিধানে।
সসম্ভ্রমে পাদযুগ করিয়া গ্রহণ
নির্ব্বাকে হৃদয়ানন্দ জানালেন সবে।
লক্ষ্মণের নেত্রবারি করিল প্লাবিত
রামচন্দ্র তপ্ত-বক্ষঃ বৈদেহী-নিলয়।
প্রকৃতি ধরিল এবে প্রশান্ত মূরতি;
মন্দমন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল,
সুবিমল নভস্থল, প্রসন্ন হইল
দিগ্‌গণ এবে, স্থিতপ্রভ দিবাকর—
দিবা অবসানে, শোভিলেন রামচন্দ্র
স্বীয় সৈন্যমাঝে, দেবদলে ইন্দ্র যথা।

চর্‌কাচ্ছন্দ।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।)

বিদেশীয় যন্ত্রের নাহি কোন দরকার,
পর সবে এইবার কাপড়টা চর্‌কার।
ছল রাখ, কথা শোন, এ সময় ভাব্‌বার—
বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভাই কর ঠাঁই চর্‌কার।
চর্‌কার ঘর্ঘর বল্‌ছে যে বারবার
বাড়ী বাড়ী দরকার আজকাল চর্‌কার।
হাতখালি হাতখালি—খাক্তি যে পয়সার,
তেল নূন এনে দেবে দৌলতে চর্‌কার।
মাঠে আছে চাল ডাল তরকারী যার যার,
বুনে ফেল কাপড়টা এইবার আপনার।
চর্‌কার ঘর্ঘর বলছে যে বারবার
বাড়ী বাড়ী দরকার আজকাল চর্‌কার।
পিকেটিঙে কাজ কিবা, চীৎকারে ফল ছাই,
সব দেবে ঠিক্ জেন ওই এক চর্‌কাই।
হরতাল তালে থাক্, গোলমালে দরকার?
দেও জোর সবে মিলে চর্‌কায় আপনার।
চর্‌কার ঘর্ঘর বল্‌ছে যে বারবার
বাড়ী বাড়ী দরকার আজকাল চর্কার।

বস্ত্র ও সভ্যতা।

শীতবারণের জন্য সকল জীবেরই দেহ আচ্ছাদিত করিবার প্রয়োজন হয়। পশুর সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত, পক্ষীর শরীর পালকে আচ্ছাদিত, মৎস্যের দেহ শল্কে সমাচ্ছন্ন। প্রকৃতিই জীবগণের দেহরক্ষা করিবার নিমিত্ত দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে বিভিন্নপ্রকার আবরণ বা আচ্ছাদনের আয়োজন করেন।

শীতপ্রধান দেশে স্বাভাবিকভাবেই শীতের প্রাচুর্য্য, সে দেশের পশুপক্ষীর শরীরও (গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পশুপক্ষীর দেহের তুলনায়) অধিক রোমশ। দেখা যায়, ইউরোপীয় কুকুরের গাত্রের লোম দীর্ঘ, এতদ্দেশের কুকুরের দেহের লোম তদপেক্ষা হ্রস্ব। বৃক্ষদেহের ত্বক্‌ও বস্ত্র বা আচ্ছাদনের কার্য্য করে। উহাও প্রকৃতির দান,—উদ্দেশ্য শীতনিবারণ। শীতপ্রধান দেশের বৃক্ষের গাত্রে ত্বকের অতিরিক্ত আর একটী আবরণও দেখা যায়।

প্রকৃতি স্বয়ংই অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করেন—প্রয়োজন মতে পূরণ বা হরণ করেন। শীতপ্রধান দেশের পশ্বাদি প্রাণী, সহসা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আনীত হইলে, হয় আকস্মিক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, নয় তদ্দেশের উপযোগী পরিবর্ত্তিতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবিত থাকে। শীতপ্রধান দেশের দীর্ঘরোমা জীব, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া জীবিত থাকিলে, প্রকৃতি যেন স্বহস্তে তাহার দীর্ঘলোম ছাটিয়া কাটিয়া খাট করিয়া দেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের হ্রস্বলোমা জীব, শীতপ্রধান দেশে নীত হইয়া জীবিত থাকিলে, ক্রমে প্রকৃতির অনুকূলতায় তাহার হ্রস্ব লোম দীর্ঘতা লাভ করে। পশ্বাদির ন্যায় আদিমযুগের মানবের দেহেও দীর্ঘ রোমরাজী বিরাজিত ছিল, অনুমান করা যায়।

লোম প্রকৃতিদত্ত সম্পৎ, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মানুষ প্রাকৃতিক-ভাব ত্যাগ করিয়া, শিক্ষা-বশে—অভ্যাসবশে, পুরাকালের অবস্থা অনেকটা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিগণ প্রকৃতির অধিকারের বাহিরে যাইতে পারে নাই—প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য করিতে পারে নাই, সুতরাং অনেকটা অপরিবর্ত্তিতভাবেই রহিয়াছে।

মানবেরা বস্ত্রবয়নাদি-কৌশল আবিষ্কার করিয়া, কৃত্রিম উপায়ে শীত-নিবারণের চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের প্রকৃতিদত্ত দীর্ঘ লোম ক্ষুদ্রতা লাভ করিয়াছে। মনুষ্যদেহ এখনও লোমাবরণে আবৃত, তবে পূর্ব্ববৎ দীর্ঘলোম আর নাই। মানুষ প্রকৃতির অধিকারের বাহিরে যতই যাইতেছে, ততই তাহার স্বাভাবিক লোমসম্পদ্ হ্রাস পাইতেছে—বস্ত্রব্যবহারেও সে তত অধিক অভ্যস্ত হইতেছে।

লজ্জানিবারণের উদ্দেশে বস্ত্রব্যবহার অল্পদিনই আরব্ধ হইয়াছে। 'কত অল্পদিন লজ্জাবারণার্থে বস্ত্রব্যবহার চলিতেছে'—জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা উত্তর দিব যে, সভ্যতার বিকাশ যতদিনের, লজ্জাবারণার্থে বস্ত্রপরিধানও ততদিনের। সভ্যতার ধারণা—লজ্জাবোধ অতিপ্রাচীনকালে আদৌ ছিল না।

খৃষ্টীয়ধর্ম্মপুস্তকপাঠে অবগত হওয়া যায় যে—

আদিমযুগের আদিমানব 'আদম' প্রথমে নগ্ন ছিলেন। পরে তিনি ইভের প্ররোচনায় যখন জ্ঞানফল ভক্ষণ করিলেন, অমনি লজ্জা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল, তখন লজ্জাবারণের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন হইল। মনে 'পাপ'-বোধ হইলেই লজ্জার আবির্ভাব হয়, পাপ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত লজ্জার বিকাশ হয় না।

অসভ্য মানবগণ নগ্নদশায় জীবনযাপন করে; তাহাদের পাপবুদ্ধি নাই; যাহাদের মধ্যে জ্ঞানের একটু অঙ্কুরিতভাব দেখা যায়, সেই অপেক্ষাকৃত অল্প-সভ্য অসভ্যপ্রায় মানুষেরা সম্পূর্ণ নগ্নভাবে অবস্থান করে না, আবার সুসভ্য মানবের মত সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত করিয়াও রাখে না; তাহারা দেহের কতক অংশ আবৃত ও কতক অংশ অনাবৃত রাখে। কিছুদিন পূর্ব্বে গৌরীশঙ্কর-অভিযানের যাত্রিবর্গ শীতপ্রধান উন্নতপার্ব্বত্যপ্রদেশে নগ্নকায় লোমশ মানুষ দেখিতে পাইয়াছেন। ঐ মানুষ যে প্রাকৃতিকভাব অতিক্রম করিয়া, কৃত্রিমতাপূর্ণ সভ্যতার স্তরে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমানে যে মানুষ লজ্জানিবারণার্থে বস্ত্র পরিধান করে, ইহার মূলে সভ্যতার কথা। শিশু নগ্ন, তাহার লজ্জাজ্ঞান নাই; ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইলে শিক্ষাবশে বা সাধারণ দৃষ্টান্তের অনুসরণ-দোষে তাহার হৃদয়স্থ লজ্জাবীজ অঙ্কুরিত হয়, তখন সে বস্ত্র পরিধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। নগ্নভাব, সমাজ-বদ্ধ সভ্যমানবের মনে কামকুচিন্তা আনিয়া দেয়। প্রকাশিত-জননেন্দ্রিয়-দর্শন বা স্পর্শন মনোবিকার উৎপাদন করে। প্রকৃতির বিধানে মানবজাতির জননেন্দ্রিয় বিবৃত। পশ্বাদির জননেন্দ্রিয় কোষমধ্যে আবদ্ধ থাকে, সাধারণতঃ স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় না, একারণ উহা কামোদ্দীপনের পক্ষে অত্যধিক অনুকূল নয়, আর সেই জন্যও পশুদের বস্ত্রব্যবহারের প্রয়োজন নাই। মানব-দেহের অবস্থা পশুদেহের ন্যায় নহে, বরঞ্চ বিপরীত, সুতরাংই মানবদেহ বস্ত্রে আবৃত করিবার প্রয়োজন বোধ হয়।

ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, মানসিক বিকৃতির আশঙ্কায়ই মানুষ প্রধানতঃ বস্ত্র ব্যবহার করে। যাহাদের চিত্তবিকারের আশঙ্কা নাই, তাহাদের বস্ত্রব্যবহারেরও প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তির হৃদয়ে কামবিকারের স্থান নাই, তাহাকে দেখিলে, কাহারও কামবিকার উপস্থিত হয় না, স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই একথা সত্য। পরমভক্ত শ্রীশুকদেব যখন সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন,

তখন তাঁহার পিতা ব্যাসদেব তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। যুবক শুক ছিলেন নগ্নকায়, আর প্রবীণ ব্যাসদেবের পরিধানে ছিল বস্ত্র। নগ্ন শুক যে পথে যাইতেছিলেন, সেই পথের পার্শ্বে জলাশয়ে দেববালারা স্নান ও জলক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহারা তীরে বস্ত্র রাখিয়া নগ্নদেহে জলে অবগাহন করিয়াছিলেন। নগ্ন যুবক শুকদেবকে দেখিয়া তাঁহারা লজ্জিতা হইলেন না, জল হইতে উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন না, কিন্তু যখনই ব্যাসদেব তাঁহাদের নয়নপথের পথিক হইলেন, অমনি তাঁহারা লজ্জায় আকুল হইলেন। তাঁহারা ব্যস্তত্রস্তভাবে বসন পরিধান করিয়া লজ্জা রক্ষা করিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেববালাগণ, তোমরা নগ্নযুবক শুককে দেখিয়া লজ্জা বোধ করিলে না, আর বস্ত্রাবৃতদেহ বৃদ্ধ আমাকে দর্শন করিয়া লজ্জায় বস্ত্রপরিধান করিতে ব্যস্ত হইলে কেন?" দেববালারা সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন "মহাশয়, যুবক নগ্ন, কিন্তু তাহার চিত্তে স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান নাই, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া আমাদের লজ্জার উদ্রেক হয় নাই, আপনি প্রবীণ, কিন্তু আপনার হৃদয়ে স্ত্রীপুরুষের ভেদজ্ঞান আছে, সুতরাং আপনার দর্শনমাত্রেই আমরা লজ্জা বোধ করিয়াছি।" এই পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়, যাহার হৃদয়ে কামবিকার নাই, তাহার বস্ত্রপরিধানের প্রয়োজনও নাই; তাহাকে নগ্ন দেখিয়া অন্যেরও বস্ত্রপরিধান করিবার কারণ নাই। অনেক সময় দেখাযায়, কামুকব্যক্তি, সাধ্বী রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াও কিজন্য যেন নিবৃত্ত হয়। সাধ্বীর হৃদয়ে কামের স্থান নাই, তাহার দর্শনে কামুকের কামভাব বিদূরিত হয়। বালকের মত নিষ্কাম হইতে পারিলে আর বস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ বস্ত্র লজ্জাবারণ।

শীতনিবারণ-জন্য যদিও বসনের সৃষ্টি, তথাপি সভ্যতাসৃষ্ট লজ্জাবারণেই যে উহার পুষ্টি, একথা অস্বীকার করা যায় না। শীতবারণের প্রয়োজন না থাকিলেও বস্ত্রপরিধান যখন সভ্যতানুমোদিত প্রথা বা ফ্যাসন হইয়া গেল, তখন মানুষ বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিতে বিধিমত প্রয়াস পাইতে লাগিল। তখন স্থির হইল, যে অনাবৃতদেহ সে অসভ্য, আর যে বস্ত্রাবৃত সে সভ্য। কাজেই সভ্যানুগতিকভাবে প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও এই উষ্ণপ্রধানদেশে বস্ত্রজালে শরীর আবৃত রাখিয়া, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইতে, ব্যজনের সাহায্যে কোনও মতে অস্বস্তি নিবারণ করিয়া, 'অসভ্য' অপবাদ মোচন করিতে মানুষ আগ্রহান্বিত

হইল। যাহাতে প্রয়োজন-বোধ নাই, অশান্তি অতৃপ্তি আছে, তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে—কৃত্রিমতাপূর্ণ সভ্যতার কি উৎকট ভাব। সভ্যতা অনেক-সময়ে উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত রাখিতে তত আপত্তি করে না, কিন্তু নিম্নাঙ্গ অনাবৃত রাখিলে আর সভ্যসমাজে স্থানলাভ সম্ভব হয় না। সভ্যতার সঙ্গে বস্ত্রের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ঘটিয়াছে।

মানব জ্ঞানবিজ্ঞানে শিল্পনৈপুণ্যে যত উন্নতিলাভ করিয়াছে, ততই বস্ত্রবয়ন, সূত্ররচন, রঞ্জন প্রভৃতি কার্য্যে তাহার অনুরাগ দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পবিজ্ঞানে সমুন্নত দেশ ধনীর দেশ, আর শিল্পনৈপুণ্যবিহীন দেশ দরিদ্র। দরিদ্র অসভ্য, ধনী সভ্য,—ইহাই অধুনাতন সভ্যলোকের ধারণা। ধনীর দেশে শিল্পী থাকে, বণিক্ থাকে, সে দেশে বস্ত্রও থাকে, বস্ত্রের ব্যবহারও থাকে। দরিদ্রের ধন নাই, শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই, সে পরমুখাপেক্ষী হীনাতিহীন। ধন, শিল্প ও বসন-রচনাদির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সভ্যতা ও বস্ত্রের সম্পর্ক সম্ভব হইয়াছে।

প্রাচীনভারতে শিল্প বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বস্ত্রব্যবহারও বহুপ্রচার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কার্পাস, শণ, পট্ট, কৌষেয় সূত্র, পশুলোম প্রভৃতি দ্বারা ভারতীয়েরা উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতেন। বৃক্ষবল্কলও পুরাকালে ভারতে বস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। সূত্ররচনার উপকরণ ভারতে প্রচুর ছিল ও আছে। ভারতবর্ষে সভ্যতার বিস্তৃতি ও বস্ত্রপরিধান-প্রথার সমুন্নতি ঘটিয়াছিল, কিন্তু বস্ত্রব্যবহারে অনর্থক বাড়াবাড়ি ভারতে ছিল না। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এখানে সাধারণতঃ পরিধেয় ও উত্তরীয় এই দ্বিবিধ বস্ত্রই ব্যবহৃত হইত। কবচ বা অঙ্গরক্ষাবস্ত্র কেহ কেহ ব্যবহার করিতেন। এদেশে ধনীর প্রাসাদে বস্ত্রবাহুল্য কদাচিৎ দৃষ্ট হইত, কিন্তু মধ্যবর্ত্তীর বা দরিদ্রের গৃহে বস্ত্রব্যবহার চিরকালই সংযত ছিল।

প্রাচীন মানুষেরা বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিয়াছিলেন কিরূপে,—এ বিষয়ে আলোচনা করিলে মনে হয় যে, প্রকৃতিই মানবের শিক্ষয়িত্রী, প্রাকৃতিক সামগ্রীই মানবের শিক্ষার আদর্শ বা অবলম্বন। মানব সংসারে আসিয়াছেন সর্ব্বপ্রাণীর শেষে। মানব জীবের চরমউন্নতি। মানব যখন প্রকৃতিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন, বাবুইপক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করে—কেমন কৌশলে সে আতান-বিতান (টানা পোড়েন) এই উভয়শ্রেণীর সুবিন্যাসে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। মানুষ তাহার অনুকরণে ওত-প্রোত বা আতান-বিতান

মিলাইয়া বসন বয়ন করিলেন। বৃক্ষত্বক্ জলে পচিলে সূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া দৃষ্ট হইল, মানুষ সেগুলি পৃথক্ ও শুষ্ক করিয়া লইয়া, বয়ন আরম্ভ করিল। প্রাচীনকালে গৃহিণীরা বস্ত্রবয়ন করিতেন ও কুমারীরা সূত্ররচনা করিত। গৃহিণীদের Wife নাম এবং বয়নকারীর Wever নাম—একই ভাব বুঝাইয়া দেয়। কুমারীগণের Spinster নামও বেশ বুঝাইয়া দেয় যে, তাহারা Spining বা সূত্রপ্রণয়ন করিত। প্রাচীনকালের পদ্ধতি এই ছিল যে, কর্ত্রীরা তাঁত বুনিতেন, কুমারীমেয়েরা সূতা কাটিয়া দিত। সমগ্র সভ্যদেশে এই ভাব ছিল।

ভারতে বস্ত্ররচনার উদ্ভব, পরে গ্রীসে ইহার প্রচার, শেষে তথা হইতে ইউরোপের সর্ব্বত্র এই পদ্ধতির প্রসার হয়। ভারতে ইহার উৎপত্তি হইলেও ইহার অপব্যবহার হয় নাই,—মাত্র বস্ত্র দ্বারা সভ্যতার পরিমাপ হয় নাই, ইহা ভারতের গৌরবের কথা। প্রাচীনভারত ধনে জ্ঞানে বরণীয় ছিল, বস্ত্রব্যবহারেও সুসভ্য ছিল, কিন্তু ভারতের ধনী ধন ছাড়িয়া, বস্ত্র ছাড়িয়া, ত্যাগ-মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া, কৌপীনখণ্ড মাত্র ধারণ করিয়া, কখনও বা নগ্ন হইয়া, সন্ন্যাসী হইতেন; সামর্থ্য-সত্ত্বে—সম্পৎসত্ত্বে ত্যাগ করিতেন, কিন্তু তখন তিনি অসভ্য-নামে অভিহিত হইতেন না। জ্ঞানী ত্যাগী নগ্নও সভ্য, অজ্ঞ ত্যাগহীন বস্ত্রাবৃত মানুষও ভারতীয় আদর্শে সুসভ্য না হইতে পারে। অক্ষমতাবশতঃ যাহার বস্ত্রব্যবহার-সম্ভাবনা নাই, সে অসভ্য বটে, কিন্তু যে সামর্থ্য-সত্ত্বেও ত্যাগ করিয়াছে, সে সুসভ্য-নামে খ্যাত হইবে না কেন? ভারতের গৌরবস্বরূপ আর্য্যসন্ন্যাসীরা—পরমহংসেরা নগ্ন—একথা সত্য। খ্যাতনামা মহাত্মা গান্ধীও একখণ্ড খদ্দর মাত্র পরিধান করেন। এখানে বস্ত্রের সঙ্গে সভ্যতার সম্বন্ধ আলোচনা করা বিড়ম্বনা। মোট কথা এই যে, ত্যাগী নিষ্কাম নগ্ন হইলেও সভ্য, অসমর্থ কামনাশীল পরদত্ত বস্ত্রে আবৃতদেহ জীব একভাবে অসভ্য। ত্যাগেই মানবের উৎকর্ষ—একথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। দেশ হইতে বস্ত্রব্যবহারের বাড়াবাড়ি কমাইয়া দিলে, এ দুর্দ্দিনে দেশের প্রচুর উপকার সাধিত হইবে—ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আর্থিক লাভ ত আছেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতিও যথেষ্ট হইবে। চিন্তাশীলগণ আলোচনা করিবেন, আশাকরি।

বস্ত্র ও সভ্যতার সম্পর্ক আলোচনা-প্রসঙ্গে একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। অষ্ট্রেলিয়ার এক খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মযাজক একদা ভারতবর্ষ-দর্শনে আগমন করেন। নানাস্থান দর্শন করিয়া তিনি যশোহরে উপস্থিত

হন। যশোহরের খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মযাজক শ্রীযুক্ত গোল্ডহ্যাক্ সাহেবকে তিনি বলেন যে, তিনি এদেশীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক। শ্রীযুক্ত গোল্ড-হ্যাক্ সাহেব তাঁহাকে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের বাটীতে সঙ্গে করিয়া আনেন। অষ্ট্রেলীয়ান্ ধর্ম্মযাজক যখন আগমন করেন, তখন বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক নগ্নগাত্রে মেজের উপর গালিচায় বসিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছিলেন। সাহেবেরা অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত নানাপ্রসঙ্গ করিলেন। শেষে অষ্ট্রেলীয় সাহেব বলিলেন "আপনাকে নগ্নগাত্র দেখিয়া, আমার ধারণা হইয়াছিল, সভ্যতা, আপনাদের প্রতি কৃপা করেন নাই; কিন্তু আলাপ করিয়া বিপরীত ধারণা হইল—মনে হইল ভারতবর্ষ সভ্যতায় দরিদ্র নহে।" বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক বলিলেন 'সাহেব, আমাদের অসভ্য মনে করিয়াই বোধহয় তোমাদের দেশে যাইতে দেও না। প্রসিদ্ধ ক্রিকেটবীর রণজিৎ সিংহ মহাশয়ের জন্য তাই তোমরা নূতন আইন্ করিয়াছিলে না?" ইহার পরে, গৃহের দেওয়ালে মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর যে এক চিত্রমূর্ত্তি ছিল, লেখক সেই নগ্নমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন—'সাহেব, এই আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য মহাত্মা। সাহেব, "তোমরা বাইবেল লইয়া স্পর্দ্ধা কর, কিন্তু উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা কর না। মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন "বালকদিগের জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত, বালকদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।" সাহেব, ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছ কি? বালকের ইন্দ্রিয়বিকার নাই; যখন মানুষ বালকের মত ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য হয়, তখনই তাহার স্বর্গরাজ্যে যাইবার অধিকার হয়। সেন্টপল্ বলিয়াছেন "স্বর্গরাজ্যে যাইতে হইলে খোঁজা হইতে হইবে"—তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-বিকারশূন্য হইতে হইবে। ইন্দ্রিয়বিকার যাহার নাই, তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন কোথায়? প্রকৃত নিষ্পাপ নিষ্কাম ও যথার্থত্যাগীর বস্ত্রের আবশ্যক থাকে না। প্রকৃতরূপে বস্ত্রত্যাগী হইতে পারিলেই মানুষ দেবভাব লাভ করে ও খাঁটী সভ্য মানুষ হইতে পারে। কামকলুষে হৃদয় পূর্ণ থাকিলে সহস্রখণ্ড বস্ত্রে দেহ আবৃত করিলেও অসভ্যতা ফুটিয়া বাহির হইবে—এ বিষয় ভারত-বাসীর চিন্তার অতীত নহে।" সাহেব শুনিয়া অবাক্ হইলেন। বস্ত্র ও সভ্যতার সম্বন্ধ স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু নগ্নতার সহিতও সভ্যতার সম্পর্ক আছে, একথা স্বীকার না করিলে চলে না।

সম্পাদক।

আধ্যাত্মিক স্ব-রাজ।

(তৃতীয় প্রবন্ধ)

সৃষ্টি-কাণ্ড অর্থাৎ "সৃষ্টি-রহস্য।"

(লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিরহস্যের ন্যায় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার মত বিচক্ষণ মস্তিষ্ক পাশ্চাত্যদেশে না থাকার জন্যই বোধহয়—ভগবান্ যিশু তাঁহার মেষশিশুদিগের অর্থাৎ ভক্ত অনুগত শিষ্যদিগের মস্তিষ্কের উপর চিন্তার ভার চাপাইতে করুণাবশতই ইচ্ছা করেন নাই। সেইজন্য "মনুষ্যেতর" প্রাণীদের Soul বা আত্মা নাই—এ ধারণা দূর করেন নাই। (১)

(১) খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত বিশ্বাস মতে মানবেতর প্রাণীর 'আত্মা বা Soul নাই। জড়জঙ্গলের ত কথাই নাই। মানবেতর জীবদিগের 'আত্মা' বা Soul নাই, বিশ্বাস রহিয়াছে। জীবাত্মা মানব-অবস্থা হইতে প্রকৃতির অনুগত হইয়া 'পুরুষকার পুরুষার্থ' হারাইয়া কাপুরুষ অপদার্থ হইতে ২ নিম্নাভিমুখ হইয়া এমন অধমতা প্রাপ্ত হয়, আর প্রকৃতি এমন বলিষ্ঠ ভূয়িষ্ঠ হয়, যে, অবশেষে জীব, প্রাণিজগতে স্বস্ব স্বভাব-প্রকৃতি-অনুগত ইতরপ্রাণীতে পরিণত হইতে পারে।

প্রাচীনকালে পাশ্চাত্যপ্রদেশের মানবগণকে ইতর জীব (প্রাণী,) এমন কি, জড়-জঙ্গলেরও 'আত্মা' বা 'Soul' আছে, উহা অতি 'Latent' বা 'Impotent' অবস্থায় আছে, বা কি ভাবে আছে, তাহা বুঝাইবার সম্ভব ছিল না, কারণ বুঝিবার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক ছিল না। না থাকার জন্যই বোধ হয় ভগবান্ যিশু তাঁহার শিষ্য অনুগত ভক্তদিগকে সাধারণশিক্ষার উপদেশ দিয়াছিলেন যে, মানবেতর প্রাণীর 'Soul' অর্থাৎ 'আত্মা' নাই; নচেৎ আত্মতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান্ যিশু, স্বয়ং যে ইহা জানিতেন না, ইহা মনে করি না। হিন্দু দর্শন অতীব প্রাচীন কাল হইতে "আত্মার সত্তায় চরাচর বিশ্বজগৎ বিম্বিত" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 'আত্মা' বা Soul অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা বিশ্বচরাচরে প্রতিফলিত হইয়া বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—উপনিষদাদি-দর্শন-শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন জড়-জঙ্গম জীবেও (ইতর প্রাণীতেও) আত্মা আছে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

Nature প্রকৃতি বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে মনে হয়, এই জড় প্রকৃতি ধরিত্রীই আমাদের লইয়া তাঁহার 'nursury'তে অর্থাৎ সূতিকাগৃহে পালন করেন। আমরা হিন্দুশাস্ত্রের চৌরাশীলক্ষ-যোনির অন্তর্গত হইয়া, প্রকৃতির পশুশালায়—উদ্ভিদ্‌শালায় Zoological Garden Boatanical garden ইত্যাদিতে প্রকৃতিকর্তৃক পালিত হই।

প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞান, বুদ্ধি চাতুরী, চালাকী, ওস্তাদী ইত্যাদি তখন স্ব স্ব স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে প্রাণিবিশেষের অন্তর্গত হইয়া Instinct পশু-সংস্কার বা জ্ঞানে পরিণত হয়। Preedence, wisdom, Inteligence, Apt, Aptilate, Cleverness. Activity, Act—সব এখানে যাইয়া পরিণতি প্রাপ্ত হয়। উহা প্রাণীদের স্ব স্ব প্রকৃতিগত 'Instinct'রূপে দৃষ্ট হয়।

শুধু কি অধোনতিশেষ এখানেই? পশুপক্ষী, স্থলচর, জলচর, খেচর, ভূচর, উভচর প্রাণীতে অথবা কীট-পতঙ্গে; অথবা বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ অঙ্গেই শেষ পরিণতি? জড়েও যাইতে হয়; জড়প্রকৃতির বিশ্রামাগারে যাইয়া চিরবিশ্রাম অর্থাৎ দীর্ঘবিশ্রাম ('চির' শব্দের অর্থের একটা সীমা নাই) লাভ করিতে হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে (Science) আমার আদৌ জ্ঞান নাই। বিজ্ঞান জড়-সূক্ষ্মাংশ ভৌতিক উপাদান—Phesiques Elemental) হইতে অণুপরমাণু নীহার নীহারিকাদি শৈবালাদি নানা অবস্থা অবস্থান্তর হইতে হইতে সৃষ্টির ক্রমোন্নতি ক্রমসঞ্চারে জড়সৃষ্টি হইতে ক্রমশঃ মানবসৃষ্টি পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া কতকটা জ্ঞাত আছি।

আর্য্যব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে "সৃষ্টিপ্রক্রিয়া"—ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিতেও তাহারই আভাষ পাওয়া যায়। সুতরাং ক্রমোন্নতি থাকিলে ক্রমাবনতিও থাকা উচিত, না থাকা অসঙ্গত; কেন না, ঊর্দ্ধ থাকিলেই 'অধঃ,' এবং 'অধঃ' থাকিলেই ঊর্দ্ধ থাকা সঙ্গত।

উন্নতির ক্রম আছে, আর অবনতির ক্রমও আছে, কিন্তু সব সময় থাকে না। উপরে উঠিতে হইলে ধাপে ধাপে সাবধানে উঠিতে হয়। উত্থান-বেগ তত বেশী নয়, পতনের বেগ যত বেশী। মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের অন্তর্গত থাকিয়া, ধরিত্রীর দিকের আকর্ষণশক্তির পতনের ঝোঁক বেশী। মাধ্যাকর্ষণকেন্দ্রের 'স্বঃ' ভূমিতে (ঊর্দ্ধসীমাতে মধ্যস্থলে) থাকিলে বরং ধরিত্রীর দিকের পতনের

মৌক আকর্ষণ কাটাইয়া—তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো-য়োনঃ প্রচোদয়াৎ—ওঁ—আশা করা যায়। তখন আকর্ষণকেন্দ্রের, উর্দ্ধশক্তি "ভর্গদেবের" আশ্রয়ে ধরিত্রীর স্নেহাকর্ষণের সীমা ছাড়াইয়া ওঁ পর্য্যন্ত যাইবার আশা থাকে।

স্ব জীবাত্মার মাধ্যাকর্ষণের স্থলভূমি—মধ্য Central Base বলিয়া আমার ধারণা হয়। এইজন্য আর্য্য ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে স্বর্গকে একটা বিশেষ কিছু মর্য্যাদা দেয় নাই। উহা একটা আত্মার বিশ্রামস্থান, স্থলভূমি Stage মাত্র—Stage towords perfection উর্দ্ধগত হইবার স্থলভূমি। হিন্দুশাস্ত্রে বলিয়াছে—ধর্ম্ম পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনর্ব্বার ধরিত্রীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়—অর্থাৎ স্ব উর্দ্ধভূমি হারাইলে ক্রমাবনতিতে "ভুব" 'ভূ' লোকে অবতীর্ণ হয়।

আবার সশরীরে পাঁচটি পাঁচটি স্বঃপ্রত্যাগত হইয়া ভুবর্লোকে মানব দেহে স্ব তে অর্থাৎ মানবদেহে জীবাত্মা অর্থাৎ স্ব I or self এ আত্মস্থ—(Soul এ স্থিতি রাখিয়া উর্দ্ধগত হইবার জন্য চেষ্টা করিলে আরও উর্দ্ধে উঠিতে, এমন কি, নির্ব্বাণমুক্তি পর্য্যন্ত—পরমব্রহ্মে বিলীনতা—'ওঁ'পদবীলাভ পর্য্যন্ত হইতে পারে, নচেৎ একেবারেই হাত বাড়াইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ কামনা, মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশুর হাত বাড়াইয়া 'চাঁদ" ধরার ন্যায় দুরাশা হয়।

শিশুর হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরার মধ্যে, আমার মনে হয়, একটা গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে। কেবল যে চাঁদের শুভ্রোজ্জ্বল প্রতিকৃতি দেখিয়া, শিশু চাঁদ ধরিতে চায়, তাহা নহে। শিশু মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া যেন ইঙ্গিতে বলিতেছে যে, "মা! আমি ঐ দেবলোক হইতে আসিয়াছি; আমি দেবশিশু, সংসারপ্রবৃত্তিতে কর্ম্মচালিত হইয়া ঐ উর্দ্ধলোক হইতে (Lunar System) পিতৃযান-পথে সংসারাসক্তিবশতঃ এইস্থানে আসিয়া তোমার ক্রোড়ে উঠিয়াছি। দেবযান-পথ (Solar System) দিয়া Soul বা আত্মার সাহায্যে নিবৃত্তি-মার্গে পিতৃযানপথ (Lunar System) সংসারপ্রবৃত্তি এড়াইয়া (avoid করিয়া) যাইব। আমি ঐ আকাশের চন্দ্র; ঐ আকাশ হইতে তোমার ক্রোড়ে আসিয়া পড়িয়াছি। এস্থান আমার স্থান নয়, এ আমার কর্ম্মভূমি, ভোগ-ভূমি, সাধন-ভূমি। আমি ঐ স্থানের অর্থাৎ উর্দ্ধলোকের জীব, ঐস্থানে যাইব।" জননী অমনি স্নেহে চাঁদ ছানিয়া আনিয়া "খোকার কপালে" (ভালে) টিপ্ দিয়া দেন। খোকার কপালে টিপ্ দেওয়া একটা Mesmeric pass সম্মোহনকার্য্য বলা হয়। মহাদেব চন্দ্রশেখর, ভালে চন্দ্র। টিপ

যেখানে দেওয়া যায়, উহা আমাদের জ্ঞান-নেত্র, দার্শনিকচক্ষু, প্রজ্ঞার চক্ষুর স্থান। চন্দ্রের কলার ন্যায়, জ্ঞান কলা-মণ্ডিত। চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ, আর্যবিজ্ঞান, * চৌষট্টি কলায় বিদ্যমান। চন্দ্র হইতে নিছুনি (ছেনিয়া) করিয়া খোকার ভালে টিপ্ দেওয়া হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(লেখক কবিরত্ন শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ব্যাখ্যা। সর্ব্বধর্ম্মান্ (ধর্ম্মশব্দেন অত্র অধর্ম্মঃ অপি গৃহ্যতে) পরিত্যজ্য (সংত্যজ্য) একং মাং (সর্ব্বাত্মানং) শরণং ব্রজ (মদেকশরণোভব) অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো (সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো) মোক্ষয়িষ্যামি (মোচয়িষ্যামি) মা শুচঃ (শোকং মাকার্ষীঃ)। ৬৬

বঙ্গানুবাদ। তুমি সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; তুমি শোক করিও না। ৬৬

আলোচনা। ভগবানই বেদতন্ত্রাদিপ্রতিপাদিত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের চরম আশ্রয়। তাই ভগবান্ বলিতেছেন—"তুমি সকলধর্ম্মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকেই সকল ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া বিদিত হও।" ভগবানের শরণাগতি ব্যতীত শাস্ত্রীয় লৌকিক বর্ণগত আশ্রমগত কোন ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য নিজবিচারে কিছুই বাছিয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—ভাবে আমিত্ব বিস্মৃত হইলে ভগবানে পূর্ণ নির্ভর হয়। তাহার নাম ভগবদাশ্রয়, তাহারই নাম সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ। গোকুলে গোপাঙ্গনারা

---

* চৌষট্টি কলা বিদ্যা।

পরাভক্তিবশতঃ সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, এমন কি, স্বামি-সেবা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, ভগবৎসেবা সার করিয়াছিলেন, তাই গোপাঙ্গনাদের আত্মসমর্পণ ভগবদ্ভক্তির আদর্শ। উহার নাম সর্ব্ব ধর্ম্মপরিত্যাগ। ৬৬

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

নচাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচমাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। ইদং (গীতার্থতত্ত্বং) তে (ত্বয়া) অতপস্কায় (বেদোক্ত-কর্ম্মানুষ্ঠানহীনায়,—তপোরহিতায়,—শারীরবাচিক-মানস তপো-রহিতায়) ন বাচ্যং অভক্তায় (দেবে দ্বিজে গুরৌ ঈশ্বরে চ ভক্তিহীনায়) ন বাচ্যং অশুশ্রূষবে (গুরুশুশ্রূষামকুর্ব্বতে জনায়) নবাচ্যং (ন বক্তব্যং উপদেষ্টব্যং) (তথা) মাং চ যঃ অভ্যসূয়তি (বাসুদেবং মাং প্রাকৃতং মানুষং মত্ব নিন্দতি। তস্মৈ সমস্তগুণবতে ঽপি ভগবদসূয়াযুক্তায়) ন কদাচন বাচ্যং। ৬৭

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন, তোমার নিকট এই যে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা কখনও শাস্ত্রানুষ্ঠান-তপস্যাবিহীন, ভক্তিবর্জ্জিত, দেবদ্বিজগুরুশুশ্রূষাহীন ব্যক্তিকে বলিও না এবং যে ব্যক্তি আমাকে অসূয়া* করে, তাহাকেও বলিও না। ৬৭

আলোচনা। অনুপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত করিলে, কি দ্রব্য, কি শিক্ষা, সকলই নষ্ট হয়। এজন্য ভগবান্ জীবের চরম লক্ষ্য ও জন্ম-মরণরূপ ব্যাধির ঔষধস্বরূপ মোক্ষের জন্য যে পরম উপাদেয় অতিগুহ্য গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন, ভগবান্ই তাঁহার উপদেশের অধিকারী নির্ণয় করিয়া দিতেছেন। ভগবান্ বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, এই পরমগুহ্য গীতাকথা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানতপস্যাবিহীন ব্যক্তিকে উপদেশ দিও না। "তপস্যা" অর্থে ভগবান্ সপ্তদশ অধ্যায়ে ১৫।১৬।১৭শ শ্লোকে যে শারীর বাচিক ও মানস তপের কথা বলিয়াছেন, তদ্বিহীন ব্যক্তিদিগকে অতপস্ক বলে। বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, গীতার উপদেশ ধারণা করিবার শক্তিও জন্মে না, সুতরাং তপস্যাবিহীন ব্যক্তি গীতার মর্ম্মগ্রহণে অনধিকারী। ঈশ্বরে ও গুরুবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারাই অভক্ত। শাস্ত্রীয় উপদেশ-শ্রবণ ও ভগবদ্গুণশ্রবণ ব্যতীত ভক্তি জন্মে না; তাহাতে প্রবৃত্তিহীন অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া মরুভূমিতে শিশিরবর্ষণের ন্যায় নিষ্ফল। উপাসনাশূন্য এবং সেবাপরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে অশুশ্রূষু বলে। গুরুশুশ্রূষা শিক্ষালাভের একটী উপায়। গুরুকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে ভক্তি করা চাই. গুরুর

সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার আজ্ঞাপালন ব্যতীত তাঁহার প্রীতিপাত্র হওয়া যায় না। শিষ্য গুরুর প্রতি পিতৃবৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান করিবেন,—অবিচারে গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন। পূর্ব্বপূর্ব্বযুগে গুরুশুশ্রূষাগুণে গুরুর কৃপায় বহু শিষ্য বিদ্যালাভ করিয়াছেন। অতএব গুরুশুশ্রূষা জ্ঞানলাভের মুখ্য উপায়। এজন্য যাহার গুরুশুশ্রূষা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি নাই, তাদৃশজনকে গীতাশাস্ত্র উপদেশ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি ভগবানে অসূয়াপরবশ, তাহাকেও গীতার উপদেশ দিতে নিষেধ করিয়াছেন, কারণ যাঁহাকে লাভ করাই গীতাশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি, কখনও গীতার উপদেশের অধিকারী হইতে পারে না। ঈশ্বরে অসূয়া ত্যাগ না করিলে, কেহই সারবস্তু ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না। অনধিকারীকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। এজন্য ভগবান্ বলিলেন যে, তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, শুশ্রূষাহীন এবং বিদ্বিষ্টজনকে কখনও গীতাশাস্ত্রোপদেশ দিবে না। ৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। (এতৈর্দ্দোষৈ রহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রমুপদেষ্টুঃ ফলমাহ) যঃ পরমং (শ্রেষ্ঠং পুরুষার্থসাধনং) গুহ্যং (গুপ্তং গোপ্যতমং) ইদং (গীতা-শাস্ত্রং) মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি (বক্ষ্যতি) স ময়ি পরাং (শ্রেষ্ঠাং) ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ং (নিঃসংশয়ং) মাং এব এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি) ৬৮

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি এই পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের মধ্যে ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমাতে পরাভক্তি করিয়া, নিঃসন্দেহ আমাকে প্রাপ্ত হন। ৬৮

আলোচনা। গীতাতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই ত্রিবিধ যোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ পরিশেষে ভক্তিযোগ কহিয়া গীতার উপসংহার করিয়াছেন। গীতা ভক্তিশাস্ত্র। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগণের নিকট এই গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তিনি ভগবৎকৃপায় নিঃসন্দেহ ভগবানকে প্রাপ্ত হন। ৬৮

নচ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। তস্মাৎ (মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাৎ) মনুষ্যেষু (মনুষ্যানাং মধ্যে) কশ্চিৎ মে (মম) প্রিয়কৃত্তমঃ (পরিতোষকর্ত্তা)

ন (ন অস্তি) তস্মাৎ (মনুষ্যেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাৎ) ভুবি অন্যঃ প্রিয়তরঃ ন চ ভবিতা (কালান্তরে ন ভবিষ্যতি) ৬৯

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্যলোকে গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতার ন্যায় আমার প্রিয়পাত্র কেহই নাই, কেহ হইবেও না। ৬৯

আলোচনা। অভীপ্সিত কার্য্যে যে সহায়তা করে, সেই প্রিয় হয়, ইহা মনুষ্যলোকেও স্বাভাবিক। ভগবান্ মঙ্গলময়, জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান্ ভক্তির অনুগত; ভক্ত তাঁর প্রিয়বন্ধু। ভগবানে ভক্তিযুক্ত না হইলে, কেহ গীতা ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ গীতাতে ভগবন্মাহাত্ম্যই বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ একে ভক্তপ্রিয়, তাহার পর যে ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার মঙ্গলোক্তি ব্যাখ্যা করে, সে যে সর্ব্বোত্তম প্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, গীতাব্যাখ্যা-কারী ভক্তের তুল্য আমার প্রিয় কেহ নাই, কেহ হয় নাই,—কেহ হইবে না। ৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

সান্বয়ব্যাখ্যা। যঃ আবয়োঃ (কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ) ইমং ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাত্ অন-পেতং) সংবাদং (বৃত্তান্তং) অধ্যেষ্যতে (জপরূপেণ পঠিষ্যতি) তেন (পুংসা) জ্ঞান-যজ্ঞেন (বেদপাঠরূপযজ্ঞেন স্বাধ্যায়যজ্ঞেন, সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন) ইষ্টঃ (পূজিতঃ) স্যাম্ (ভবেয়ং) ইতি মে (মম) মতিঃ (নিশ্চয়ঃ) ৭০

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মার্থসাধক কথা (গীতা) অধ্যয়ন করেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকেই পূজা করেন, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৭০

আলোচনা। ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে গীতাব্যাখ্যার ফল বলিয়া এই শ্লোকে গীতা-পাঠের ফল বলিতেছেন। গীতা-পাঠের ফল বেদপাঠের ফলের তুল্য। ভগ-বান বলিলেন যে "যে আমাদিগের এই ধর্ম্মযুক্ত কথোপকথন জপরূপে পাঠ করে, সে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমার পূজা করে।" জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা চতুর্থ অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে জ্ঞানযজ্ঞের অর্থ এইরূপ আছে—"জ্ঞানযজ্ঞাঃ জ্ঞানং শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞোযেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ।" শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন— "স্বাধ্যায়েনবেদেন শ্রবণমননাদিনা তত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞোযেষাং তে স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাঃ।" গীতা-পাঠক বেদপাঠের ফলভোগী হয়েন। বিশেষত এই

শ্রবণ-মনন দ্বারা অর্থবোধপূর্ব্বক বেদপাঠের নাম স্বাধ্যায়যজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞ। গীতার বেলা কিন্তু সম্যক অর্থবোধ হউক্ বা না হউক্, ভক্তিপূর্ব্বক ঐকান্তিকমনে পাঠ করিলে বেদপাঠের ফললাভ হইবে—ভগবান্‌কে পূজা করার ফল হইবে। সঙ্কল্প এবং মননই মানুষের সদসদ্‌গতির মূল। সঙ্কল্প মনন এবং চেষ্টা সৎ হইলে, বাক্য ব্যাকরণদুষ্ট হইলেও উপাসনার দোষ হয় না। প্রথম কথা ভগবান্ "ভক্তিমিচ্ছ" ভক্তানুগত। অপরন্তু শ্রদ্ধা বা অবহেলাতেও যে ভগবান্‌কে ডাকে, ভগবান্ তাহার সন্নিহিত হন। ভগবৎসান্নিধ্যহেতু তাহার মনোমালিন্য বিদূরিত হয়—ভগবানের কৃপায় তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মে। যেমন একখণ্ড লঘুকাষ্ঠকে (সোলাকে) জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহা প্রথমত ভাসিতে থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে তাহাতে জলপ্রবিষ্ট হয়, তাহা জলমগ্ন হয়, তদ্রূপ অবহেলাতে যে ভগবানের নাম করে, ভগবৎকৃপাবারিঅনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার শুষ্ক হৃদয়-কালে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। অন্যমনে ভগবন্নামগ্রহণের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভাগবতে অজামীলের উপাখ্যান। অজামীল দুষ্ক্রিয়াকারী শূদ্রাসেবী ব্রাহ্মণ। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ। অন্তিমসময় স্নেহপ্রবণতায় পুত্র "নারায়ণের" চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাকুল হয়, তিনি পুনঃপুনঃ পুত্র নারায়ণের নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে থাকায় যমদূতের হাত হইতে নিস্তার পান, পরে তাঁহার বিষ্ণুলোকে গমন হয়—ভাগবতে ইহা উক্ত আছে। ভগবৎকথা গীতাশাস্ত্রের ভক্তিপূর্ব্বক-পাঠের ত কথাই নাই। কোন প্রকারে পাঠ করিলেও তাহার চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তির হয়, এবং পরিণামে সদগতি হয়। ৭০

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

পদ-লোপ। আসামের আবগারীকমিশনরের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভাগীয় কমিশনরেরা আবগারীবিভাগের কার্য্য ভাগ করিয়া লইবেন। পদের অভাবে কার্য্যের ক্ষতি হয় নাই। দেশের এই কঠোর দারিদ্র্যের দিনে এইভাবে ব্যয়হ্রাসের ব্যবস্থা করিলে ক্ষতি কি?

হজরৎ মোহানী ও অহিংসানীতি। প্রথিতনামা হজরৎ মোহানী ধৃত হইয়াছেন। সমাচারপত্রে প্রকাশ—গ্রেপ্তারের সময় তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংসানীতির অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়াই গবর্ণমেন্ট অনায়াসে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হজরৎ মোহানী পূর্ব্বে অহিংসানীতির পক্ষপাতী ছিলেন না, বরঞ্চ বিরুদ্ধবাদীই ছিলেন। অহিংসানীতির এই পরিণতি তাঁহার কাছে, সুতরাংই ভাল লাগে নাই। হিংসার পথে তিনি কি মঙ্গলচিন্তা করিয়াছেন, তিনিই জানেন। কোনও চিন্তাশীল নেতাই উহার মধ্যে মঙ্গলের ইঙ্গিত খুজিয়া পাইবেন না।

বলশেভিকরুষীয়া ও জার্ম্মানীর সন্ধিবন্ধন। জেনোয়াসভার সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, বলশেভিকরুষীয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে এক মৈত্রীবন্ধন হইয়া গিয়াছে। ঐ সন্ধিতে নাকি ঐ দুই শক্তি পরস্পরকে সাহায্য করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। বাণিজ্য-সম্বন্ধের ব্যবস্থা ত হইয়াই গিয়াছে, অধিকন্তু এই সাহায্য-বিনিময়। ইউরোপে এই সংবাদ নানাবিধ বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে। জেনোয়াসভা সাফল্যলাভ করুক—জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক—ইহাই এখন সকলের অভীপ্সিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মুক্তি চাই কেন ?

(লেখক শ্রী—)

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"আমি মুক্তি চাই না; সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য, নির্ব্বাণ—কিছুই চাই না; আমি চাই, পুনঃ পুনঃ এই সংসারে আসিতে ও যাইতে; কেন না, তাহা হইলে, মা তোমার নিত্য নবলীলা দেখিতে পাইব।" মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ভক্তের প্রার্থনা, সন্দেহ নাই। যে ভক্ত, সে ত ভগবানের নিকট কিছুই চায় না—চায়, কেবল তাঁহার রূপ-সাগরে ডুবিতে। বিবেকানন্দ ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা

ছিল মুক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি মুক্তি—মোক্ষ চাই; চাই যেন আর এই বাঙ্গালার শ্মশানে আসিয়া নরকঙ্কালসমূহ দর্শন করিতে না হয়। আর কেন চাই—বলিব কি? চতুরশীতিলক্ষযোনি অতিক্রম করিয়া এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া একদিনও ত তাঁহাকে ডাকিতে অবসর পাইলাম না। কবি যেন আমারই প্রাণের কথা কহিয়াছেন—"আমি সকল কাজের পাই হে সময়, তাঁহারে ডাকিতে পাই না।" ভক্ত বলিয়াছেন—

> যদি ডাকার মত পারেম ডাক্‌তে
> তবে কি আর অমন করে—
> তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পারতে॥
> নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
> জানিনে গো কোন কথা বল্‌তে।
> কেবল ডেকে দেখা পাইনে আমি,
> আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে॥"

সত্যই আমার সংসারের দুঃখে কাঁদিতে ২ জনম গেল; তাঁহাকে ডাকিতে সময় পাইলাম না। আমি এ কান্না আমার সর্ব্বমঙ্গলময়ী মায়ের জন্য কাঁদি না—আমি এ কান্না সেই ননীচোরা রাখালের জন্য ব্রজগোপীদের মত কাঁদি না—আমার এ কান্না দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, অনশনক্ষিণ্ন, চীরবাসপরিহিত, তৃণশয্যাশায়ী পুত্রকন্যাদির জন্য। আমি দিন রাত দু'টি পেটের ভাত জুটিবা'র জন্য কত না পরিশ্রম করিতেছি। আহার-নিদ্রা নাই, আমোদ-প্রমোদ নাই, দিনরাত অবিশ্রান্ত-ভাবে মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র কন্যাগণের দু'টি পেটের ভাতের সংস্থানের জন্য কত না চেষ্টা করিতেছি। ইহার উপর দিবসান্তে ঘরে ফিরিয়া কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, পণের অভাবে মেয়ের বিবাহ দিতে পারি না বলিয়া, মেয়ে দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। দেখিতে পাই—জমিদারের খাজনা যথাসময়ে দিতে নাপারায় আমার ছোট ভাইটীকে পেয়াদার হাতে অর্দ্ধচন্দ্র খাইতে হইতেছে। দেখিতে পাই—আট নয় টাকা চাউলের মণ, অথচ মাসিক কেরাণী-গিরির পারিশ্রমিক পঁচিশটী টাকা মাত্র বলিয়া, আমার মায়ের পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, দুরন্তশীতে পিতার গাত্রে একখানি বই দুইখানি বস্ত্র নাই। ছোট ছোট বালক-বালিকাগুলি একটু মিষ্টান্নের জন্য হৃদয়বিদারক চীৎকার করিতেছে, তাহা কিন্তু কিনিয়া দিবার আমার সামর্থ্য নাই! এই সব দেখিয়া শুনিয়া, আমার চিত্ত কি স্থির থাকিতে পারে? আমি এই সংসারের দাবানলের মত ক্ষুধানল মিটাইব, না নিজের আকাঙ্খা মিটাইবার জন্য ভগবানের নাম করিব? সাধক কবি গাহিয়াছেন—

পাগল হ'য়ে ডাক্‌নারে তারে
সে যে পাগল হ'য়ে বেড়ায় সদা তোর লাগি ঘুরে ঘুরে,
তোর লাগি সে বেড়াচ্ছে ঘুরে।
উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে ডাক্‌নারে তারে।
ডাক্ শুন্‌লে পরে রইতে নারে, ছুটে এসে ধর্‌বেরে॥

" কিন্তু আমি তাঁর জন্য পাগল হ'তে পারি কই? সংসারের এই জন-কয়েক লোকের মোটাভাত মোটাকাপড় জুটাইতেই আমি পাগল, তাহার উপর যে সতত আমার জন্য পাগল হ'য়ে আমারই দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি তাহাকে পাইবার জন্য পাগল হইব কিরূপে? কস্তুরিকামৃগ যেমন নিজের নাভিদেশে কস্তুরী রাখিয়া বনের চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ায়, আমিও তেমনি সংসারের বিষয়বাসনার সুগন্ধে "কোথায় আনন্দ" "কোথায় আনন্দ"—করিয়া ঘুরিয়াই বেড়াইতেছি। কত জনমের পর জনম হইল, কিন্তু কোনমতেই তাঁহার দেখা পাইলাম না। যদিও দুর্লভ মানুষজন্ম লাভ করিলাম, কিন্তু লাভ করিয়াই বা কি ফল হইল? অহো-রাত্র পরিবার-প্রতিপালনে এতটা ব্যতিব্যস্ত যে, আশ্বিনমাসে যখন আমার প্রতিবেশীর অঙ্গনে মহামায়ার আগমনে ঢাকঢোলের ধ্বনি হয়, তখন আমি সেই ক্ষণিক আনন্দেও আনন্দিত হইতে পারি না। ছোট ছোট শিশুগুলিকে নববস্ত্র দিতে না পারায় আমার মন তখন অলক্ষিতে কাঁদিতে থাকে।

সত্যই একদিনও জীবনে সুদিনের দেখা পাইলাম না, তাই বড় ক্ষোভে বড় দুঃখে বলিতে হইতেছে—"মাগো বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া আসা-যাওয়ায় কেবল দুঃখ! তাই আমি মুক্তি চাই, এই সংসারের দায় এড়া-ইতে চাই। অন্য কিছু চাই না।"

যদি বল, এ সংসারের সকল দুঃখের—সকল অশান্তির হাত এড়াইলেই যদি তৃপ্ত হও, তবে দুঃখদারিদ্র্যের যেখানে অনুভূতি নাই, সুখশান্তির যেখানে স্পষ্টধারণা নাই, সেই সঙ্কীর্ণচেতন রাজ্যে—অথবা আরও অধিক নিম্নস্তরে অচেতন-নামে পরিচিত সুপ্তচেতন রাজ্যে গেলেও যখন এতাদৃশ কষ্টে কাতর হইতে হয় না, তখন সেখানে যাইয়া সুদীর্ঘ তামসবিশ্রামলাভের প্রার্থনা না করিয়া, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছ কেন? প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি—বোধহীন তামসবিশ্রাম আমার অপরিচিত নহে। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি,

আমি স্থাবরাদিভাবে কৃমিকীটাদিভাবে বহুলক্ষযোনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। সে সকল স্তরের যে সাধারণভাব, তাহা দুঃখ অপেক্ষা আরও নিম্নস্তরের মোহ বা অজ্ঞানের বিলাস, ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। তৎকালে সে সকলভাবের অনেকগুলির মধ্যে সুস্পষ্টপ্রবোধের সাঁড়া পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু ক্রমপরিবর্ত্তনের ফলে, সে সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বুঝিয়াছি যে, অশান্তির রাজ্যে যেমন আত্মার তৃপ্তি নাই অশক্তির রাজ্যেও তেমনই। দুঃখের অনুভূতি এড়াইতে চাই, কিন্তু আত্মস্বরূপ আনন্দের অনুভূতি বিসর্জ্জন দিতে পারি না। আত্মোচ্ছেদে আশঙ্কা হয়। কেবল দুঃখপরিহারই অভীপ্সিত নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাহা আমার নিজস্ব—স্বরূপ স্বভাব—আত্মভাব তাহারও বিকাশ আমার অভিপ্রেত। মুক্তিতে আত্মস্বরূপানন্দে অবস্থান হয়। আগন্তুক ভাববৈচিত্র্য সুখ দুঃখ সবই চলিয়া যায়, কিন্তু আত্মানন্দ ফুটিয়া উঠে, কাজেই আমি তাহা চাই। 'আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুনঃ স্বরাট্' এই যে উপনিষদের বর্ণনা—ইহা যেখানে সার্থকতা লাভ করে, উচ্চে নিম্নে—জীবনে মরণে—যেখানে যেভাবে হউক্ না কেন, তাহাই আমার মুক্তি। আত্মোচ্ছেদ যদি নির্ব্বাণ বা মুক্তি হয়, তবে তাহা আমি চাই না। মুক্তিতে দুঃখনাশ ও আত্মানন্দ আছে, তাই আমি মুক্তি চাই।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৯ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড
৩য় সংখ্যা।

আষাঢ়

১৩২৯ সাল।
১৮৪৪ শকাব্দা

গান।

(লেখক—শ্রীমতিলাল দাস।)

মহামিলনের মধুর গান,
ভরিছে আমার প্রাণ।
চন্দ্র তারায় ফুলে ফলে,
কল্লোলিনী নদীর জলে
উঠিছে সুরের তান;
আকাশ ভরে হাওয়া ছোটে
রঙের শোভা ধরায় লোটে,
সৌন্দর্য্যের জাগে বাণ·
জগৎ ভরিয়া উঠিছে আজিকে
মহামিলনের গান।
অধীর পরাণে মহামাদকতা,
স্ফূর্ত্তির হাওয়া, অরূপ বারতা,

ফুলের চারুবিতান,
ছন্দ সুরভি কবিতা মধুরা,
বিরহ পাগল, বেদনা বিধুরা
উঠিছে মধুর গান।
জগৎ প্লাবিয়া ওঙ্কারঝঙ্কার
চলেছে অফুরাণ—
মহামিলনের মধুর গান,
ভরিছে আমার প্রাণ।

উন্নয়ন ও অপনয়ন।

(লেখক—সম্পাদক)

সম্প্রতি দেশে স্পর্শদোষ দূরীকরণের অনুকূলে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। স্বরাজ-লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্পর্শদোষ দূর করিতে হইবে—মহাত্মা গান্ধি এবং তাঁহার অনুচর ও সহচরবর্গ এইরূপই মনে করেন।

যে সকল লোক অন্ত্যজ কিংবা নীচজাতীয় বলিয়া কথিত হয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরক্ত জনগণ, তাহাদের স্পৃষ্ট অন্নজলাদি গ্রহণ ত করেনই না, এমন কি, তাহাদের স্পর্শ করিলেও নিজেরা অপবিত্র হন মনে করেন—স্নান করেন। এই স্পর্শদোষ কোনও ২ স্থানে অত্যন্ত ভীষণ আকারও ধারণ করে। মাদ্রাজের পারিয়াজাতীয় লোকদিগকে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ—বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণ স্পর্শ করেনই না—কূপ হইতে জল লইতে দেন না—একপথে চলিতেও দেন না। যেন তাহাদের ছায়া-স্পর্শে হিন্দুত্বে—উচ্চবর্ণত্বে—পবিত্রতায় পাপলেপ লাগিবার আশঙ্কা! এ আচার সদাচার হইলেও যে কতকটা অত্যাচারশ্রেণীর, তাহা অনেকেই মনে করেন।

এই স্পর্শদোষদূরীকরণের জন্য ইতঃপূর্ব্বেও যে আন্দোলন না হইয়াছে তাহা নহে, তবে এবারকার আন্দোলনের কিছু বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যাইতেছে।

স্বেচ্ছাসেবকসম্প্রদায়ের অনেকে এই স্পর্শদোষ-পরিত্যাগ কথাটা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতেছেন শুনা যায়। সম্প্রতি অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দু-স্বেচ্ছাসেবক, 'অন্ত্যজ'রূপে পরিচিত লোকদিগের জল ও অন্ন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন শুনা যাইতেছে। চিরাগত সংস্কারবশে এদেশের যাহারা নীচ-জাতীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা এই সকল ব্যবহারে অনেকসময় বিস্মিত হইতেছে—এমন কি, কেহ কেহ উচ্চবর্ণের স্বেচ্ছা-সেবকগণের ঐরূপ কার্য্যে প্রতিবাদও করিতেছে। কোথাও বা ভিন্ন-ধর্ম্মাব-লম্বিগণের বাটীতেও ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে এই হিন্দুস্বেচ্ছাসেবকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইয়া আহার করিতে চাহিতেছে, আর ভিন্নধর্ম্মীর ধর্ম্মোপদেষ্টারা, ঐ হিন্দুস্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত পংক্তিভোজনে আপত্তি করিতেছে, ফলে ঐ হিন্দু-স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বতন্ত্রস্থানে বসিয়া, অন্যধর্ম্মাবলম্বীর অন্নজল গ্রহণ করিয়া, স্পর্শদোষকে উপহাস করিতেছে।

দুই দিকের দুই মত, কার্য্যের দুইপথ। বর্ণাশ্রমানুরক্ত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বলিতেছেন—"স্পর্শদোষ মানিয়া চলা উচিত, না মানিলে ধর্ম্মহানি হয়—পাপ-স্পর্শ ঘটে, আত্মা অধোগতির পথে অগ্রসর হয়।"

দেশহিতৈষী আন্দোলনকারী বলিতেছেন—"স্পর্শদোষ-বিচারই এদেশের অধিবাসিগণের মিলনের অন্তরায়. উহাই পক্ষান্তরে দেশের পরাধীনতার হেতু। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দেশের সকল লোক একমন একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিতে না পারিলে, স্বরাজ-লাভের সম্ভাবনা নাই। যদি একজন অপরজনকে ঘৃণা করে, স্পর্শ করিলেও পাপ হয়—মনে করে, তবে তাহাদের মধ্যে মনোমিলন হওয়া কি সম্ভব? তোমাদের শাস্ত্র-ধর্ম্ম-আচার যদি দেশবাসীর মনে ভেদবুদ্ধিবৃদ্ধির সহায়ই হয়, মানুষের উপর মানুষকে অন্যায় অত্যাচার করিতেই প্রবৃত্ত করে, তবে উহাদের অশাস্ত্র অধর্ম্ম অনাচার মনে করিয়া, দেশের কল্যাণার্থে, তথাকথিত হীনজাতীয় লোকদিগকে কোলে তুলিয়া লইয়া, একপ্রাণতার প্রতিষ্ঠা করাই কর্ত্তব্য। তাহাহইলেই দেশবাসী স্বরাজ-সম্পদ্ লাভ করিতে পারিবেন, অন্যথা অন্ধকারের পর গাঢ় অন্ধকার।

বর্ণাশ্রমবাদী ব্যক্তিগণ বলেন—"স্পর্শদোষ-বিচার মিলনের অন্তরায় নহে, উহাতে ঘৃণার বিদ্বেষের বীজ নাই, উহা আত্মসংস্কার-ধর্ম্মজীবনের পবিত্রতা-রক্ষার অক্ষয় কবচ। সদাচার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। একজন ব্রাহ্মণের আহারের সময়, তাঁহারই পুত্র বা পত্নী অথবা ভ্রাতা যদি তাঁহাকে স্পর্শ করেন, তাহাহইলে

তিনি আহার ত্যাগ করেন। অন্যভাবে দেখা যায়—একপংক্তিতে ৫জন ব্রাহ্মণ আহার করিতেছিলেন—এমন সময় যদি একজন ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান, অন্য কয়জনও আহার করেন না। এ সকল স্থানে ঘৃণা বা বিদ্বেষের প্রসঙ্গই আসিতে পারে না। ব্যক্তিগত পবিত্রতারক্ষার জন্য বর্ণাশ্রমীরা এই সকল আচার গ্রহণ করেন। অনেক ব্রাহ্মণ স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করেন, অপরের পক্ক অন্ন গ্রহণ করেন না, অথচ তাঁহারা স্বজন স্বজাতি বা অপরের প্রতি প্রভূত স্নেহশীল।

পক্ষান্তরে যদি অন্নজল গ্রহণই ভেদবুদ্ধির বিলোপ সাধন করিতে পারে, তবে যাহাদের মতে স্পর্শদোষ-বিচার নাই, অন্নবিচার নাই, সে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিরোধ বিসংবাদ মতভেদ কর্ম্মভেদের উন্নত প্রাচীর দেখা যায় কেন? ধর্ম্মভেদ আচারভেদ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একমত হইতে বাধা কি?

আচারে ব্যবহারে, কথায় প্রথায়, সংকল্পে স্বভাবে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, জ্ঞানে মানে সকল মানুষ একরূপ হইবে—এরূপ দুরাশা মানুষের সাজে না। সম্ভব হয় ত সকলে দেশের কার্য্যে একমত হইতে পার, আমাদের আচার—স্পর্শদোষ-বিচার—অন্নবিচার তাহার আদৌ বাধক নহে, কারণ ইহার সহিত ঘৃণা বা বিদ্বেষের সম্পর্ক নাই।"

প্রতিপক্ষ প্রত্যুত্তরে বলেন—"মুখে যাহাই বলনা কেন, মনে ২ যে অপর জাতির প্রতি তোমরা ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ কর কিনা—তাহা তোমাদের অন্তরাত্মাই জানেন। যখন তুমি অপরকে স্পর্শ করিলে স্নান কর—সে তোমাকে স্পর্শ করিলে তাহার উপর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠ, তখন তোমার মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কিনা, তাহা নিজেই ভাবিয়া দেখিবে। মুখে বড় বড় লম্বাচৌড়া কথা বল, কিন্তু অন্তরে সঙ্কীর্ণতা, ব্যবহারে প্রতারণা, তোমরা এড়াইতে পারনা।

স্পর্শদোষ-বিচার যেখানে নাই, সেখানে বিরোধের অপর কারণ আছে। যাহাদিগকে তোমরা নীচজাতীয় বল, তাহারা যে তোমাদের সহিত একপ্রাণ হইতে পারে না, তাহার কারণ কেবল স্পর্শদোষবিচার। তোমাদের ঐরূপ ব্যবহারেই তাহারা তোমাদের উপর তুষ্ট নহে। সুতরাং এক্ষেত্রে ঐ দোষটা দূরীভূত হইলেই তাহারা তোমাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে।

ভাবিয়া দেখিলে; তোমাদের ঐ উচ্চনীচ-জ্ঞানটাই ভ্রমাত্মক। সর্ব্বত্র

সমদর্শনই হিন্দুশাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত। তোমরা যে জন্মগত অধিকারের পরিচালনা কর, সে রাজ্যশূন্য রাজার ক্ষমতাপরিচালনের ন্যায় হাস্যকর। তোমাদের অমূল্য গীতাশাস্ত্র বলেন—বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি, শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। বিদ্যাবিনয়বান্ ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও কুকুরমাংসভোজী হীনজাতি—এ সকলেরই প্রতি পণ্ডিতগণ সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। দেশের দুর্ভাগ্যে আজ পণ্ডিত দুর্লভ, তাই তোমরা 'ছুংমার্গকে' ধর্ম্মের নামে দেশের সর্ব্বনাশে প্রয়োগ করিতেছ।"

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুরাগীরা বলেন "পাশ্চাত্যদেশের সাম্যবাদের কথায় তোমাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, সেজন্য তোমরা এদেশের শাস্ত্র, ধর্ম্ম, সমাজ—সমস্তই সেইভাবে বুঝিতে চাও। তোমাদের "সর্ব্বত্র সমদর্শনের" অর্থ কি, বলিতে পার? Equality সাম্য—সকলে সমান—রাজা প্রজা, ধনী দীন, অজ্ঞ বিজ্ঞ সবই সমান—একথার কোনও সঙ্গত অর্থ আছে কি? ও সকল মত বেশ শ্রুতিসুখকর, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উহার সার্থকতার আশা নাই। পাশ্চাত্যদেশে 'সাম্য' কিরূপ সমাদৃত, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার পরিচয় পাইতেছ না কি?

'সাম্য' অর্থ যদি সকলকে "সমান" মনে করাই হয়, তবে বিচারক, অপরাধী ও নিরপরাধকে একরূপ মনে করিয়া, নিরপরাধকেও দণ্ড দান করিতে পারেন, অপরাধীকেও মুক্তি দিতে পারেন। ন্যায়ের মর্য্যাদা থাকিল কোথায়? গুণী ও দোষী সমান বিবেচিত হইলে, গুণীর অবমাননা, পক্ষান্তরে দোষীরও পূজা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। ন্যায় কোথায় রহিল?

"সাম্য" বা "সমদর্শন" কথার অর্থ এইরূপ হওয়া উচিত যে, গুণে জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে শক্তি সামর্থ্যে যাহারা একরূপ, তাহাদের একশ্রেণীর স্থান মান দিতে হইবে। এদেশে গুণের পূজা—যোগ্যতার সমাদর চিরদিনই ছিল ও আছে। স্বার্থের বশে ও শিক্ষার দোষে, সমাজ সর্ব্বসময় এই সত্যের অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় না বটে, কিন্তু যে সময় সে ইহাতে অকৃতকার্য্য হয়, তখন নিয়মভঙ্গ করে মাত্র, নূতন নিয়ম প্রণয়ন করে না। গুণবানের অনাদর ব্যক্তিবিশেষ করিতে পারে, কিন্তু সার্ব্বজনীনভাবে ইহা অসম্ভব।

গীতার শ্লোকের অর্থ কি বুঝিয়াছ? ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও শ্বপাকজাতির প্রতি পণ্ডিত সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবেন; এত সুখের কথা, কিন্তু কার্য্যে সমদৃষ্টি করিবে কিরূপে, বল দেখি? ব্রাহ্মণ ও গরুকে সমদৃষ্টি করিতে গিয়া কি কেহ ব্রাহ্মণের জন্য গোগ্রাসের বন্দোবস্ত করিবেন, না, গরুর জন্য

হবিষ্যান্নের আয়োজন করিবেন? ব্যবহারক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে গোসদৃশ কিংবা গরুকে ব্রাহ্মণসদৃশ মনে করিয়া চলিতে যিনি উপদেশ দিবেন, তিনি কি বাতুলালয়ের যোগ্য বিবেচিত হইবেন না? উহার অর্থ ওরূপ নহে। ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, পণ্ডিত বা জ্ঞানীলোক, সর্ব্বত্র সমদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন করেন। মানুষ পশু, উচ্চ নীচ, ক্ষুদ্র বৃহৎ, ভক্ষ্য ভক্ষক—সকলেরই আসল স্বরূপটা ব্রহ্মময়; সবই ব্রহ্মের বিবর্ত্তন, সকলেরই শেষ ব্রহ্ম। পারমার্থিকভাবে ব্রহ্ম সকলের আশ্রয়—সকলের উৎস—সকলের মূল। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দেখিতে হইবে জ্ঞাননেত্রে, সকলকে সমান ভাবিতে হইবে তত্ত্বতঃ, সকলের মধ্যে অমর আত্মার বিশ্বাস ধারণা করিতে হইবে—ব্রহ্মবিচারে। লৌকিকব্যবহারক্ষেত্রে সকলের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিতে হইবে—এরূপ অর্থ অত্যন্ত হাস্যকর। যে প্রকৃত সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ, তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অপেক্ষা থাকে না, সে জীবনে মরণে স্বাধীন—স্বরাট্।

সাম্যবাদের অধিকারসাম্য, যোগ্যতাযোগ্যতার অপেক্ষা করে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। যোগ্যতায় বিজ্ঞতায় যাহাদের 'সাম্য' নাই, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যগত অধিকারগত সাম্য আসিতে পারে না, আসিলেও তাহা অসঙ্গত হয়। সকলকে সমান করা সংসারে আদৌ অসম্ভব। প্রকৃতির প্রাসাদ ভেদের উপর—বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে দুর্লক্ষ্য সংযোগসূত্র বিদ্যমান, তাহাই সাম্যের পরিচায়ক, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে সাম্য বা উচ্চনীচভেদ-জ্ঞানলোপ কল্পনারাজ্যের সামগ্রী, ব্যবহারিক জগতের জিনিষ নহে।"

বাদী প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষ রক্ষার জন্য যুক্তিজালের অবতারণা করিতে থাকুন। আমরা এই অবসরে দেশের দশের কাছে আমাদের মনের কথাটা বলিতে চাই। সমগ্র পৃথিবীময় রব উঠিয়াছে—"সকলকে সমান করিতে হইবে; কেহ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিবে—ইহা ঠিক্ নয়।" কথাটা এই—সকলকে সমান করা।

সিদ্ধান্তগতভাবে দুইরূপে সকলকে সমান করা হইতে পারে। এক উন্নয়নপ্রণালী দ্বারা, অপর অবনয়নপ্রণালীর সাহায্যে। দেশে নগর ও প্রান্তর দুইই আছে। উভয়কে সমান করিতে হইলে, উন্নয়নপ্রণালীর সাহায্যে প্রান্তরকে নগরে পরিণত করা যায়, কিংবা অবনয়নপ্রণালীদ্বারা নগরের ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক নগরকে প্রান্তরে পরিণত করা যায়। দরিদ্রকে শিক্ষাসাহায্যে ধনী করিয়া, ধনীর সঙ্গে

সমান করা যায়, আর ধনীর ধন ধ্বংস করিয়া, ধনীকে দরিদ্র করিয়া, সমান করা যায়।

আমরা অবনয়ন-প্রণালীর 'সাম্য' চাই না। ব্রাহ্মণ দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত হইয়া, শ্বপাকের সহিত সাম্যলাভ করিবেন, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। শ্বপাক, শিক্ষার সাহায্যে সুনীতিসম্পন্ন ও সমুন্নত হইয়া, ব্রাহ্মণের সহিত এক সমতলে উপনীত হউক্। দরিদ্র ধনী হউক্—ধনীকে দরিদ্র করিবার প্রয়োজন নাই। সকল শূদ্র, শূদ্রত্ব অতিক্রম করিয়া ক্রমে বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, পরিশেষে ব্রহ্মণত্বলাভ করুক, কিন্তু একজনও ব্রাহ্মণ যেন শূদ্রত্বে অবনয়নলাভ না করে। যে উচ্চ আছে, তাহাকে টানিয়া নিম্নে নামাইবার প্রয়োজন নাই, যাহারা নীচে আছে, তাহারা যাহাতে ধনে মানে জ্ঞানে উন্নত হইয়া, উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে।

যাহারা নিম্নে আছে, তাহাদের শিক্ষা দাও, নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান—সকল বিষয়ে তাহাদের উন্নতিসাধন কর, তাহা হইলেই তাহারা উচ্চস্থদিগের সমান হইতে পারিবে। দেশের সকলে যাহাতে সাত্ত্বিক, যথার্থ ব্রাহ্মণ হয়, সেইরূপ শিক্ষা-সাধনা প্রচার কর, যাহাতে সকলে শূদ্র হয়—পতিত হয়, সেরূপ শিক্ষা, প্রচার করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিও না।

শিক্ষাদ্বারা যে সর্ব্বপ্রকার প্রভেদ দূর করা সম্ভব, তাহা মনে করিও না; প্রভেদ একেবারে বিনষ্ট হইবে না—হইতেও পারে না। তবে একরূপ শিক্ষার দ্বারা যতটা একরূপতা আসিবে, তাহাতেই রাষ্ট্রীয়কার্য্যে মনের মিলন হইবার বাধা থাকিবে না। ভেদের মধ্যে যতটা অভেদদর্শন ব্যবহারে সম্ভব, জ্ঞানোন্নতি হইলেই তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, অন্যথায় নহে—একথা মনে রাখিয়া, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের মিলনের চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল অন্ন-জল-গ্রহণ বা বৈবাহিক আদান-প্রদানের দিকে লক্ষ্য করিয়া অজ্ঞ বিজ্ঞ, দীন ধনী, অপকৃষ্ট উৎকৃষ্টের মিলন সাধন করিতে গেলে, ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞানে শিক্ষায় সমান হইলেই প্রকৃত মিলন হইবে, তাহাতেই দেশের কল্যাণ হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

সংসার ভণ্ড।

(লেখক—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সেন গুপ্ত।)

সংসার ভণ্ড! সংসার ভণ্ড!
কপটতা-ভাণ্ড সে সব করে পণ্ড।
হাসি শুধু আশীষ, শীতলতা অঙ্গে,
নিঃশ্বাসে ঢালে বিষ, দংশন-সঙ্গে।
মিঠাকথা-মদিরায় হরে নেয় অন্তর,
দফা শেষ তাহাতেই.—মায়াবীর এ মন্তর!
দাণ্টুকু ভূমিকা যে আনিবারে দণ্ড,
সংসার ভণ্ড; সংসার ভণ্ড!

প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্।

(লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।)

(পূর্বানুবৃত্তি)

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ। আজ্ঞা করুন মহারাজ!

মহা। আদিশ্যস্মাং কাম-ক্রোধ-মদমানমাৎসর্য্যাদয়ো যথা বিষ্ণুভক্তির্নাম যোগিনী ভবদ্ভিরবহিতৈঃ প্রতিকর্ত্তব্যেতি।

মহা। কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে আদেশ কর যে, বিশেষ সাবধানতার সহিত বিষ্ণুভক্তিনাম্নী যোগিনীর প্রতীকার করা হয়।

দৌবা। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

যে আজ্ঞা মহারাজ! (দৌবারিকের প্রস্থান)

(ততঃ প্রবিশতি পত্রহস্তঃ পুরুষঃ)

পত্রবা। হকে উৰ্কলদেশাদো আগদে অত্থি তথ সাঅলতীলসন্নিবেশে পুরুসোত্তমসণ্ণিদং দেবদাআদনং তস্মিং মদমানকেহিং ভট্টারকেরকএহিং

মহারাজসমাসং পেসিদক্ষি (বিলোক্য) এসাবারাণসী এদং রাজউলং জাবপ্পবিশামি।

(প্রবিশ্য বিলোক্য চ)

এসে ভট্টারকে চার্ব্বাএন সহকিম্পি মন্তঅন্ত চিট্টদি তাউবসপ্পামিণম্।

(উপসৃত্য)

জয়দু জয়দু ভট্টারকে এদং পত্তং নিরূবেদু ভট্টারকে। ইতিপত্রং সমর্পয়তি) *

(পত্রহস্তে অনৈক পুরুষের প্রবেশ)

পত্রবা। (আত্মগত) আমি উৎকল দেশ থেকে আস্‌চি। সেখানে সাগরতীরে পুরুষোত্তমনামে একটি তীর্থক্ষেত্র আছে। মহারাজ মহামোহের অনুচর মদ-মান সম্প্রতি সেইখানে বাস কোর্‌ছেন। তাঁহারাই আমাকে মহারাজের নিকট পাঠিয়েছেন। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) এইত বারাণসী। এইত সম্মুখেই দেখ্‌চি রাজধানী, প্রবেশ করা যাক্—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক—এই পত্র অবলোকন করুন (পত্রদান)

মহা। (গৃহীত্বা) কুতোভবান্?

কোথা থেকে আসছ?

পত্রবা। পুরুষোত্তমাদো *

পুরুষোত্তম থেকে।

মহা। (স্বগতং) কার্য্যমত্যাহিতং ভবিষ্যতি (প্রকাশং) চার্ব্বাক! গচ্ছ কার্য্যাবহিতেন ভবতা ভবিতব্যং।

(স্বগত) বোধ হয় বিশেষ কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে (প্রকাশ্যে চার্ব্বাকের প্রতি) চার্ব্বাক! তুমি যাও, খুব সাবধানে কাজ করগে।

চার্ব্বা। যথাজ্ঞাপয়তিদেবঃ (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান)

মহা। (পত্রং গৃহীত্বা বাচয়তি) স্বস্তি বারাণস্যাং মহারাজাধিরাজপরমেশ্বর-পরমভট্টারক-শ্রীমন্মহামোহপাদান্ পুরুষোত্তমায়তনান্মদমানৌ সাষ্টাঙ্গপাতং

---

* অহমুৎকলদেশাদাগতঃ অস্তিতত্র সাগরতীরসন্নিবেশে পুরুষোত্তমসংজ্ঞিতং দেবতায়তনং তস্মিন্মদমানাভ্যাং ভট্টারকাধীনাভ্যাং মহারাজসকাশং প্রেষিতোঽস্মি। এষা বারাণসী এতদ্রাজকুলং যাবৎ প্রবিশামি। এষ ভট্টারকশ্চার্ব্বাকেনসহকিমপিমন্ত্রয়ংস্তিষ্ঠতি তদুপসর্পামোনং।

জয়তু জয়তু ভট্টারকঃ। এতৎপত্রং নিরূপয়তু ভট্টারকঃ।

* পুরুষোত্তমাৎ।

প্রণম্যবিজ্ঞাপয়ত্যঃ যথা ভব্যমব্যাহতমন্তং দেবীশান্তির্মাত্রাশ্রদ্ধয়াসহ বিবেকস্য দৌত্যমাপন্না বিবেকসঙ্গমায় দেবীমুপনিষদমহর্নিশং প্রবোধয়তি। অপিচ কামসহচরো ধর্ম্মোঽপি বৈরাগ্যাদিভিরুপজপ্তইব লক্ষ্যতে যতঃ কামাদ্বিচ্ছিন্ন কচিন্নিগূঢ়ং প্রচরতি তদেতজ্‌ জ্ঞাত্বাদেবঃ প্রমাণমিতি।

মহা। (পত্র—গ্রহণ ও পাঠ) স্বস্তি শ্রীবারাণসীতে অধিষ্ঠিত মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক শ্রীমন্মহামোহপাদকে, পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে মদ-মান সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপুরঃসর নিবেদন করিতেছে যে,—মহারাজের প্রভাবে অত্রত্য মঙ্গল, নিবেদন এই যে,—শান্তিদেবী তাঁহার মাতা শ্রদ্ধার সহিত একত্র হ'য়ে উপনিষদ্‌দেবীর সহিত বিবেকের মিলন জন্য দূতীপণা করিতেছেন, তিনি দিবানিশি দেবী উপনিষৎকে বুঝাইতেছেন; অপর নিবেদন এই যে—যে ধর্ম্ম এতদিন আমাদের কামের সহচর ছিলেন, তিনিও যেন আজ্‌কাল্‌ বৈরাগ্যাদির সহিত কি গুপ্তমন্ত্রণা করিতেছেন, কারণ ধর্ম্ম আজকাল্‌ কামের মুখদর্শনও করেন না, পাছে মুখ দেখাদেখি হয়, তাই কামের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কোথায় গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন। এই সমুদয় বিষয় জ্ঞাত হ'য়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়—আজ্ঞা করিবেন, নিবেদন ইতি॥

মহা। (সক্রোধং) আঃ; কিমেষমতিমূর্খঃ, শান্তেরপি বিভ্যতি! ময়ি জীবতি কুতোঽস্যাঃ সম্ভবঃ? তথাহি;—

ধাতা বিশ্ববিসৃষ্টিমাত্রনিরতো দেবোঽপি গৌরীভুজা-
শ্লেষানন্দবিঘূর্ণমাননয়নোদক্ষাধ্বরধ্বংসকৃৎ॥
দৈত্যারিঃ কমলাকপোলমকরীপত্রাঙ্কিতোরঃস্থলঃ
শেতেঽব্ধাবিতরেষু জন্তুষু পুনঃ কানাম শান্তেঃ কথা॥

(পুরুষং প্রতি) গচ্ছ জাল্ম! কামং মত্বরমুপেত্যাদেশমস্মাকং প্রতিপাদয় যথা দুরাশয়ো ধর্ম্ম ইতোস্মাভিরধিগতং তদস্মিন্‌ মুহূর্ত্তমাত্রমপি নবিশ্বসিতব্যং দৃঢ়ং বদ্ধ্বা ধারয়িতব্য ইতি।

মহা। আঃ! কি মূর্খ এরা! শান্তিকেও আবার ভয় কোরছে! আমি বেঁচে থাকতে শান্তির সম্ভব কোথায়?

সৃষ্টি-কার্য্যে সদা ব্যস্ত দেব পদ্মাসন;
গৌরীসঙ্গানন্দে শিব ঘূর্ণিতনয়ন॥
ক্রোধাধীন হ'য়ে পুন দেখ পুরাকালে
করিলেন যজ্ঞ-ধ্বংস দক্ষের অকালে;

কমলাকপোলকেলীমকরপত্রেতে
চিত্রিত করিয়া বক্ষ শয়ন অঙ্কিতে
করিয়া আছেন হরি দীর্ঘকাল ধরি
কভু দৈত্য সনে রণ নাম যে দৈত্যারি ॥
কাহারও হৃদয়ে শান্তি তিলমাত্র নাই।
শান্তি-লাভে স্থির হয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যদি কেহ শান্ত নয়।
ইতর জীবের কথা কি বলিব হায় ॥

(পত্রবাহকের প্রতি) দূত ! তুমি শীঘ্র যাও। কামকে আমার আদেশ জানাও যে, ধর্ম্মের দুরভিসন্ধি আমরা সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আর এক মুহূর্ত্তও তাহাকে বিশ্বাস করা নয়। শীঘ্রই যেন কাম তাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন কো'রে ধরে রাখে।

পত্রবা। জং দেবো আণবেদি * (ইতি নিস্ক্রান্তঃ)

যে আজ্ঞা হুজুর। (প্রস্থান)

রাজা। (বিচিন্ত্য) শান্তেঃ কোঽভ্যুপায়ঃ ? অথবা অলমুপায়ান্তরেণ ক্রোধলোভাবেব তাবৎ পর্য্যাপ্তৌ, কঃ কোঽত্র ভোঃ ?

(চিন্তা করিয়া) এখন—শান্তির সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা যায় ? আর অন্য উপায়েরই বা প্রয়োজন কি ? শান্তিকে নষ্ট কোর্‌তে ক্রোধ ও লোভই যথেষ্ট। কে আছ এখানে ?

(প্রবিশ্য পুরুষঃ)

এসন্মি আণবেদু মহারাও (১)

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ ! দাস হাজির, আজ্ঞা করুন।

রাজা। আহূয়তাং ক্রোধোলোভশ্চ

ক্রোধ ও লোভকে হাজির কর।

দৌবা। জং দেবো আণবেদি *

যে আজ্ঞা মহারাজ ! (প্রস্থান)

---

* যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি। ইতি সং।

(১) এষোঽস্মি আজ্ঞাপয়তু মহারাজঃ। ইতি সং।

* যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি। ইতি সং।

(ততঃ প্রবিশতি ক্রোধোলোভশ্চ)

ক্রোধ। সখে শ্রুতং ময়া শান্তি-শ্রদ্ধা-বিষ্ণুভক্তয়ো মহারাজ—মহামোহস্য প্রতিকূলতামাচরন্তীতি; আঃ! জীবতি ময়ি কথমাসামাত্মনিরপেক্ষং চেষ্টিতং।

তথাহি—অন্ধীকরোমিভুবনং বধিরীকরোমি।
ধীরং সচেতনমচেতনতাং নয়ামি॥
কৃত্যং নপশ্যতি নযেনহিতং শৃণোতি।
ধীমানধীতমপিন প্রতিসন্দধাতি॥

(ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ)

ক্রোধ। সখে! আমি শুনেছি, শান্তি, শ্রদ্ধা, বিষ্ণুভক্তি, এরা সকলেই মহারাজ মহামোহের প্রতিকূল আচরণ কোর্‌চে। আঃ! আমি বেঁচে থাক্‌তে এদের কি দুঃসাহস! প্রাণের ভয়ও করে না!

সাহানা—ঝাঁপতাল।

আমি যদি মনে করি, ত্রিভুবন অন্ধ করি,
মুহূর্ত্তে বধির করি সকল জনে।
থাক্‌তে নয়ন দেখ্‌তে নারে, কর্ণ থাক্‌তে শুন্‌তে নারে
অচেতন করি পুন সচেতন জনে॥
আমার কৃপা হ'লে পরে, অধীত শাস্ত্রনিকরে
পলকে ভুলিয়া যায় মেধাবী জনে॥

লোভ। অয়ে; মদুপগৃহীতা মনোরথসরিৎ-পরম্পারামেব ন তরিষ্যন্তি, কিং পুনঃশান্ত্যাদীন্ বিচিন্তয়িষ্যন্তি, পশ্য সখে—

সন্ত্যেতে মদদন্তিনো মদবলপ্রম্লানগণ্ডস্থলা।
বাতব্যায়তপাতিনশ্চ তুরগাভূয়োঽপিলপ্স্যেঽপরান্॥
এতল্লব্ধমিদং লভে পুনরিদং লব্ধাধিকং ধ্যায়তাং।
চিন্তাজর্জ্জরচেতসাং বত নৃণাং কানাম শান্তেঃ কথা॥

লোভ। অহো! আমি যার প্রতি কৃপা করি, সে মনোরথ-সাগর-পরম্পরা উত্তীর্ণ হ'তেই পারে না, আবার শান্তির চিন্তা কোর্‌বে কখন! দেখ সখে!—

মদস্রাবী হস্তী আর অশ্ব বায়ুগামী।
শত শত আছে, পুনঃ আর(ও) পাব আমি॥

পাইয়াছি কত ধন, আরও পাব কত।
লক্ষাধিক চিন্তা নর করে অবিরত॥
চিন্তায় যাহার চিত্ত সতত জর্জ্জর।
শান্তির কথা বা তথা কোথা বন্ধুবর॥

ক্রোধ। সখে! বিদিতস্ত্বয়া মৎপ্রভাবঃ—

ত্বাষ্ট্রং বৃত্রমঘাতয়ৎ সুরপতিশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়োঽচ্ছিনদ্-
দ্দেবোব্রহ্মশিরোবশিষ্ঠতনয়ানঘাতয়ৎকৌশিকঃ॥

অপিচাহং;—

বিদ্যাবন্ত্যপিকীর্ত্তিমন্ত্যপি সদাচারাবদাতান্যপি।
প্রোচ্চৈঃ পৌরুষভূষণান্যপিকুলান্যুন্মূলয়ামীশঃক্ষণাৎ॥

ক্রোধ। সখে! আমার প্রভাব ত তোমার জানাই আছে—

আমার প্রভাবে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে মারে।
ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ড শিব ছিন্ন করে॥
বিশ্বামিত্র নাশিলেন বশিষ্ঠতনয়।
আমার প্রভাবে কোথা ব্রহ্মহত্যাভয়?
বিদ্যাবান্ কীর্ত্তিমান্ সদাচারবান্।
হোন্ মহাকুলোদ্ভূত পৌরুষভূষণ॥
আমি যদি মনে করি, শুন বন্ধুবর।
ক্ষণার্দ্ধে বিনাশ করি—এ বিশ্বসংসার॥

লোভ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) প্রিয়ে তৃষ্ণে! ইতস্তাবৎ—

লোভ। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) প্রিয়ে তৃষ্ণে! এদিকে এস।

প্রবিশ্য তৃষ্ণা। কিং আনবেদি অজ্জউত্তো ‡

তৃষ্ণার প্রবেশ।

তৃষ্ণা। আর্য্যপুত্র! কি আজ্ঞা কোরছেন?

লোভ। প্রিয়ে শ্রূয়তাং;—

ক্ষেত্রগ্রামবনাদ্রিপত্তনপুরদ্বীপক্ষমা-মণ্ডল-
*প্রত্যাশা-ঘনসূত্রবদ্ধমনসাং লক্ষাধিকং ধ্যায়তাং
তৃষ্ণে দেবি! যদি প্রসীদসি তনোষ্যঙ্গানি তুঙ্গানিচেৎ
তন্নো:! প্রাণভূতাং কুতঃ শমকথা ব্রহ্মাণ্ডলক্ষৈরপি।

‡ কিমাজ্ঞাপয়তি আর্য্যপুত্রঃ।

লোভ। প্রিয়ে! শুন ;—

বেহাগ—কাওয়ালী।

প্রিয়ে তব বিপুলকায়।

(যদি) কৃপাকরি প্রাণেশ্বরি বিস্তার কর হায়॥

আছে ক্ষেত্র হবে গ্রাম, ক্রমে অদ্রি পত্তন আরাম—

পুর দ্বীপ ক্ষমামণ্ডল লভিব নিশ্চয়—

এই আশা-দৃঢ়সূত্রে, বদ্ধ জীব দিবারাত্রে

সন্ধ্যাধিক চিন্তা কো'রে নিদ্রা নাহি যায়।

পাইলে ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ, ততোধিক করে লক্ষ্য,

শান্তিকথা বল তথা কোথা স্থান পায়॥

(ক্রমশঃ)

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—
মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনার উপযোগিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ "ব্যাপ্তিপঞ্চক" প্রভৃতি প্রণেতা।)

বেদ অনন্যলভ্য-অলৌকিক-সত্য-প্রকাশক কেন?

কেহ কেহ আবার বলেন—"বেদ ঋষিগণের অনুভূত সত্য-প্রকাশক ঋষিগণ-রচিত শব্দরাশি, সুতরাং বেদ ব্যতীতও কেবল সাধন দ্বারা—কেবল তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লভ্য হইতে পারে, ঋষিগণেরও তাহাই হইয়াছিল। সুতরাং বেদের এত মহিমা স্বীকার করা কেন? বেদকে অনন্যলভ্য অলৌকিক-সত্য-প্রকাশক বলিয়া প্রমাণ বলিবার আবশ্যকতা কি?"

কিন্তু একথাও অসঙ্গত। প্রথমতঃ—বেদজ্ঞগণ বেদকে "ঋষি-প্রণীত" বলেন নাই। বেদকে যাঁহারা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বেদকে পৌরুষেয়ই বলেন না, প্রত্যুত ঈশ্বর ও পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় নিত্য শব্দরাশি বলিয়া থাকেন। ঋষিগণ, কর্ণে অপরের কথা-শ্রবণের ন্যায় উহা ঈশ্বরের নিকট হইতে শ্রবণমাত্র করিয়াছিলেন, আর সেই জন্য বেদের একটী নাম 'শ্রুতি' হইয়াছে। অধিক কি, ঈশ্বরও উহার রচনা করেন নাই—অর্থাৎ "উহা ছিল না—ঈশ্বর রচনা করিলেন"—এমনও নহে। কারণ, যদি বলা যায়, "উহা ছিল না, ঈশ্বর রচনা করিয়াছেন"—তাহাহইলে বলিতে হইবে যে, উহার রচনার পূর্ব্বে ঈশ্বর উহা জানিতেন না, আর তাহা বলিলে, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বের হানিই হইল। আর যদি বলা যায়, ঈশ্বর উহা জানিতেন, তাহা হইলে আর উহা ঈশ্বররচিত হয় না। এই কারণে বেদকে 'নিত্য' বলা হয়। সৃষ্টিকালে জীব ও জগৎকে তিনি যেমন অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করেন, বেদকেও তদ্রূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও ঋষিগণকে শ্রবণ করাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। পরমাণু প্রভৃতি যেমন কাহারও সৃষ্ট নহে, ইহাও তদ্রূপ।

দ্বিতীয়তঃ—তপস্যাদ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা সর্ব্বজ্ঞানাধার-বেদোক্তমার্গে তপস্যা করিলেই হয়, নচেৎ নহে। কারণ, তপস্যাদ্বারা বেদোক্ত সত্য অনুভূত হয় মাত্র। বেদজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হয়, তপস্যাদ্বারা তাহা অপরোক্ষ হয় মাত্র। অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান, যেমন নিজে নিজে "শব্দ" ভিন্ন প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয়তাসহকারে লাভ করা যায় না, তাহার লাভোপায়-স্বরূপ যে সাধন, সেই সাধনের জ্ঞানও তদ্রূপ নিজে নিজে শব্দ-প্রমাণ ভিন্ন কোন প্রমাণদ্বারা নিশ্চয়তা-সহকারে লাভ করা যায় না; আর নিশ্চয়তাসহকারে না জানিলে, তাহার অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা এবং দৃঢ়তাও জন্মে না; আর তাহা না জন্মিলে, সিদ্ধি বা অপরোক্ষও হয় না। যে ব্যক্তি গন্তব্যস্থানে গিয়াছে, সে যদি পথের কথা বলে, তবে সে পথে যাইতে প্রবৃত্তি হয়। বেদ তাহাই করেন, এজন্য বেদোক্ত উপদেশের অনুষ্ঠানে আমাদের প্রবৃত্তি হয়।

যদি বলা হয়, অজ্ঞাত জাগতিক বিষয়ের আবিষ্কারে আমাদের যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, দৃঢ়চেষ্টা হয় এবং তাহার ফলে অভীষ্টলাভও হয়, এস্থলেও সেরূপ হইবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, সেখানেও অজ্ঞাত বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা জানি যে, অনেক জাগতিক বস্তু ঐরূপে অনেকের লভ্য হইতেছে,

তাই তাহাতে প্রবৃত্তি হয়। সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যেই ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু, অদ্বৈত ব্রহ্ম, জাগতিক বিষয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু, কারণ তাহা অসঙ্গ। সে সম্বন্ধে আমাদের ত ওরূপ কোন জ্ঞানই নাই যে তাহার জ্ঞানে প্রবৃত্তি হইবে। ফলকথা এই যে, ব্রহ্ম অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া জীব হইয়াছেন, এবং অজ্ঞানকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর হইয়াছেন, এজন্য অজ্ঞানের অতীত তত্ত্বের বিষয় অজ্ঞানাভিভূত জীবকে অজ্ঞানানধীন ঈশ্বর না জানাইলে, জীবের পক্ষে তাহা জানা অসম্ভব। এই কারণে জীব কখনই নিজে নিজে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ হইতে গেলে সর্ব্বজ্ঞের উপদেশ আবশ্যক এবং সর্ব্বজ্ঞের যে উপদেশ—তাহাই নিত্য অপৌরুষেয় বেদ। পঙ্কের মধ্যে থাকিয়া যেমন পঙ্কমুক্ত হওয়া যায় না, ইহাও তদ্বৎ। অকূল-পাথারে পতিত ব্যক্তি যদি কূলের জ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার কূলে যাইবার চেষ্টাও হয় না, সে ডুবিয়াই মরে, আর তাহাকে কেহ কূলের দিকে যাইতে উপদেশ করিলে, সে কূলের দিকে সাঁতার দেয়।

ইহাতেও আবার অনেকে বলেন—"বেদ যখন বাক্যের সমষ্টি, তখন উহা মনুষ্যরচিত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বাক্যও বর্ণাত্মক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই শব্দও ক্ষণবিধ্বংসী ও মনুষ্যোচ্চারিতই হয়, সুতরাং উহাকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলা অসঙ্গত ইত্যাদি।"

একথাও কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, যে বাক্য মানব ব্যবহার করিতেছে, তাহা তাহার নিজের উদ্ভাবিতই নহে, উহা তাহার শিক্ষিতভাষা, অথবা শিক্ষিতভাষার বিকৃতাবস্থা। মূলে একটা ভাষাও না শিখিলে, মানব কোন ভাষার সৃষ্টিই করিতে পারিত না। অতিসুশিক্ষিত পিতামাতার সন্তানকেও যদি মূকসমাজে লালিতপালিত করা যায়, তাহা হইলে, সে, আমাদের ভাষার মত কোন ভাষাই সৃষ্টি করিতে পারে না। হাসিকান্না প্রভৃতির যে ভাষা, সেই ভাষাই তাহার থাকিয়া যায়। শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা তাহাকে একবার শিখিতেই হয়। নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ শব্দের শক্তিকে "ঈশ্বরের ইচ্ছা" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং বাক্যসমষ্টি বলিয়া, বেদকে "মনুষ্যরচিত" না বলিয়া, প্রকারান্তরে "বেদের ভাষাই সর্ব্বপ্রাচীন ভাষা" বলিয়া এবং বেদের মধ্যেই "বেদ ঈশ্বরপ্রদত্ত" বলিয়া উক্ত হওয়ায়, "মনুষ্যই বেদের ভাষা শিখিয়া বাক্যব্যবহার করিতেছে" এইরূপ বলাই ভাল। এই ভাষার শিক্ষক ঈশ্বর, আর এই জন্যই জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে ভগবান্ই জীবরূপে—

দেহধারীরূপে আবির্ভূত হন—বলা হয়। বেদের শব্দেও জ্ঞান ও সেই শব্দের অর্থজ্ঞান—উভয়ই ঈশ্বরে নিত্যই আছে। সৃষ্টিকালে উহা তিনি জীবকে শিখাইয়া দেন, আর তাহার পর জীব ভাষাব্যবহার করিতে শিখে। অতএব শব্দ মনুষ্যোচ্চারিত বলিয়া, বেদ অনিত্য ও অপৌরুষেয় হয় না।

তাহার পর আর এক কথা। বেদ কবে কাহার দ্বারা রচিত, তাহা প্রাচীন কোনও গ্রন্থেই দেখা যায় না, অথবা ইহার কোন জনশ্রুতিও নাই। পক্ষান্তরে বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ এবং বেদমধ্যেই আছে—বেদ অনাদি নিত্যবাণী যথা—"বিরূপ নিত্যয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয়" অর্থাৎ হে বিরূপ! নিত্য বাক্যদ্বারা স্তুতি প্রেরণ কর"—এই বাক্যে বাক্যকে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। আর বেদমধ্যে বেদের নিত্যতা-কথনকে অপ্রমাণ বলা যায় না; কারণ, সাদিবস্তুর দ্বারা কখনও অনাদিবস্তুর অনাদিত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইতে পারে না; তদ্রূপ নিত্যের নিত্যতা; নিত্যের দ্বারা ঘোষিত না হইলে, তাহার নিত্যতাই সুসিদ্ধ হয় না। এসবস্থলে অনুমানাদির প্রয়োগ কখনই ত্রিকালাবাধ্য নিশ্চিত জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। অতএব বেদের মত কোন একটা নিত্য শব্দরাশির সদ্ভাব অবশ্যস্বীকার্য্য।

যদি বলা যায়, বেদমধ্যে বক্তা শ্রোতা রহিয়াছে, সুতরাং উহা মনুষ্যরচিত অনিত্য বাক্য ভিন্ন আর কি হইবে? কিন্তু একথাও ঠিক নহে। কারণ, বেদমধ্যেই বেদকে নিত্য বলায় বেদবিষয়ক উক্ত অনুমানটী অনিত্য হইয়া যায়। তাহার পর "বিশ্বের কর্ত্তা, ভুবনের গোপ্তা, ব্রহ্মা প্রথমে উৎপন্ন হন ও দেবগণকে ব্রহ্মবিদ্যা বলেন" ইত্যাদি ক্রমে বেদের প্রচার, মুণ্ডক উপনিষদের প্রথমেই কথিত হইয়াছে। "যিনি ব্রহ্মাকে পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাহাকে বেদ প্রদান করেন" ইত্যাদিক্রমে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষে বেদের আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয় বাণী—ইহাই বলিতে হইবে। বেদমধ্যে বক্তা ও শ্রোতার যে উল্লেখ, তাহা আখ্যায়িকা-সাহায্যে উপদেশদানের উদ্দেশ্যে ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচার্য্যগণও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে স্মরণাতীত কাল হইতে কত কত অসামান্যধীসম্পন্ন ব্যক্তি ইহাকে প্রমাণরূপে শিরোধার্য্য করায়—যাঁহাদের চিন্তার গভীরতা আমরা একজন্মে বুঝিয়া উঠিতে পারি না—এরূপ ব্যক্তি ইহাকে প্রমাণ রূপে

গ্রহণ করায়, ইহার প্রামাণ্যাদির প্রতি আজ আমাদের সন্দেহ করা বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও আর একপ্রকার সন্দেহ অনেকের মনে উঠিতে দেখা যায় এবং উহা নিতান্ত আধুনিকও নহে। কথাটা এই যে—"বেদ না হয় প্রথমে আমাদিগকে সত্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছে এবং তদনুসারে বহু মহাত্মা সেই সত্য লাভও করিয়াছেন, কিন্তু এখন যদি বেদোক্ত বাক্য অবলম্বন না করিয়া উক্ত মহাত্মগণ কর্তৃক উপদিষ্ট ভাষান্তর-সাহায্যে ঐ জ্ঞানের জন্য কেহ যত্ন করে, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা? বেদের সংস্কৃতভাষার আবার আবশ্যকতা কেন?

এতদুত্তরে প্রবল সম্প্রদায় বলেন যে, বেদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান বেদবাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে, অন্য বাক্য দ্বারা কতকটা তদনুরূপ ফল হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সেই ফল হয় না। কারণ, বিভিন্ন শব্দ এক বস্তুকে বুঝাই-লেও সব শব্দই ঠিক্ একবস্তুকে একভাবে বুঝায় না, উহাদের অর্থমধ্যে কিছু বিশেষ থাকে। ইহা একটু চিন্তা করিলেও বুঝা যায়। 'জল' ও 'পানি' এক বস্তুকে বুঝাইলেও শব্দ দুইটার অর্থে কিছু বিশেষত্ব আছে বুঝা যায়। অতএব ঔপনিষদ পুরুষের জ্ঞানের জন্য ঔপনিষদবাক্য অবলম্বনীয়। উহাতে সংশয়-বিপর্য্যয়জ্ঞানের যেরূপ সম্যক্ বিনাশ হয় অন্যথা সেরূপ হয় না।

বস্তুতঃ এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদবাক্যাবলম্বন যেমন প্রয়োজন, তদ্রূপ চিত্তশুদ্ধি এবং একাগ্রতাও প্রয়োজন। ইহাদের অভাবে বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষ হয় না। এই চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতার জন্য যথাক্রমে কর্ম্ম ও উপাসনার প্রয়োজন। আর কর্ম্ম ও উপাসনা নিজ বুদ্ধিকল্পিতপথে অনুষ্ঠান করিলে প্রায়ই ফলপ্রদ হয় না। বেদবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইলেই ইহার ফল হইয়া থাকে। ইহার কারণ অবশ্য অনেক আছে, তন্মধ্যে এখানে একটী বলা যাউক্। তাহা এই যে, ইহারা লৌকিক বিষয় নহে যে, মানব উহা অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ—স্বকল্পিতপথে নিষ্ঠাই হয় না, কারণ, তাহাতে অভ্রান্ত-বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, এবং সিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, আর তজ্জন্য সম্যক্ সিদ্ধিও হয় না। সিদ্ধপুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট পথ বেদোক্ত পথই হয়। যেহেতু তাঁহারা বেদোক্তপথেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সিদ্ধপুরুষ অনেকসময় অধিকারানুরূপ অন্যমার্গ প্রদর্শন করিলেও পরিণামে প্রকৃত বেদোক্তপথই

প্রদর্শন করেন। অথবা এমন অবস্থায় পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে, সেই পরলোকে ভগবান্‌ই তাঁহাকে বেদোক্ত জ্ঞান প্রদান করেন। ইহা শাস্ত্রমধ্যেও কথিত হইয়াছে যথা—দেহান্তে দেবঃ তারকং পরংব্রহ্ম ব্যাচষ্টে" ইত্যাদি। এই কারণে সর্ব্বজ্ঞপুরুষ না বলিলে লোকের তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না, অথবা প্রবৃত্তি হইলেও তাহাতে সিদ্ধিলাভ সম্যক্ হয় না। সেইজন্য এই সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, বেদোক্ত অনন্তব্রহ্মের জ্ঞানার্থ বেদোক্তমার্গই অবলম্বনীয়।

অন্যসম্প্রদায় এবিষয়ে এতটা কঠোরতা না দেখাইলেও তাঁহারা যে বেদমূলক বাক্যকে অবলম্বনীয় বলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের যুক্তি এই যে, ব্রহ্ম যখন শব্দের বাচ্য নহেন পরন্তু লক্ষ্য, তখন আবার এবাক্য সেবাক্য লইয়া এত বিচার-বিবেচনা কেন? কোনরূপে বস্তুর নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই হইল, ইত্যাদি।

আপত্তিটী সত্য, তবে একটা কথা আছে। মানব-প্রকৃতি আলোচনা করিলে মনে হয়, সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্তসম্প্রদায়ের কথাই ঠিক্ হয়। কারণ, মূলের আদরই অধিক হয়। প্রথম অবস্থায় লোকের মূল বেদবাক্য কিরূপ তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হইলে তাহার সেই সকলের মূলের প্রতিই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়,—উহা প্রকৃত সর্ব্বজ্ঞোক্ত কিনা, সে বিষয়ে লক্ষ্য হয়। এইরূপ নানাকারণে পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের কথাই ঠিক্ হয়, অর্থাৎ ভাষান্তর দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা বেদোক্তজ্ঞানের অনুরূপ, তাহা ঠিক্ বেদোক্তজ্ঞানের মত ফলপ্রদ হয় না।

যাহা হউক্ এইরূপ নানাকারণে ব্রহ্ম ও তাহার সাধন বিষয়ে বেদই প্রধান অবলম্বনীয়। এবিষয়ে শাস্ত্রমধ্যে এত বিচার আছে যে, তাহা এক-জীবনে শেষ করা যায় না। উপরে কয়েকটীমাত্র প্রদর্শিত হইল।

এখনও পর্য্যন্ত বহু বেদসেবী হিন্দুর বিশ্বাস যে, মানবসৃষ্টির প্রথমাবস্থায় জগতের এমন একদিন অতীত হইয়াছে, যখন মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞানপ্রদীপ বেদ ছিল। সকলেই লৌকিক অলৌকিক সকল বিষয়ক জ্ঞানের জন্য বেদকেই অবলম্বন করিতেন। সকলেই বেদানুযায়ী ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু ক্রমে মানব যখন লৌকিকজ্ঞানে অভ্যস্ত হইয়া গেল, তখন লৌকিক জ্ঞানের জন্য আর বেদের শরণ গ্রহণ করিত না। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে লোকে বেদের লৌকিক অংশ বিস্মৃত হইল। বেদের কেবল

অলৌকিক অংশই রহিয়া গেল। তদবধি এই অলৌকিক অংশই 'বেদ' বলিয়া লোকে বুঝিত। ক্রমে কালবশে মানবসমাজ যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল, তখন ভারতের বাহিরের মানবগণ বেদ বিস্মৃত হইল, এবং বেদোক্ত উপদেশের সংস্কার মাত্র লইয়া নূতন নূতন ধর্ম্মমতের উদ্ভাবন করিল। এইসকল ধর্ম্মমত ভারতের অলুপ্ত বৈদিক ধর্ম্মমতের সংস্পর্শে যখনই আসিয়াছে, তখন, কখনও বা পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়াছে, কখনও বা একে অপরের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ মনুষ্যজাতির বিপুল জ্ঞানসম্পত্তির একমাত্র মূলধন সেই বেদজ্ঞান—মানবীয় বিদ্যাবুদ্ধি-বিজ্ঞানবৃক্ষের একমাত্র বীজভূত সেই বেদজ্ঞান—জগতের জ্ঞানপ্রবাহের মন্দাকিনী সেই বেদজ্ঞান, দেশভেদে বিলুপ্ত বিকৃত এবং পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে হইতে জগতে অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। যে দেশে এখনও এই বেদশাস্ত্র বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা এই ভারতবর্ষ, যেদেশে এখনও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ তিরোহিত হয় নাই তাহা এই ভারতবর্ষ,—তাহা এই মোক্ষভূমি ভারতবর্ষ, তাহা এই বৈরাগ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ।

অবশ্য ভারতেও যে বৈদিকধর্ম্মের সংস্কার হয় নাই, তাহা নহে। ভারতেও সেই বেদোদ্ধারকল্পে ভগবানের বহু অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। ইঁহারা সকলেই বেদোদ্ধারকর্ত্তা, বা বেদোদ্ধার করিয়াই অবতারের পূজালাভ করিয়াছেন।

কিন্তু কলিকালে ব্যাস ও যাজ্ঞবল্ক্যের পর যাঁহারা এই মহনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বেদের ওভাবে উদ্ধারসাধন করেন নাই। তাঁহারা সকলেই বেদার্থের নির্ণয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, অথবা প্রকৃত-বেদার্থ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা এই বেদার্থ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা বড় অল্প নহে। অনেকের নামধাম কীর্ত্তিকলাপ কালগর্ভে বিলীন হইলেও এখনও অনেকের যশঃপতাকার পৎপৎ ধ্বনি আমরা শুনি। প্রভাকর-কুমারীল-নির্ম্মিত বেদার্থনির্ণয়পথের পান্থশালা মধ্যে আজ কতলোক আশ্রিত, বাৎস্যায়ন উদ্যোতকর, বাচস্পতি, উদয়ন কর্ত্তৃক বেদার্থ-নির্দ্ধারণমার্গের শত্রুনিবারণমানসে নির্ম্মিত দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে আজ কতলোকের বসতি, ঈশ্বরকৃষ্ণ-গৌড়পাদ-শঙ্কর-রামানুজ-মধ্ববল্লভ-প্রচারিত বেদার্থরূপ সৌধাবলিমধ্যে আজ কতলোকে সুখশয্যায় শায়িত বা উপবিষ্ট, চৈতন্য—সনাতন-জীব-বলদেবের বেদার্থ-খাল্ল-

সংক্ষেপরূপ প্রমোদকাননে আজ কতলোক মাধুর্য্য রসাস্বাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। ইঁহারা সকলেই বেদার্থ-নির্ণয়ার্থ অথবা বেদার্থ-সংস্কারার্থ আবির্ভূত হওয়ায় আজ আমাদের নিকট ভগবদবতার বলিয়া পূজিত। ইঁহারা যদি বেদ অমান্য করিয়া এই মহৎকার্য্য করিতেন, তাহা হইলে ভগবদবতারের আসনলাভ করিতে পারিতেন না।

কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য তারকা সকলেই প্রকাশস্বরূপ হইলেও যেমন তাহাদের প্রকাশের তারতম্য আছে, বিন্ধ্য হিন্দুকুশ হিমগিরি সকলেই উচ্চ ভূধর হইলেও যেমন তাহাদের উচ্চতার অল্পাধিক্য আছে, সরিৎ সাগর সরোবর সকলেই জলাশয় হইলেও যেমন তাহাদের বৃহত্তের তারতম্য আছে, তদ্রূপ উক্ত বেদার্থ-সংস্কারকবর্গের কীর্ত্তির মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। ইঁহাদের সকলেই প্রায় কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরূপ ত্রিকাণ্ড বেদের এক এক কাণ্ডাবলম্বনে বেদার্থসংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কেহই এই কাণ্ডত্রয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বেদার্থসংস্কারে প্রবৃত্ত হন নাই। যে একজন মহাত্মা এই পথে গমন করেন নাই, যে একজন মহাত্মা এই কাণ্ডত্রয়ের প্রকৃত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি—সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, তিনি সেই জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য,—তিনি সেই আকুমারব্রহ্মচারী অভুক্তবৈরাগী নিষ্কলঙ্কচরিত্র সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য।

অগ্নিপরীক্ষার পর দশরথের আশীর্ব্বাদ।

(লেখক—সম্পাদক।)

কহিলেন মহাদেব,—"হের হের রাম,
মহাযশাঃ পিতা তব নরলোকে ছিনি
দেবলোক হতে এবে এসেছেন হেথা
আশীষিতে তোমা সবে রাজা দশরথ,
আসীন বিমান পরে, করহ প্রণাম
লক্ষ্মণ-বৈদেহীসহ পিতৃপাদপদ্মে।"

মহাদেববাক্য শুনি পুরুষোত্তম রাম
করিলেন প্রণিপাত জায়া ভ্রাতাসহ।
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর পুত্র রামচন্দ্রে
হেরি রাজা দশরথ লইলেন কোলে
স্নেহসহকারে, তাঁরে কহিলেন পরে,—
"তোমার বিরহে রাম, না পায় আরাম
স্বর্গলোকে কভু মোর রামগত প্রাণ।
আর বলি শুন বাপ, নির্ব্বাসনে তব
বজ্রতুল্য নিদারুণ কৈকেয়ী-বচন
শেলসম বিঁধেছিল হৃদয়ে আমার,
দেখি তোমা সবে পুত্র, সুস্থ অদ্য আমি।
অযোধ্যায় গেলে তুমি অতুল আনন্দ
লভিবেন শোকশীর্ণা মহিষী কৌশল্যা,
নিষ্পত্র অশ্বত্থ যথা বসন্ত-পরশে।
আনন্দপ্রবাহ পুনঃ হবে প্রবাহিত
অযোধ্যা-নগরীমাঝে, রসহীন এবে
তব নির্ব্বাসনতাপে; ভ্রাতৃগণসহ
কর রাজ্য-সুশাসন প্রজাহিত তরে।
পিতৃভক্তিপরাকাষ্ঠা দেখায়েছ তুমি।
তব নাম শুন রাম, হইবে কীর্ত্তিত
জনমে মরণে বিপদে সম্পদে সদা
যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভারত মাঝারে।"
কহিলেন রামচন্দ্র,—"তব দরশনে
লভিলাম যে আনন্দ, তুচ্ছ তার কাছে
অযোধ্যার সিংহাসন, কিন্তু পিতঃ, সদা
হৃদয়ে জাগিছে মম তব অভিশাপ
সপুত্র কৈকেয়ী প্রতি; ক্ষম অপরাধ,
আজ এই শুভদিনে কৈকেয়ী মাতার।
নাহি চাহি অন্যবর তব সন্নিধানে।"
"তথাস্তু" বলিয়া রাজা কহিলেন রামে-

"ধন্য তুমি ধরাধামে ক্ষমা-অবতার,
নাহি দেখি ক্ষমাশীল তোমার সমান।"
চাহি লক্ষ্মণের দিকে কহিলেন রাজা—
"যুগযুগান্তর ধরি ভ্রাতৃপ্রেম তব
ভারতের ঘরে ঘরে হইবে কীর্ত্তিত।"
সুমিত্রা-নন্দনে রাজা আশীর্ব্বাদ করি,
বদ্ধাঞ্জলি স্নুষা প্রতি করি দৃষ্টিপাত
কহিলেন বৈদেহীকে মধুর ভাষায়,—
"হে পুত্রি, ক'রনা খেদ রাম-আচরণে ;
নির্ম্মল চরিত্রে তব নহেন সন্দিগ্ধ
কভু তব প্রাণেশ্বর, তবু তব কীর্ত্তি
করিতে বর্দ্ধন রাম এঘোর পরীক্ষা
করিলেন সমাপন; বুদ্ধিমতী তুমি,
তবু আছে অধিকার জনকের ন্যায়
করিতে এ উপদেশ জনক-নন্দিনি
যাবৎ থাকিবে গিরি এ মহীমণ্ডলে,
যাবৎ বহিবে নদী সাগরের পানে,
যাবৎ উঠিবে সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হ'তে,
অমর তোমার কীর্ত্তি হইবে কীর্ত্তিত
ধনীর প্রাসাদে আর দীনের কুটীরে।
হইবে পূজিতা তুমি সাবিত্রীর ন্যায়
রমণীসমাজ মাঝে ভারতবরষে।"
পুনঃ করি আশীর্ব্বাদ রাজা দশরথ
চলিলেন স্বর্গলোকে দেবগণ সহ।

প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি এ,)

পরে ধীরে ধীরে বংশপরম্পরাক্রমেই রাজপদলাভ ঘটিতে লাগিল, রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং অবশেষে নির্ব্বাচনপ্রথা বিলুপ্ত হইল। মহাবীর ও গৌতম-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মদ্বয়, প্রধানতঃ ধর্ম্ম হইলেও রাজনৈতিকসংস্রবহীন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের বিরুদ্ধবাদী ছিল। এই উভয়ধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তকদ্বয় ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ছিলেন এবং ইঁহারা স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মপ্রচারে যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ হইতেই পাইয়াছিলেন। রাজনির্ব্বাচনে ব্রাহ্মণগণ যে ক্ষমতা-পরিচালনা করিতেন, ক্ষত্রিয়গণ সে ক্ষমতা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে চ্যুত করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেন। এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলেই, ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজপুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়গণের নিকট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই দুই বিপ্লব আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, রাজপুত্রগণ ও ধনীব্যক্তিসমূহ সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও ঠিক্ এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উইক্লিফ্ নামক প্রচারক খৃষ্টীয়-ধর্ম্মযাজকগণের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলে, অভিজাতগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, ধর্ম্মযাজকগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। উত্তরভারতে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়া মহাবীর ও বুদ্ধও ঠিক্ একই কারণে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য খর্ব্ব করিবার জন্য অভিজাতবর্গের সহানুভূতি ও সহায়তা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে উইক্লিফ্ সমন্বয় প্রচার করিয়াছিলেন, এখানেও ইঁহারা সমন্বয় প্রচার করিয়াছিলেন।

নৃপতিবৃন্দ নিজ নিজ রাজ্য নিজ নিজ পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য ইহতে বাধা দিতেছিল। তাই নৃপতিগণ এই বিপ্লবে নিজ নিজ ছিদ্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এইজন্য জ্যেষ্ঠপুত্র-রূপে (জাতক ১। ৫০) বোধিসত্ব সেই পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই সুবিধা পাইয়াই, দ্বিতীয় পুত্র সর্ব্বাংশে জ্যেষ্ঠাপেক্ষা কৃতী হইলেও, জ্যেষ্ঠই সিংহাসন পাইলেন, (জাতক, ৪) কারণ দেখান হইল যে, ছত্র জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য, কনিষ্ঠের নহে।

এই কারণেই চাণক্য বলিয়াছেন (অর্থশাস্ত্র ১ । ১৮) যে, জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকারপ্রথার সম্মান করিতে হইবে। রাজন্যবর্গের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা আরও বদ্ধমূল হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যের জন্য ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছিল, তাই ব্রাহ্মণগণ স্বীয় প্রতিপত্তি বদ্ধমূল করিবার জন্য ক্ষত্রিয়-রাজগণের শরণাপন্ন হইলেন। উভয়শক্তি একত্রীভূত হওয়াতে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ক্ষমতাহীন হইতে লাগিল।

রাজন্যবর্গের ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত নির্ব্বাচন লোপ পাইল। তাই হর্ষচরিতে (১৭ অধ্যায়) দেখিতে পাই যে, বংশপরম্পরাক্রমেই রাজা হইবেন। তাই বিক্রমাদিত্যনাটকে (ইণ্ডিয়ান আণ্টিকুয়্যারী ৩৩) দেখিতে পাই যে, যোগ্যতর দ্বিতীয় পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠই সিংহাসনারোহণ করিলেন।

সাধারণতন্ত্র।

প্রাচীন ভারতে সাধারণতন্ত্রেরও অভাব ছিল না। মনু (৮। ৩) রামায়ণ (২। ৬৯, ১৮) মহাভারত (শান্তি ১। ৪১, ২৭) বায়ুপুরাণ (২। ৩৭) প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে সাধারণতন্ত্রের যথেষ্ট নিন্দাবাদ থাকিলেও, এইগুলির কথা অনেকস্থলে দৃষ্ট হয় এবং সাধারণতন্ত্র জনপদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব, বৈদিককাল হইতেই ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদেই ইহার উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদেও (২০) ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ প্রারম্ভে সাধারণসভায় ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ই বিবেচিত হইত, পরে রাজনৈতিক আলোচনাও হইত। অথর্ব্ববেদের ৭। ২২ পাঠ করিলে ও উহার অন্তর্গত ৮। ১০ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। অথর্ব্ববেদের শেষোক্তস্থানপাঠে অনেক পাশ্চাত্যমনীষী এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। গ্রিফিথ্ সাহেব ঋগ্বেদের ১০। ১২১ পাঠ করিয়া পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে, সমিতি এরূপস্থলে রাজনির্ব্বাচনের জন্য একত্র হইতেন। অথর্ব্বের ৬। ৬৪ পাঠ করিলেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অপিচ, অথর্ব্বের ৬। ৮৮ এবং ৫। ১৯ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণসমিতি (যাহা পরে সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়) রাজনির্ব্বাচন এবং রাজক্ষমতা দমন করিতেন। এ সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডোনেল্ এবং কিথ্ নামক সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকদ্বয় তাঁহাদের Vedic Index নামক গ্রন্থে এবং শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল Modern Review পত্রে ১৯১৩ সালে যাহা লিখিয়াছেন তাহা একান্তপাঠ্য।

আমাদের মনে হয় যে, যে সকল সমিতি, পূর্ব্বে ধর্ম্মালোচনা করিতেন, তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত রাজনৈতিক-বিষয়েও পর্য্যালোচনা ও হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন এবং কালে তাঁহারাই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় অত্যন্তপ্রণিধানযোগ্য। কেবল পঞ্চনদে ও বৈশালীর নিকটবর্ত্তীস্থানেই এইরূপ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্যত্র ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

মহাভারতে গণতন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গণতন্ত্রসমূহের কোষাগার ও সৈন্য ছিল; ইহারা বৈদেশিক বিষয়সমূহ আলোচনা করিত। ইহা হইতে নিশ্চিত অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহারা পরাক্রান্ত ছিল। শিশুপাল যে কৃষ্ণের উপস্থিতি সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ এই মনে হয় যে, কৃষ্ণ মুকুটধারী নরপতি ছিলেন না—এবং তজ্জন্যই মুকুটধারী নরপতিগণের অন্যতম প্রধান শিশুপাল, সভায়, গণতন্ত্রের অন্যতম নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্যদৃষ্টে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

আলেকজান্দারের অভিযানকালের এইপ্রকার অনেক সাধারণতন্ত্রের কথা, গ্রীসীয় লেখকগণ উল্লেখ করিয়া, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাদেরই কয়েকটী মহাবীর মাসিদনাধিপতিকে অত্যন্ত বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। মেগস্থেনিস্-নামক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক (সমসাময়িকভারত দ্বিতীয়খণ্ড) "নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত" ও "আত্মশাসিত" নামক দুইপ্রকার নগরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মেগস্থেনিস্ নিসা-নামক নগরের বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন যে, তথায় একজন সভাপতি ও শাসকসম্প্রদায় দ্বারা সেই নগরের শাসনকার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইত। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন অন্যান্য সাধারণতন্ত্রসেবিত জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—এবং কোন কোন স্থানে নরপতির উচ্ছেদসাধন করিয়া জনসাধারণ যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণের অভাব হয় না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এইপ্রকার সাধারণতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিচ্ছবি, মল্লক, কুরু, পাঞ্চাল, কাম্বোজ এবং সুরাষ্ট্রের সাধারণতন্ত্রের কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের পুস্তকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই সম্বন্ধে ডাক্তার রীস্ ডাভিডস্-নামক গ্রন্থকার Buddhist India নামক পুস্তকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষপাঠযোগ্য। ত্রিপীটকেও ইহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

মন্ত্রিপরিষৎ।

মন্ত্রিপরিষৎ প্রাচীনভারতে ছিল কিনা ? এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমানে যেরূপ Executive Council প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাচীনভারতেও সেইরূপ প্রথা ছিল। মনুর মতে (৭।৫৪) সাতজন কি আটজন মন্ত্রী থাকা আবশ্যক ছিল। মহাভারতে (সভা ৬।৩৬) একজন উপযুক্ত মন্ত্রী থাকাই যথেষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চাণক্য অর্থশাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেকপ্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কৌটিল্য বলিয়াছেন (৪৫ পৃষ্ঠা) যে, "রাজা কাহারও মত অগ্রাহ্য করিবেন না ; এমন কি, শিশুও যদি সমীচীন মতপ্রকাশ করে, তবে তিনি তাহাও অবহেলা করিবেন না।" কিন্তু, চাণক্য স্বয়ং মন্ত্রীরূপে চন্দ্রগুপ্তের উপর যেরূপ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি একেশ্বরমন্ত্রীত্বেরই স্বপক্ষে ছিলেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, (অর্থশাস্ত্র ৩২ পৃষ্ঠা) যে "একজন মাত্র মন্ত্রী থাকিলে, এরূপ মন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন ;" কিন্তু, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য স্বেচ্ছাচারীই ছিলেন। রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য তিনি যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা হইতেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। রাজমন্ত্রীই, তাঁহার মতে, সকল প্রধান কার্য্য—যুবরাজকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠা, রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ প্রভৃতি করিবেন—এই সিদ্ধান্ত "মুদ্রারাক্ষস" পাঠে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

কৌটিল্য অন্যত্র বলিয়াছেন (অর্থশাস্ত্র, অষ্টম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়) যে, প্রধান মন্ত্রীর উপরেই সকল নির্ব্বাহ করে। রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করা, বিপদাপদ্ হইতে উদ্ধার, উপনিবেশ-স্থাপন, ভূমির উৎপাদিকাশক্তি-বৃদ্ধি, সৈন্যরক্ষা, রাজকোষ-রক্ষা—এইসকল ব্যাপারই প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাহ করিবেন। ভরদ্বাজও বলিয়াছেন, যে, প্রধান মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকিলে, রাজা রাজকার্য্য-নির্ব্বাহে অক্ষম হইবেন।

পরবর্ত্তীকালে আমরা মধ্যে মধ্যে মন্ত্রিসঙ্ঘের কথা শুনিলেও, মনে হয় যে, এই সঙ্ঘ কার্য্যকারী ছিল না। হর্ষচরিতে মন্ত্রিসঙ্ঘের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এই সঙ্ঘ পাঁচ বৎসর অন্তর আহূত হইত। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ মন্ত্রিসঙ্ঘ প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য্যই করিত না ; রাজা স্বয়ং সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(লেখক—কবিরত্ন শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াত্ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ৭১

সান্বয়ব্যাখ্যা। যঃ নরঃ (কেবলং) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধধানঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ) অনসূয়ঃ (অসূয়াবর্জ্জিতঃ) (সন্) শৃণুয়াৎ (ইদং গীতাশাস্ত্রং শৃণুয়াৎ) সঃ অপি মুক্তঃ (পাপান্মুক্তঃ সন্) পুণ্যকর্ম্মণাম্ (অগ্নিহোত্রাশ্বমেধাদিপুণ্য-কর্ম্মকৃতাং) শুভান্ লোকান্ (প্রশস্তান্ লোকান্) প্রাপ্নুয়াৎ। ৭১

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র কেবল শ্রবণ করেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যবান্দিগের ভোগ্য শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন। ৭১

আলোচনা। ভগবান্ গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যার ফল ও গীতাপাঠের ফল বলিয়া, এই শ্লোকে গীতা-শ্রবণের ফল বলিতেছেন। কেহ যদি উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করেন, তখন গীতা-শ্রবণের অধিকারী কেহ যদি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সংশয়শূন্য মনে গীতাপাঠকের এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ও বিদ্বেষবুদ্ধি-শূন্য হইয়া মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করেন—“শৃণুয়াদপি” অর্থাৎ তাহার অর্থবোধ হউক বা না হউক ভগবৎকথাবোধে যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কেবল শ্রবণও করেন, তাহাহইলে সেই ব্যক্তিও পাপবিমুক্ত হইয়া দেহাবসানে পুণ্যবান্দিগের ভোগ্য লোকে গমন করেন। ৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়? ৭২

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে ধনঞ্জয় (অর্জ্জুন) ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে) তে (তব) অজ্ঞানসংমোহঃ (অজ্ঞানমূলকঃ বিচিত্তভাবঃ অবিবেকিতা) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ (স্বাভাবিকঃ চিত্তবিমোহঃ কিং প্রনষ্টঃ) ৭২

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন, তুমি এই গীতাশাস্ত্র একাগ্র মনে শুনিয়াছ ত? তোমার অজ্ঞানকৃত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে ত? ৭২

আলোচনা। আমরা ৬৪তম শ্লোকের আলোচনায় শ্রেষ্ঠগুরুর লক্ষণ বলিয়াছি। ভগবান্ অর্জ্জুনের সখা এবং গুরু। ভগবানের উপদেশ অর্জ্জুনের হৃদ্গম্য হওয়ায় তাঁহার অজ্ঞান-মোহজাল—স্বজন-জ্ঞাতি-বধের অবৈধতারূপ পূর্ব্বসংস্কার দূর হইয়াছে কিনা অর্থাৎ ভগবদুক্ত গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, জানিবার জন্য, জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে অর্জ্জুন! আমার কথিত এই গীতাশাস্ত্র সমগ্র তুমি একমনে শ্রবণ করিয়াছ ত? শ্রবণ করিয়া তোমার অজ্ঞান—মোহ জ্ঞাতি-স্বজন-বধপাপজ্ঞানরূপ পূর্ব্বসংস্কার দূর হইয়াছে ত? অর্থাৎ যতক্ষণ শিষ্য অর্জ্জুনের জ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ গুরু ভগবানের নিবৃত্তি নাই। ৭২

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

অন্বয়ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। হে অচ্যুত (অক্ষয়) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তব অনুগ্রহাৎ তদুপদেশজন্যজ্ঞানাৎ) (মম) মোহঃ (বিচিত্তভাবঃ অবিবেকিতা) নষ্টঃ (গতঃ) ময়া স্মৃতিঃ (আত্মতত্ত্ববিষয়া) লব্ধা (প্রাপ্তা) গতসন্দেহঃ (মুক্তসংশয়ঃ সন্) (অহং) স্থিতঃ অস্মি (অথ ইদানীং) তব বচনং (তব উপদেশং) করিষ্যে (কর্ত্তব্যং প্রতিপালনীয়মিতি নিশ্চিত্য তদনুষ্ঠানং করিষ্যে) ৭৩

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন—হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তোমার উপদেশে আমি স্থির ও নিঃসংশয় হইয়াছি, অতঃপর তোমার উপদেশ পালন করিব। ৭৩

আলোচনা। ভগবানের মুখে আত্মজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, দেহের বিনাশ সত্ত্বেও আত্মা নিত্য অবিনাশী। ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০শ শ্লোকে যে উপদেশ দিয়াছেন "—অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" তাহাই সত্য। 'অহং কর্ত্তা' ইতি বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্যের অনুসরণ করাই তাঁহার কার্য্য। যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা তিনি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলেন। অধিকন্তু গীতাশাস্ত্রোপদেশ পাওয়ায় তাঁহার পূর্ব্বমোহ নষ্ট হইল ও আত্মজ্ঞানের স্মৃতি পরিস্ফুট হইল। তাই তিনি কৃতাঞ্জলিতে ভগবানের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন—"হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমি তত্ত্ব-জ্ঞান-স্মৃতি লাভ করিয়া

স্থির হইয়াছি, অতঃপর তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব—তোমার উপদেশ মত চলিব।" ৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্যচ মহাত্মনঃ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণং ॥ ৭৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রশ্নে সঞ্জয় উবাচ। ইতি (এবম্প্রকারেণ) অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য মহাত্মনঃ পার্থস্যচ ইমং অদ্ভুতং (অত্যন্তবিস্ময়করং) লোমহর্ষণং (রোমাঞ্চকরং) সংবাদং (প্রশ্নপ্রতিবচনরূপং কথোপকথনং) অশ্রৌষম্ (শ্রুতবান্) ৭৪

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন—"আমি মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত রোমহর্ষণকর কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছি"। ৭৪

আলোচনা। গীতারম্ভের প্রথমেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিয়াছেন, যে, "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সমবেত আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডবেরা কি করিলেন?" এই প্রশ্নেই গীতার আরম্ভ। তদুত্তরে সঞ্জয় উভয়পক্ষের বীরগণের পরিচয় ও যুদ্ধসজ্জার কথা উল্লেখ করেন। যুদ্ধের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যে কথোপকথন হয়—তাহাই এই অষ্টাদশ-অধ্যায়মযী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এই গীতা-কথোপকথনে ক্ষত্রকুলবীর অর্জ্জুনের যুদ্ধনিবৃত্তির-ইচ্ছায় ধনুর্বাণ-ত্যাগ, ভগবানের সাংখ্যযোগ-কথন, জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা, ভগবানের বিভূতিযোগবর্ণন, অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন,—সমস্তই অতি অদ্ভুত এবং রোমহর্ষণকর, সন্দেহ নাই। ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি চ মহ্যং দত্তং ততোব্যাসস্যপ্রসাদাৎ) যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ (নতু পরম্পরয়া) ইমং গুহ্যং পরমং (শ্রেষ্ঠং) যোগং শ্রুতবান্। ৭৫

বঙ্গানুবাদ। আমি বেদব্যাসের প্রসাদে স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই পরমগুহ্য যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। ৭৫

আলোচনা। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া কিরূপে সঞ্জয় এই বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন,—ধৃতরাষ্ট্রের এই সন্দেহ-নিবারণ জন্য, সঞ্জয় কহিলেন, "ব্যাসদেবের কৃপায়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধবৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন

না করিয়াও যুদ্ধকার্য্যদর্শন ও কথোপকথন ও শ্রবণ করিতে পারিয়াছি। ব্যাসদেব আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে এইরূপ বর দিয়াছেন। তাহাতেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখেই এই সব কথা শুনিয়াছি"। ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামিচ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে রাজন (ধৃতরাষ্ট্র) কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং অদ্ভুতং পুণ্যং (পাপহরং) সংবাদং (কথোপকথনং) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারং বারং অনুস্মৃত্য) (অহং) মুহুর্ম্মুহুঃ (প্রতিক্ষণং) হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিতো ভবামি) ৭৬

বঙ্গানুবাদ। হে রাজন্. কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুত কথোপকথন স্মরণ করিয়া আমার মুহুর্ম্মুহুঃ রোমাঞ্চ হইতেছে। ৭৬

আলোচনা। এই গীতাশাস্ত্র পরমভক্তিকর তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশে পরিপূর্ণ। একে এই সমস্ত উপদেশ মানুষের সংসারবন্ধন-মোচনের উপায়, তাহাতে ইহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, অতএব ইহাতে সন্দেহের কোন কারণই নাই। সঞ্জয় গৃহে থাকিয়া দূরস্থ এই বৃত্তান্ত ও কথা প্রত্যক্ষবৎ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন—ইহা ভাবিয়াই মুহুর্ম্মুহুঃ রোমাঞ্চিত হইতেছেন। ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামিচ পুনঃ পুনঃ। ৭৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে রাজন্ হরেঃ (ভগবতো বাসুদেবস্য) (তাদৃশং) অত্যদ্ভুতং রূপং (বিশ্বরূপং) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারং বারং বিচিন্ত্য) মে (মম) মহান্ (অতিশয়িতঃ) বিস্ময়ঃ ভবতি। (অহং) পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি চ (রোমাঞ্চিতো ভবামি) ৭৭

বঙ্গানুবাদ। হে মহারাজ, ভগবান্ হরির সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ বার বার মনে করিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে এবং আমি পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতেছি। ৭৭

আলোচনা। সঞ্জয় গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অমৃতোপম উপদেশে যেমন কৃতার্থ হইয়াছেন, তদ্রূপ ভগবান্ হরির সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন এবং অধুনাও পুনঃ পুনঃ হর্ষাবেগে আকুল হইতেছেন। ৭৭

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

উপাধিভূষণ। সম্প্রতি ভবানীপুরের ভাগবতচতুষ্পাঠীর বিখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন; পণ্ডিত সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় সুপণ্ডিত ও সদ্‌ব্রাহ্মণ। তাঁহার এই সম্মানলাভের সংবাদে আমরা সত্যই আনন্দিত হইয়াছি।

খর্জ্জুরবৃক্ষের স্নান ও উত্থান। সমাচারপত্রে প্রকাশ যে, বাসুদেবপুর-থানার অন্তঃপাতী দুলালপুরগ্রামের শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ নায়কের পুষ্করিণীর তীরস্থিত একটী খর্জ্জুরবৃক্ষ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর দিকে হেলিয়া পড়ে ও পুষ্করিণীর জলে মস্তক ডুবাইয়া রাখে; সমস্ত দিন ঐভাবে থাকিয়া, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বভাবে অবস্থিত হয়। বৃক্ষটীর এইরূপ স্বভাব সম্প্রতিই দেখা যাইতেছে। ইহা কি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, না, দৈব-ব্যাপার? বৈজ্ঞানিক কি বলেন?

ম্যাচের কল। সংবাদপত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কিয়দ্দিন হইল রাণাঘাটে রেলষ্টেশনের অদূরে একটী ক্ষুদ্র ম্যাচের কল স্থাপিত হইয়াছে। কল কার্য্যকারী ও স্থায়ী হইলে, সুখের কথা, সংশয় নাই, তবে অনশনক্লিষ্ট জনগণের ন্যায় এদেশের অনেক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই অকালে কালকবলে পতিত হয়—ইহাই আশঙ্কার কথা। ভগবান্ করুন, স্থায়ী হউক্।

মঙ্গলের আগমন। ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রচার করিয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহ প্রত্যহ দশলক্ষ মাইল করিয়া পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইয়া গত ১০ই জুন মধ্যরাত্রিতে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। সে সময়ও মঙ্গল পৃথিবী হইতে ৪।০ কোটী মাইল দূরে ছিল। অনন্তের পথে 'মিলন' অনেকটা এইরূপই বটে।

শ্রীহরিঃ।

১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত।

হিন্দু-পত্রিকা।

২৯ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা।	শ্রাবণ।	১৩৩১ সাল। ১৮৪৬ শকাব্দা

পুনরুত্থানের উপায়।

কোন পতিত দেশের উদ্ধারসাধন করিতে গেলে, বিশেষ ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। আমরা সকলেই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু স্বদেশের উন্নতিকল্পে আমাদিগের মধ্যে কয়জনে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি? ইদানীন্তন আমরা সকলেই অর্থোপার্জ্জন করিয়া সাংসারিক ভোগবিলাস বৃদ্ধি করিবার জন্যই চেষ্টিত, কিন্তু ত্যাগের কথা একবারও স্মরণ করি কি না সন্দেহ। যে অর্থের জন্য আমরা লালায়িত, সে অর্থও হইতেছে না। বাক্যে আমরা যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সকলেই স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকি। যে কোন কার্য্যে আমাদের মান—মর্য্যাদা, ভোগ-বিলাসাদির কিঞ্চিৎ বাধা হওয়ার সম্ভব, তাহাকেই "অসম্ভব—অযুক্তিকর, আমাদের দেশ একার্য্যের জন্য এখনও উপযোগী হয় নাই," ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আপনাদিকে সেই সমুদায় কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র রাখি। দেশের

অমনোযোগে যখন কার্য্যটি পণ্ড হইল, তখন আমরা দূরদর্শিতার জন্ত যথেষ্ট বাহাদুরি লইয়া থাকি। আমরা সকলেই বলি যে, দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কিন্তু আমরা কি কখনও ইহা চিন্তা করি যে আমরা দেশের জন্য কি করিতেছি। সকলের মুখেই শুনুন, "অমুক ব্যক্তি বড়ই স্বার্থপর, দেশের জন্য কিছুই করেন না," কিন্তু কেহই নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবেন না যে, তিনি নিজে দেশের জন্য কি করিতেছেন। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারাতেই ভারতবর্ষে কোন কার্য্যেই কোন ফললাভ হইতেছে না।

হিন্দুসন্তান দিন দিন দেখুন কি প্রকার কিম্ভূতকিমাকার ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা সকলেই প্রচলিত ইংরাজিশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছি। এই ইংরাজিশিক্ষার পরিণামটা কি, তাহা কি আমরা কখনও চিন্তা করিয়া থাকি? ইংরাজিশিক্ষাদ্বারা জাতীয়জীবন বলবান্ কি দুর্ব্বল হইতেছে, তাহা কি কখনও আলোচনা করিয়া থাকি? ইংরাজিশিক্ষাদ্বারা আমরা হ্যাটকোটধারী, চুরটধূম্রোদ্গারণকারী অন্তরে বাহিরে ফিরিঙ্গিবেশধারী পুরুষ ভিন্ন, কি কোন যথার্থ খাঁটি লোক প্রাপ্ত হইতেছি? কেরাণীগিরিই যেন ইংরাজিশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। হাকিম বল, ডাক্তার বল, উকীল বল, ইঞ্জিনিয়ার বল, বাঙ্গালী প্রায় সকলেই কেরাণী। সকলেই চর্ব্বিতচর্ব্বণ করা ভিন্ন, কেহই মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেন না। কিন্তু এই ইংরাজি-শিক্ষার দাসত্ববৃত্তিদ্বারা শ্বেতপুরুষদিগের অনুগ্রহে নিশ্চিন্তভাবে দুই চারি পয়সা রোজগার করিয়া নিজের চাটুকু এবং গৃহিণীর গহনা দুই একখানা চলিয়া যায়—বলিয়া পতঙ্গগুলি যেরূপ দীপশিখার দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমরা ইংরাজিশিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেছি। কিন্তু বেশ চিন্তা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি, ধনের বৃদ্ধি, সাহিত্যবিজ্ঞানাদির উন্নতি, কিম্বা যাহাতে মানুষ খাঁটি মানুষ হয়, কিম্বা একটী জাতি খাঁটি জাতি হয়, এরূপ কিছুই হইতেছে না। এই শিক্ষার ফল কেবল অনুকরণ-প্রিয়তা। বস্তুতঃ ইংরাজিশিক্ষাতে আমাদিগকে ক্রমে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে। যে ভাবে দিন দিন ইংরাজিশিক্ষার বিস্তার দেখা যাইতেছে, যদি ইহার গতি কোনপ্রকারে রুদ্ধ না হয়, তাহাহইলে আর এক শতাব্দীর পরে ভারত-বর্ষের পুনরুত্থান একেবারেই অসম্ভবপর হইবে। ধর্ম্মবিহীন, অবিশ্বাসী, দুর্ব্বলচরিত্র, দুর্ব্বলশরীর ও স্বার্থের ক্রীতদাস হইয়া আমাদিগের সন্তানসন্ততি অন্তরে বাহিরে ফিরিঙ্গি হইবে এবং পরপদসেবাই তাহাদের জীবনের এক-মাত্র ব্রত হইবে।

ভাবিতে গেলেও চখে জল আসে, যে দেশের মাটিতে সোণা ফলে, সে দেশের লোকের পরিধানে বস্ত্র নাই, সে দেশের লোকের উদরান্ন জুটে না। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেই সহস্র সহস্র লোক যমালয়ে গমন করে, যাহারা জীবিত থাকে, তাহারাও অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ে। গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য অর্ণবপোতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, কলিকাতার ইংরাজবণিক্‌মণ্ডলীর রম্যহর্ম্ম্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আসামের চাবাগানসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত কর, বাঙ্গালা,-বিহার প্রভৃতি দেশের নীলকুঠির দিকে দৃষ্টিপাত কর, এককথায় ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আর তোমাদের অর্দ্ধনগ্ন লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এরূপ বৈষম্য কেন? এ সময় ইংরাজিবুলি ভুলিয়া গিয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বলিবে যে "অদৃষ্টের দোষ।" কিন্তু মনে মনে বেশ জান যে পুরুষকারের অভাবই তোমাদের দুর্গতির কারণ। স্বার্থপরতা আত্মকলহ ও ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই দুর্গতির কারণ। অহো! কি ভয়াবহ পরিণাম! অন্নপূর্ণার প্রসাদে যে দেশের অন্নে ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য দেশও অন্নে পরিপূর্ণ হইতেছে, সেই দেশের অধিবাসিগণ অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ-কলেবর। এখনও সাগররাজ অমূল্যমুক্তোপহার লইয়া পাদপ্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছে, এখনও গিরিরাজ বহুমূল্য রত্নোপহার লইয়া শিরঃপ্রদেশে প্রসারিত রহিয়াছে, এখনও সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী কাবেরী, কৃষ্ণা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পবিত্রসলিলা নদী ফলশস্যরত্নহারে বক্ষঃস্থল সুশোভিত করিতেছে, কিন্তু হায়, ভারতবাসী এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও দারিদ্র! ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বিড়ম্বনা হইতে পারে? সে দিন গত, কিন্তু একদিন ছিল যে সময় ভারতবর্ষ সর্ব্ববিষয়ে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল। পূর্ব্বগৌরব এখন নাই, স্মৃতিপর্য্যন্ত বিলুপ্তপ্রায়। বর্ব্বরজাতিদিগের যাহা আছে, ভারতবাসীদের তাহাও নাই, স্বীয় গৃহে পরাবসথশায়ী, পরান্নভোজী; ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, স্বাধীনতাবল, ধর্ম্মবল, সকলপ্রকার বলহীন হইয়া ভারতবাসী জীবন্মৃতবৎ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত নেত্রপ্রসারিত করিলে, কোনস্থানেই জীবন্ত মনুষ্য দৃষ্ট হয় না, কেবল কতকগুলি শবদেহ নেত্রপথে পতিত হয়। সকলশ্রেণীর লোকই সমাবস্থাপন্ন। ভারতের এই অমানিশি কি প্রভাত হইবে না? যতদিন না ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া ভারতবাসী স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে শঙ্কা করিবে, ততদিন কিছুই হইবে না।

সকল শ্রেণীর লোকেই সমস্বরে স্বীকার করেন যে, ভারতবাসী বিষম রোগগ্রস্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু বিভিন্নশ্রেণীর নেতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা করেন। কেহ বলেন "বাল্যবিবাহ রহিত কর," কেহ বলেন "ব্যায়ামাদি শিক্ষা দেও," কেহ বলেন "বৃত্তিশিক্ষা দেও," কেহ বলেন "কংগ্রেসে যোগ দেও," কেহ বলেন "অবরোধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেও," কেহ বলেন "বর্ণভেদপ্রথা উঠাইয়া দেও," কেহ বলেন "পুতুলপূজা রহিত কর," কেহ বলেন "ঘরে ঘরে ইংরাজি-শিক্ষা দেও, বাণিজ্য বৃদ্ধি কর," ইত্যাদি অনেকে অনেক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কেহ বলেন আবার "সবগুলি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দেও।" কিন্তু প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত তরুলতার মূলে জলসিঞ্চন না করিয়া উহার শাখা-পত্রাদিতে জলসিঞ্চন করিলে, তরুলতা কি সজীব থাকিতে পারে?

এক ধর্ম্মবলদ্বারাই জাতীয়জীবন বলীয়ান্ হয়, এই ধর্ম্মবলই জাতীয় জীবনের মূল, উহা উপেক্ষা করিয়া শাখাপত্রাদির প্রতি যত্ন করিলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কুশলের একমাত্র কারণ। ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন হইয়া কোন জাতি উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন হইয়াই দেশসমূহ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়াই হিন্দুজাতি এককালে সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল এবং সর্ব্ববিষয়ে পৃথিবীর অনুশাসিতা হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া সেই জাতি এইক্ষণে বর্ব্বরজাতিদিগেরও হেয় হইয়াছে। বাহ্য চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ হইও না, ঐ বাহ্য চাক্‌চিক্যই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইয়াছে। জাতীয় জীবন ধর্ম্মতৈলবিহীন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপসদৃশ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শনে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া উহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে, কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তির গাত্রে অসহ্য প্রদাহ উপস্থিত না হয়! কিন্তু তাঁহারা মাতৃভূমির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন? রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে কিছু হইবে না, উহা কেবল শাখাপত্রে জলসিঞ্চনমাত্র। আরও দেখুন, সর্ব্বপ্রকার বলের প্রস্রবণস্বরূপ ধর্ম্মবল না থাকাতেই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনই যেন আবেগশূন্য। অতএব যদি ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি চাহেন, ধর্ম্মজীবন বলীয়ান্ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হউন।

উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বর্ত্তমানে যেরূপ সুযোগ রহিয়াছে, এরূপ সুযোগ চিরকাল নাও থাকিতে পারে। বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে ভারতবর্ষ তাহার ঘোরদুর্দ্দিনে পৃথিবীর একটী প্রবলপরাক্রান্ত অথচ সভ্যজাতির শাসনাধীনে অবস্থিত রহিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজিতা, বহিরূপদ্রবেরও কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। সাম্যবিধি-পরিচালনে রাজপুরুষেরা ধর্ম্ম-উন্নতিসাধনের পথ অপ্রতিরুদ্ধ রাখিয়াছেন। ধর্ম্মজীবন বলিষ্ঠ করিবার জন্য এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। অনুকূলস্রোত, অনুকূল পবন, সকল সময়ে ভাগ্যে উপস্থিত হয় না এবং মূর্খ ভিন্ন উহা কেহই উপেক্ষা করে না।

হে ভারতবাসিগণ! ধর্ম্মের প্রভাবেই ভারতবর্ষ একদিন জগতের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াছিল, এই ধর্ম্মের জন্য পরপাদদলিত পরপীড়িত পরমুখাপেক্ষী পরাধীন ভারত এখনও বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আদৃত হইয়া থাকে, এই ধর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষ, সিংহল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি দেশের নিকট 'পবিত্র' বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যদি ভারতবর্ষ কখন পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত হয়, সেও নিশ্চয়ই ধর্ম্মের বলে হইবে। সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুই ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধারসাধন করিবে। হে ভারতবাসি! বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ কর, ক্ষণবিধ্বংসী শরীরকে যথাসর্ব্বস্ব মনে করিও না, দেহের অন্তর্বর্ত্তী শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত দেহীকে জানিতে চেষ্টা কর।

ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জীবন সফল হয়, ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে তাহার জীবন নিষ্ফল হইল, এইজন্য ধীরব্যক্তিরা জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমরত্বলাভ করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যার অবহেলায় ভারত দুর্গতির শেষসীমায় উপস্থিত হইয়াছে; আর সময় নাই—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়োবদন্তি ॥

অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে উত্থান কর, জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠাচার্য্যের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর, এ জ্ঞান বড়ই কঠিন জ্ঞান, শাণিতক্ষুরের ধার যেমন পদের দ্বারা দুরতিক্রমণীয়, পণ্ডিতগণ ব্রহ্মবিদ্যার পথও তদ্রূপ দুর্গম বলিয়াছেন, এইজন্য

শ্রেষ্ঠাচার্য্যের শরণ গ্রহণ কর—ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর। উহা লাভ করিলে তোমার ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না। তখন দেখিতে পারিবে, তুমি কত উচ্চ, কত মহৎ, কত পরাক্রমশালী; ভূমণ্ডলে তোমার শক্তির নিকট কোন শক্তিই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। একবার নশ্বরদেহের মমতা পরিত্যাগ কর, আত্মার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন কর, তখন দেখিতে পারিবে যে, তুমি কত শক্তিসম্পন্ন। ঋষিদিগের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর, দেখিবে ভারতের সুদিন আবার ফিরিয়া আসিবে। প্রজাপতির "দ," "দ," "দ,"—যাহা অদ্যাপি বজ্রদ্বারা নিনাদিত হইয়া থাকে, প্রজাপতির দ, দাম্যত, দ, দয়ধ্বম্, দ, দত্ত, উপদেশ স্মরণ কর, দেখিবে যে, সমাজ আপনি আপনি উন্নত হইবে; ইন্দ্রিয়সংযম কর, হৃদয় পবিত্র কর, আচণ্ডালে প্রেমপ্রদর্শন কর, মানবকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন কর, পশ্বাদির প্রতিও দয়াপ্রদর্শন কর, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ কর, দরিদ্রে দান কর, দেখিবে, তোমার হৃদয়ে কত বল, দেখিবে, তোমার ধর্ম্মবলের নিকট পাশববল পরাভূত হইবে। ভারতবর্ষ যে কোনদিন মধ্যাহ্নতপনসম সমুজ্জ্বলপ্রভায় প্রভান্বিত ছিল, সে কি ধনের জন্য, না বলের জন্য? সে কি ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য নহে? সর্ববিষয়ে যে ভারতবাসী জগতের আচার্য্য-পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, সে কি ধনের জন্য, না বলের জন্য? সে কি জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য নহে? সখের ধর্ম্মে কিছু হইবে না, উহাতে কোন পতিত দেশ উদ্ধার হয় নাই। ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, স্বার্থ একেবারে পরিত্যাগ কর, পরোপকার জীবনের মূলমন্ত্র কর, মর্ত্ত্যে দেবোপম হও, স্বীয় উদাহরণদ্বারা সকলকেই দেবতায় পরিণত কর, নানাবিধ সামাজিক বাধা প্রতিবন্ধক তুচ্ছজ্ঞান কর, জ্ঞান বিকীর্ণ কর, আলোকের নিকট অন্ধকার থাকিতে পারে না; ফলের প্রতি আশা করিও না, কার্য্যক্ষেত্রে স্বীয় কর্ত্তব্য করিয়া যাও, ধর্ম্মের বাণিজ্য করিও না। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ নৃপতি যুধিষ্ঠিরের পবিত্র বাক্য স্মরণ করিয়া কি সুখে কি দুঃখে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না।

নাহং কর্ম্মফলান্বেষী রাজপুত্রিচরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যি যজেযষ্টব্যমিত্যুত॥
অস্তু বাত্র ফলং মা বা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ॥
ধর্ম্মংচরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্মফলকারণাৎ।

আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ॥
ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম্॥

হে দ্রৌপদি! আমি কর্ম্মফল অন্বেষণ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না, দান করা কর্ত্তব্য, তাই আমি দান করি, যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য, তাই আমি যজ্ঞ করি! ফল হউক্ আর নাই হউক্, গৃহে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা যথাশক্তি করিয়া থাকি। আমি সাধুজনের ব্যবহার ও শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু ধর্ম্মের ফলকামনা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করি না। হে দ্রৌপদি! আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মে আবদ্ধ, আমি ধর্ম্মের বণিক্ নহি, যাহারা ধর্ম্মবণিক্ তাহারা ধর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

অতএব ধার্ম্মিক হও, কিন্তু ধর্ম্মের ব্যবসা খুলিও না, তোমার কর্ত্তব্য তুমি সম্পাদন কর, ফল ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ কর—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

সদাসর্ব্বদা স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর, কর্ত্তব্যসম্পাদনেই তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম করিও না, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়াও থাকিও না।

অতএব কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের এই উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিয়া, এস, আমরা স্বদেশের মঙ্গলময়কার্য্যে ব্রতী হই। ভারতবর্ষ হইতে কি আধ্যাত্মিকভাব অন্তর্হিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে কি ঋষিদিগের লোকহিতব্রত একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে? যদি লুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেইভাব পুনর্জীবিত না করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের সম্ভব নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে শিক্ষাবিধান প্রচলিত আছে, উহাদ্বারা দেবভাব, ঋষিভাব পরিবর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, হৃদয়ে কেবল কতকগুলি পাশ্চাত্য কুসংস্কার প্রবেশ করে এবং আহার-বিহার বেশবিন্যাস আদিই জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই বিজাতীয় শিক্ষার গতিরোধ না করিলে, ভারতের মঙ্গলসম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালী জ্ঞানপিপাসু বলিয়া অন্যান্য জাতির নিকট পরিচয় দেয়, কিন্তু দেশে কয়জন লোকে জ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন? চাকুরি

চাকুরি! চাকুরিই আমাদের অভীষ্টদেবতা, জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রতি প্রীতি কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে। যে সমুদয় দেশে আর্য্য ঋষিগণের জ্বলন্ত উদাহরণ নাই, সেই সকল দেশেও জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবায় অনেকে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে, কিন্তু ঋষিনিকেতন ভারতভূমিতে এরূপ একজন লোকও আছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। দেশের সাধারণ লোক নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে চিরকালই ব্যাপৃত থাকিবে, কিন্তু দেশে এমন কতকগুলি লোক চাই, যাঁহাদের আত্মপর-ভেদজ্ঞান রহিত হইয়াছে, এবং যাঁহারা পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; এইরূপ কতকগুলি লোক থাকিলে, তাঁহাদের উদাহরণে সাধারণের মধ্যে এক অপূর্ব্বশক্তির বিকাশ হয়, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, স্বার্থপরতা দূরে যায়, দেশহিতৈষিতা সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশে সর্ব্বস্বত্যাগী লোক কি নাই? তাহাও আছে; কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বস্বত্যাগী-তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা ভিন্ন আমরা ভক্তির উদ্রেক করাইতে চেষ্টা করি না। সংসারত্যাগী লোকহিতরত সাধুমহাপুরুষদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মান দূরে থাকুক; "ভণ্ড অলস" বলিয়া তাঁহাদিগকে লোকের নিকট ঘোষণা করি। তবে একথাও অস্বীকার করি না, যে, যদি একজন যথার্থ সাধু দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সহস্র ভণ্ড তপস্বীও দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদের দ্বারা সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের ব্যভিচার, কপটাচার প্রভৃতি সমাজদেহ কলুষিত করে। অতএব ভারতবর্ষে যাহাতে যথার্থ সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া কতকগুলি ভারত-সন্তান যদি বেদ, উপনিষৎ, প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, লোকহিতব্রতে স্বীয় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া ভারতবর্ষের বিবিধস্থানে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারে রত থাকিয়া, ভারতবাসীর ধর্ম্মজীবন নববলে বলীয়ান্ করিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজ এক নূতন আকার ধারণ করিবে। শীতপ্রধান দেশের পত্র-তিরোহিত তরুলতা যেরূপ বসন্তাগমে নূতনপল্লবে বিভূষিত হয়, ভারতবর্ষও তদ্রূপ ধর্ম্মস্পর্শে নববলে বলীয়ান্ হইবে। মানবহৃদয় মধ্যে যে ঐশীশক্তি আছে, তাহার বিকাশ না করিলে, মানুষ সে ঐশীশক্তির সত্তা বুঝিতে পারে না। জলসিঞ্চনে যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়; সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারাই মানবের অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির বিকাশ হয়, আমিত্বের প্রসার হয়, আত্মপরভেদজ্ঞান রহিত হয়, শরীরের প্রতি মমতা নষ্ট হয়, তখন পরের জন্য প্রাণ দিতে কোন কষ্টই থাকে না, তখন বলপূর্ব্বক ধার্ম্মিক হইতে

হয় না, বলপূর্ব্বক পরোপকার করিতে হয় না, তখন ধর্ম্ম ও পরোপকার স্বাভাবিক বৃত্তি হইয়া যায়। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে উহাই বলিয়াছেন, ধর্ম্ম কার্য্য করা তাঁহার স্বভাবের এক অংশ হইয়াছিল। আদর্শ জীবন সর্ব্বত্র সুলভ নহে, কিন্তু আদর্শ জীবন প্রাপ্ত না হইলেও হৃদয় মধ্যে আদর্শ-জীবনের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিলেও যথেষ্ট হইল; তাহাহইলেও আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, গন্তব্য স্থানের দিকে যখন গমন করিতেছি, তখন কোন না কোন সময়ে ঐ স্থানে পৌঁছিতে পারিবই পারিব। কিন্তু হৃদয়ে কোন কোন আদর্শের মূর্ত্তি না থাকিলে, আমরা কাহার দিকে গমন করিব? তখন লক্ষ্যবিহীন হইয়া কেবল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি, কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় স্রোতের ক্রীড়ণক হই, তৃণের ন্যায় সামান্য বায়ুপ্রভাবেই পরিচালিত হই। ভারতবাসীর কি কোন আদর্শ আছে? যদি থাকে সে আদর্শ হ্যাটকোটধারী শ্রেয়মূর্ত্তি ইংরেজ, এই আদর্শ সাগরগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রেয়মূর্ত্তি আর্য্য ঋষির আদর্শ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন কর এবং তৎপ্রদর্শিত পথে গমন কর, তবেই দেখিবে মৃতপ্রায় ভারতবাসী পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

সময় যায়, এই অবনীমণ্ডলে দুর্লভ মনুষ্য জন্মধারণ করিয়া কেবল আহার বিহার করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে? অন্ততঃ তোমাদের পুত্রপৌত্রদিগের ভাবীমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদনুষ্ঠানে ব্রতী হও। জমিদারী, কোম্পানীর কাগজ, এমারত আদি যাহা করিতেছ, এসমুদায় তুমি নিজে অনন্তকালে ভোগ করিবে, সেইজন্য করিতেছ, না ভবিষ্যৎ বংশাবলীদিগের উপকারের জন্য করিতেছ? অনন্তকালের সহিত তুলনায় তোমার জীবন কত ক্ষণস্থায়ী তাহাও একবার স্মরণ করিয়া দেখ, যদি তাহাই হইল, তোমার আত্মসুখের প্রতি ক্ষণকাল উদাসীনভাব ধারণ করিয়া তোমার পুত্রপৌত্রাদির মঙ্গলে জীবন উৎসর্গ কর। অতএব আর সময় নাই, বৃথা গণ্ডগোলে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান প্রচলিত কর। ভারতে সন্তানের সংখ্যা যথেষ্ট, ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে সন্তান হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া পরদ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে, যে সন্তান বলবীর্য্য-ও ধর্ম্মবিহীন হইয়া মনুষ্যাকারে পশুভাবে জীবনযাপন করিবে, সে সন্তানের প্রয়োজনই বা কি? যাহারা সৎপুত্র উৎপাদন করিতে চান, তাহাদের জীবনের প্রথমাংশ ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিতে হইবে। যাহাদের সাংসারিক কোন অভাব নাই সুখ সম্ভোগও যথেষ্ট হইয়াছে,

অন্ততঃ তাহারা লোকহিত ব্রতে ব্রতী হইতে পারেন। অর্থের সেবায় চিরকাল গেল, আচ্ছা ধর্ম্মের সেবায় দেখদেখি কি হয়? কিন্তু ইহাও বলি, যখন শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে, যখন মানসিক বৃত্তিগুলি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, যখন স্মৃতি লোপ হইয়া আসিতেছে, যখন উৎসাহ ও সাহস লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে, যখন মৃত্যু অতি সন্নিকট, তখন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অধিক ফল হইবে না। দেশের মঙ্গলসাধনে যদি চিত্ত ধাবিত হয়, যৌবনেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। নিশান্তে যেরূপ দিবা অবশ্যম্ভাবী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ভারতের পুনরুত্থান তদ্রূপ অবশ্যম্ভাবী। তর্কজাল উপস্থিত করিয়া হৃদয় মোহাচ্ছন্ন করিও না, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আত্মায় বিশ্বাস কর, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস কর, বিশ্বাসের প্রভাবে দেখিবে সমুদায় বাধাবন্ধক নবোদিত ভানুর সমক্ষে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মচারীরা আপনাদিগের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবেন পরের সুখদুঃখই তাহাদের সুখদুঃখ করিবেন। ধন, মান, যশ, লিপ্সা গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া শীত গ্রীষ্ম তুচ্ছ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র আর্য্য ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া স্বীয় জীবনের উদাহরণ ও ঋষি উপদেশদ্বারা ভারতবাসীর ধর্ম্মজীবন পুনর্জ্জীবিত করিবেন। নির্ম্মল ধর্ম্মস্রোতে যখন ভারতের পাপরাশি বিধৌত হইবে, তখনই ভারতবর্ষ যাহা ছিল তাহা হইবে, আর যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত কংগ্রেসই কর, অসহযোগিতাই কর সিভিল-সার্ভিসেই প্রবেশ কর, কিছুতেই কিছু হইবে না, এটি অকাট্য সত্য।

ব্রহ্মচারীরা সকলেই যে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন এরূপ নহে। ধর্ম্মপ্রচারই তাহাদের অধিকাংশের জীবনের ব্রত হইবে। কিন্তু তাহারা লোকহিতার্থে নানাবিধ শাস্ত্র, বিজ্ঞানাদি অধিকার করিয়া মানবের নানাবিধ হিতসাধনে ব্রতী থাকিবেন। স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে কেহ নক্ষত্রবিদ্যা, কেহ ভূবিদ্যা, কেহ স্থপতিবিদ্যা, কেহ রসায়ন, কেহ আয়ুর্বেদ্যা, কেহ পদার্থবিদ্যা এইরূপ বিবিধ বিদ্যায় অনুশীলন করিয়া সাধারণকে ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জনের উপায়ও শিক্ষা দিবেন। আজ যে আমাদের দেশে বিশেষ মৌলিক-চিন্তা নাই, তাহার কারণ যে আমাদের মধ্যে অল্প লোকই জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। যদি ব্রহ্মচারী হইয়া আমাদের দেশে বহু সংখ্যক লোক বিদ্যার সেবায় নিরত থাকিতেন, তাহাহইলে দেশের কি এই অবস্থা থাকিত? কখনই নয়।

কেবল সংহার করিলে চলিবে না, সৃষ্টি করাও চাই। ইহা ভাল নয়, উহা ভাল নয় এইরূপ সংহারাত্মকবাক্যদ্বারা কোন লাভ হয় না, দেশের

কোন উপকার হয় না। দেশের লোক সকলই বর্ত্তমান শিক্ষাবিধান, বর্ত্তমান ইংরাজ অনুকরণ, বর্ত্তমান প্রেয়প্রিয়তার প্রতি দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহাদের কোন শ্রেয়পথও দেখান চাই, নতুবা কোন ফল হইবে না। অতএব আসুন, আমরা সমবেত হইয়া কিছুকালের জন্য পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কিছুকালের জন্য আমাদের প্রশান্তমনা স্বাধীন পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র স্মরণ করিয়া, আমাদের ক্রীতদাসোচিত হৃদয়ের অপ্রশস্তভাব পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষে সর্বত্র ব্রহ্মচর্য্য প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হই। বর্ত্তমান বংশাবলীর কিছু করিতে পারি বা না পারি, ভবিষ্যদ্বংশাবলী যাহাতে অধোপাতে না যায়, তাহার চেষ্টা করি।

অনেকেই বলেন এত ব্রহ্মচারী পাব কোথায়? তাহাদিগকে আমি বলি যে ব্রহ্মচারীর অভাব হইবে না। আজিও ভারতবর্ষে ধর্ম্মবীজ আছে উহা অঙ্কুরিত করা চাই; তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র সাধু দৃষ্ট হইত না। হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মভাব না থাকিলে, কি কেহই স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, গৃহ, ধন, বিলাসাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে? ভারতবর্ষের যেখানে যাও, সেই স্থানেই এইরূপ শত শত ত্যাগী লোক দেখিতে পারিবে। কিন্তু ইহাদের যে ধর্ম্মবীজ আছে, তাহা সর্ব্বসময়ে সুন্দররূপে অঙ্কুরিত হয় না, বৃক্ষেও পরিণত হয় না, কুশিক্ষা, কু আদর্শ, কুসঙ্গ ইত্যাদির দ্বারা ঐ বীজ অনেক সময় একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কেবলমাত্র বাহিরে ধর্ম্মভাব থাকে, অন্তরে সাধারণ গৃহস্থের যেরূপ ভাব তাহাই থাকে। ইহাদের অনেকের আমিত্বের প্রসার হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং সঙ্কোচকেই প্রসার জ্ঞানে অনেকে বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া থাকেন। ত্যাগ আছে কিন্তু সেই ত্যাগ শ্রেয়াভিমুখে পরিচালিত করা চাই। ব্রহ্মচারী আশ্রমসকল স্থাপিত হইলেই যে সহস্র সহস্র ব্রহ্মচারী সেই আশ্রমের নিয়মানুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় জীবন লোকহিতব্রতে উৎসর্গ করিবেন, তাহা নাও হইতে পারে. কিন্তু ত্রিশকোটি ভারতবর্ষের মধ্যে যদি প্রতি জেলাতে সহস্র, সহস্র না হউক্ শত, শত না হউক্ দশ, দশ না হউক্ একজন লোকও আমরা পাই, তাহাহইলে আর চিন্তা কি? এক হইলেই দুই, দুই হইলেই তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় হইবে তৎপরে দশ, শত, সহস্র পাওয়া কেবল কালসাপেক্ষ। একই গণিতের মূল, এক হইলেই সব হইল, অন্যান্য সংখ্যা এক হইতে উঠুক। সকল কার্য্যেই একজন

হইলেই আর চিন্তা নাই। এই বিপুল ভারতবর্ষের মধ্যে কি আমরা ধর্ম্মপ্রাণ পরহিতে ব্রত একজন লোকও পাইব না? যে যাহাই বলুক আমি ইহা কখনই বিশ্বাস করিব না। যে পর্য্যন্ত বেদ উপনিষৎ আদির স্মৃতিমাত্র ভারতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ চৈতন্যবুদ্ধাদির স্মৃতি পর্য্যন্ত ভারতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এরূপ লোকের অভাব হইবে না। আজ যদি ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃতভাষা বিলুপ্ত হইত, আজ যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক গৃহ হইতে দেবদেবীর পূজা অন্তর্হিত হইত, আজ যদি পৃথিবীর কোন স্থানেই বেদ, উপনিষদ্ আদি গ্রন্থ পাওয়া না যাইত, আজ যদি ভারতবাসীরা সর্ব্বপ্রকার আর্য্যজনোচিত আচার ভ্রষ্ট হইয়া নূতন একটী অনার্য্যজাতিতে পরিণত হইত, তাহাহইলেও ভারতের নীলনভোমণ্ডল, ভারতের গগনভেদী উচ্চশৃঙ্গ হিমালয়, ভারতের পবিত্রসলিলা গঙ্গাযমুনাদি কোন না কোন ভারতবাসীর হৃদয়ে সেই প্রাচীন ঋষিভাব জাগরিত করিয়া দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দেশের শাস্ত্র পাঠ করিয়া জর্ম্মন সোপানহারও শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই দেশের লোক সেই সমুদায় শাস্ত্রাদি প্রত্যহ পাঠ করিয়া যে একেবারে ধর্ম্মহীন হইয়া গিয়াছে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? কিছুতেই না। ধর্ম্মবীজ এখনও আছে, উহাকে জলসিঞ্চনদ্বারা অঙ্কুরিতমাত্র করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মচারীর অভাব হইবে না, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিও না। আজও অনেক সাধুপুরুষ আছেন, যাঁহারা লোকহিতব্রতে ব্রতী এবং তাঁহারা ঐরূপ আশ্রম স্থাপনপক্ষে নিশ্চয় যোগদান করিবেন। ভারতবর্ষের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। সাধারণের সমক্ষে স্বার্থত্যাগের জলন্ত উদাহরণ দণ্ডায়মান করিতে হইবে। একজন সাধুর সংস্পর্শে একজন সাধুর উদাহরণে কত শত জীবনের যে মূলমন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। আজ যদি এই বঙ্গদেশে একজন লোকও থাকিতেন যিনি নিজের জন্য কখনও কোন চিন্তা করেন, অথচ যিনি সকলকেই স্বজন জ্ঞান করেন, যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে বিভূষিত, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া লোকহিতব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন, যাহার জীবনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কামধর্ম্ম হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার জলন্ত উদাহরণে কি না হইত? তাহা হইলে আর কি চিন্তা ছিল। বক্তৃতা আদি পরিত্যাগ কর, ভারতবর্ষের দুটি চারিটী খাঁটি মানুষ যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর, মেকিমানুষের দ্বারা কিছুই হইবে না। নাস্তিক খুলি ছাড়িয়া দেও; ব্রহ্মচর্য্য মূর্খতা, কেবল কল্পনা, ব্রহ্মজ্ঞান বাতুলের উক্তি,

এই সব-আসুরিক সংস্কার পরিত্যাগ কর, একবার আর্য্যঋষিগণের পদপ্রান্তে পড়িয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

কত শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-ঋষিগণ উপনিষদাদিররচনা করিয়া গিয়াছেন, আজীবন প্রত্যহ উহা পাঠ করিতে থাক, কখন বিরক্তি হইবে না, কখন নীরস লাগিবে না, যতবার পড়িবে ততবার পড়িতে ইচ্ছা করিবে, হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তির উদয় হইবে। কেন এরূপ হয় কেন? দশবৎসর পূর্ব্বে যে সমুদায় গ্রন্থরচিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি আর লোকে পড়ে না যদিও পড়ে তাহাহইলে একবারের অধিক দুইবার পড়িতে ইচ্ছা হয় না; সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সমুদায় গ্রন্থরচিত হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠে পাঠলিপ্সা বৃদ্ধি হয়, এরূপ বিভিন্নতার কারণ কি? আমি কিছুই বলিব না, নিজেই বুঝিয়া দেখ ইহার কারণ কি? বুঝিয়া দেখ এবং বুঝিয়া সেই আর্য্যঋষিগণের প্রদিষ্টপন্থাবলম্বন করিয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলীর উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লও, ভারতবর্ষের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন কর।

কিন্তু ভারতবর্ষের কোন একস্থানে সর্ব্বপ্রথম একটি আদর্শ আশ্রম স্থাপন আবশ্যক। যে স্থানে নগরের কোলাহল, বিলাস প্রলোভন নাই, এমন স্থানে এই আশ্রম স্থাপন আবশ্যক। যে স্থানে কেবলমাত্র বাস করিলে ব্রহ্মচারীর হৃদয় প্রশস্ত হয়, অন্তঃকরণ পবিত্র হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হয় যেস্থানে শান্তিদেবী মূর্ত্তিময়ী হইয়া বিরাজিতা, যেস্থান লোকানন্দদায়িনী কোন পুণ্যসলিলা কুলকুল স্বরে প্রবাহিতা হইয়া ভগবানের নির্ম্মল চরণ স্মরণ করায়, যেস্থানে কোন অভ্রভেদী গিরিরাজ তাঁহার মহিমাহৃদয়ে জাগরূক করে, যেস্থানে বারিধিবক্ষে সেই ভূমার অসীমকীর্ত্তি প্রতিভাত হয়, এমন কোন আত্মপ্রসারানুকুল স্থানে এই আশ্রম স্থাপন করা আবশ্যক। যেস্থানেই হউক্ না কেন, এমন কোনস্থানে এই আশ্রম স্থাপন করা আবশ্যক, যেখানে আশ্রমবাসীরা অন্য কোন শিক্ষা না পাইলেও কেবল ভগবানের মহিমাচিন্তনে মহীয়ান হইতে পারে।

আশ্রমটিকে প্রথম হইতেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা যাইতে পারে না, উহা কালসাপেক্ষ; অভাব এবং সুযোগ দেখিয়া ক্রমে উহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এই আশ্রমে একটি আদর্শ পুস্তকালয় থাকিবে, প্রথমতঃ বেদ হইতে পুরাণকাব্যপর্য্যন্ত যাবত সংস্কৃত গ্রন্থ ইহাতে সংগৃহীত হইবে। তৎপরে

ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি এবং ক্রমে পৃথিবীস্থ নানা-দেশীয় নানাভাষায় যাবৎ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এস্থানে সংগৃহীত হইবে। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য থাকিবেন। বলা বাহুল্য আচার্য্যগণও ব্রহ্মচারী হইবেন। ব্রহ্মচারীগণ ব্যাকরণ এবং সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যায়ন করিতে যে সমুদায় শাস্ত্র প্রয়োজন, তাহা অভ্যাস করিয়া স্বীয় উপযোগিতা অনুসারে বেদ, উপনিষদ সমগ্র বা স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে আচার্য্যের আদেশ অনুসারে অংশ মাত্র পাঠ করিয়া আচার্য্যের উপদেশ লইয়া ভারতবর্ষের কোন একটি প্রদেশে স্বীয় স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র করিবেন। যিনি যে প্রদেশ তাহার কার্য্যক্ষেত্র করিবেন, তিনি তৎপ্রদেশে প্রচলিত ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা হিন্দি, মহারাষ্ট্রাদি ভাষা অভ্যাস করিবেন। সুতরাং আশ্রমে এই সমুদায় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরও আবশ্যক। তবে ইহা ঠিক যে একবারে বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে না। প্রযোজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আচার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ক্রমে ভারতবর্ষের বহির্ভাগে সনাতন ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যক হইলে ভারতবর্ষেতর দেশসমূহেরও ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞান, প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক শাস্ত্রাদির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। এইজন্য আধুনিক বিজ্ঞানাভিজ্ঞ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষকেরও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে সকলেই মোটামুটি বিবিধ বিজ্ঞানের বিষয় অবগত থাকিবেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে কোন একটী বিজ্ঞান বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে জীবন অতিবাহিত করিবেন। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলে, আশ্রমে যে কোন বিষয়ে মানবের জ্ঞান আবশ্যক, তাহা সমুদায়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রহ্মচারী ইঞ্জিনিয়ার, ব্রহ্মচারী চিকিৎসক, ব্রহ্মচারী উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ, ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ব্বিৎ, ব্রহ্মচারী গণিতবিৎ, এইরূপ সর্ব্ববিষয়েরই ব্রহ্মচারী পণ্ডিত হইবে এবং তাহারা লোকহিতে রত থাকিয়া তাহাদের অভ্যস্ত বিদ্যার উন্নতিসাধন করিবেন। কোন গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে অধিকারী হইবেন, কিন্তু যতদিন বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিবেন, ততদিন আশ্রমে থাকিয়া বিদ্যালয়ের নিয়মপালন করিতে

হইবে। এই শ্রেণীর বিদ্যার্থীর জন্য আশ্রমের কতকগুলি নিয়ম অবশ্য পালনীয় হইবে, অপর কতকগুলি নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে পালন করিলেও পারিবেন না করিলেও পারিবেন। প্রথমে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের আচার্য্যের অভাব হইলে, গৃহস্থ আচার্য্যের দ্বারাই কার্য্যসম্পন্ন করিতে হইবে কিন্তু এ সমুদায় আচার্য্যও আশ্রমে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইবেন পরে, সুবিধানুসারে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের বন্দোবস্ত করা যাইবে। উত্তর, পশ্চিম, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় প্রদেশে এখনও শত শত বালককে পিতা মাতার সম্মতিক্রমে সন্ন্যাসীদের নিকট দীক্ষিত হইতে দেখা যায়। প্রস্তাবিত আশ্রমের জন্য এইরূপ বালক পাওয়া অসম্ভব নহে এবং তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য, গিরি, ভারতী সরস্বতী প্রভৃতি ভগবান্ শঙ্করস্বামীর পন্থাবলম্বী সাধুরুরুষও পাওয়া যাইতে পারে। পুণ্যপত্তনে (পুণানগরে) আনন্দাশ্রম নামে একটী আশ্রম আছে। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত মহাদেব চিমনাজি আপ্তে উক্ত আশ্রম স্থাপিত করেন ঐ আশ্রম কয়েকটী সাধু প্রাচীন শাস্ত্রাদি সটীক প্রকাশ করিয়া থাকেন আশ্রম হইতে তাহাদের সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ঐ আশ্রমে শাস্ত্রপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য হয় না। কিন্তু ঐ আশ্রমের কথা এস্থলে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে প্রস্তাবিত আশ্রমে চেষ্টা করিলে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের অভাবও হইবে না। আশ্রমের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, উহা বিদ্যার্থী ও আচার্য্যদিগের বাসোপযোগী করিয়া এইরূপ কয়েকজন সাধু এবং তাহাদের শিষ্যদিগকে আশ্রমে রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। ক্রমে সুযোগানুসারে আশ্রমের বিবিধ উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে হইবে ঐ আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীদিগকে আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাস গণিত আদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার জন্য আপাততঃ ইংরাজি শিক্ষিত উপযুক্ত দুই এক টী শিক্ষকেরও প্রয়োজন। নব্য ও প্রাচীন সংযোগ হওয়ায় উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের দ্বারা উপকৃত হইবার সম্ভব এইরূপ কোন ব্রহ্মচারী শিক্ষক আপাততঃ না পাইলে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান সচ্চরিত্র গৃহস্থ শিক্ষকের দ্বারাই ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আশ্রমটী কিরূপে গঠিত হইবে, উপরে তাহার আভাস দেওয়া গেল। আশ্রম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলে, ইহাতে বেদ, (ব্রাহ্মণ, সাহিত্য, উপনিষৎ,) ষড়দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ এবং জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদগণিত, বীজগণিত,

জ্যামেতি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় তাবৎ প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক বিবিধ বিজ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রহ্মচারী আশ্রমের নিয়ম পালন করিয়া পাঠ সমাপন করিয়া হয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারে নয় কোন বিশেষ বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে জীবন উৎসর্গ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আশ্রমে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষাও অন্যান্য দেশের ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ে গৃহস্থ বালকগণও আশ্রমের নিয়ম পালনক রিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিবেন। এইরূপ কোন আশ্রম স্থাপন করিতে গেলে কিঞ্চিদার্থের প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠানে হিন্দু-মাত্রেই যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যে বহুতর সদনুষ্ঠানে সাধারণের সাহায্যভাবে স্থায়ী হয় না, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু ইহাও জানি যে উদ্যোগকর্ত্তাদিগের উৎসাহ যত্ন ও অধ্যবসায় খড়ের আগুণের ন্যায় প্রথমে দব করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই পরক্ষণেই নিবিয়া যায়। তেতুলকাঠের আগুণের ন্যায় স্থির অধ্যবসায় যেখানে হইয়াছে, সেখানেই সুফল দেখা গিয়াছে। লাহোরের দয়ানন্দ কলেজ হরিদ্বারের গুরুকুল উদাহরণ স্থল। উদ্যোগকর্ত্তারা—কেহই ধনবান্ নহেন, অথচ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তাহারা যথেস্ট কার্য্য করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

সম্পাদক।

বঙ্গবাসী।

(লেখক—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন।)

করুণাময় ভগবান্ যখন ধর্ম্মের অভাব হয় তখনই তিনি নিজের শক্তিদানে কোন এক মহাত্মাকে এ সংসারে পাঠাইয়া দেন। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গত মহাত্মা যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যদি ভারতে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্র সমুদায় লোপ হইয়া যাইত। তিনি কত নির্ভুল অথচ স্বল্পমূল্যে অদৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদায় মুদ্রিত করাইয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষু দান করিয়াছেন।

আমরা প্রতিদিন বৃথা কথায় দুর্লভ মনুষ্যজন্ম অতিবাহিত করিয়া থাকি। অধুনাতন পাঠকগণ বৃথা উপন্যাস পাঠ করিয়া জীবনক্ষয় করিয়া থাকেন—

আয়ুর্হরতি বৈপুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চযন্নসৌ।
তস্যর্ত্তেযৎ ক্ষণোনীত উত্তমঃ শ্লোকবার্ত্তয়া॥
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোপরে॥
শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ॥
বিলেবতোরুক্রম বিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটেনরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ।

শ্রীভাগবতে ২। ৩। ১৭-২০।

অর্থাৎ হে সূত! সূর্য্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্ত হইয়া আমাদিগের আয়ুঃ বৃথা হরণ করিতেছেন, কেবল যিনি শ্রীকৃষ্ণের কথায় কালযাপন করেন তাঁহারই আয়ু বৃথা নষ্ট হয় না। ১৭

তরুগণ কি জীবিত থাকে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে না? গ্রাম্যপশুগণ কি ভোজন করে না কিম্বা স্ত্রীসঙ্গ করে না? ১৮

শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথে কখনও প্রবেশ করে না তাহারা কুক্কুর শূকর, উষ্ট্র এবং গর্দ্দভতুল্য [নিতান্ত অবজ্ঞাস্পদ বলিয়া কুক্কুর, অমেধ্য দ্রব্য ভোজনজন্য শূকর, কণ্টকের ন্যায় দুঃখপ্রদ বিষয়ে রত বলিয়া উষ্ট্র এবং পরের জন্য ভারবহন করে ও নিজের স্ত্রী দ্বারা পদতাড়িত হয় বলিয়া গর্দ্দভ] এইসকল পশুর এক একটি গুণ আছে কিন্তু ঐ মনুষ্য পশুর একাধারে এই সমুদায় পশুর গুণ বর্ত্তমান। তজ্জন্য এই মনুষ্য পশু তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারাও ইহার স্তব করিয়া থাকে। ১৯

যে মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে তাহার দুইটি কর্ণবিবর বৃথা ছিদ্রমাত্র, এবং যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা না গান করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেকজিহ্বার ন্যায়।। ২০

ইহাকে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সে শ্রবণ
তার জন্ম হইল অকারণে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

এইজন্য বসুজ মহাশয় অন্যান্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারীর ন্যায় তাঁহার লাভের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বৃথা উপন্যাস পুস্তক মুদ্রিত না করাইয়া কেবল ধর্ম্মগ্রন্থসকল মুদ্রিত করাইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পিতৃভক্ত পুত্র বরদা বাবু ও তাঁহার পিতৃদেবের পথানুসরণ করিতেছেন। যদিও আমার দ্বাদশ আলমারি সংস্কৃত পুস্তক বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে ক্রয় করিয়াছি ও যদিও বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তক ৩।৪ খান আছে মাত্র কিন্তু সাধারণ সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিতগণ বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকসকল ক্রয় করিয়াত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন তাহাতেও ত আমি আনন্দভোগ করিতেছি। বঙ্গবাসী, মহাপুরাণ ও কতকগুলি উপপুরাণ মুদ্রিত করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণও "দণ্ডীপর্ব্ব" ও "জৈমিনী ভারত" মুদ্রিত করেন নাই এই দুইখানির সংস্কৃত ভাগ দেখিতে ইচ্ছা কিন্তু বরদা বাবু ভিন্ন কাহাকে অনুরোধ করিব? কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম?" যদিও বঙ্গবাসীতে খানকয়েক উপন্যাস মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের তুলনায় সামান্য মাত্র। দর্শন, স্মৃতির পাঠের পর একটু আনন্দও ত আবশ্যক। যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তকগুলি হাস্যজনক, অসুখের সময় যখন কিছুই ভাল লাগিত না, তখন তাঁহার পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া একাই হাস্য করিয়াছি। পত্নীর কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতিতে এক আলমারি পুস্তক আছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম বাবুর পুস্তক আছে বটে কিন্তু তাঁহার কোন পুস্তক পাঠ করি নাই পাঠে প্রবৃত্তিও নাই এবং শেষ করিতে ধৈর্য্যও থাকে না; বিশেষতঃ বঙ্কিম বাবু "কৃষ্ণচরিত্রে" অনেকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা কহিয়াছেন। একদিন আমার বেদ, দর্শন উপনিষদাদির দ্রাবিড় দেশবাসী আচার্য্য প্রভুর নিকট পাঠ লইতে গিয়াছিলাম একখানি "কৃষ্ণচরিত্র" পড়িয়াছিল। আচার্য্য প্রভু কহিলেন "দেখত কি পুস্তক রহিয়াছে?" কহিলাম "কৃষ্ণচরিত্র" তিনি কহিলেন 'পড়ত?' যেমন খুলিলাম পাঠ আরম্ভ করিলাম সেইস্থানে লেখা ছিল "অনুগীতা" প্রক্ষিপ্ত। তিনি কহিলেন "রাখিয়া দাও"। আমার তখন ঐ পর্য্যন্ত পাঠ হইল। বঙ্কিম বাবু "অনুগীতা" প্রক্ষিপ্ত কহিয়াছেন কারণ

তিনি 'পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায়ে' তাহার উল্লেখ পান নাই; কিন্তু আমার নিকট দুইখানি মহাভারত আছে, একটি বোম্বাই মুদ্রিত, অন্যটি "বঙ্গবাসী" মুদ্রিত উভয় পুস্তকে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে অনুগীতার উল্লেখ আছে; তদ্ভিন্ন যিনি বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দেখিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে "তথা স্মরণমনুগীতাসু ভগবতো ব্যাসস্য" ১।৪।১০ তাহা হইলে ভগবান্ যোগী শঙ্করাচার্য্যের কথা মানিব? না, একজন নভেল লেখকের কথা মানিব? তদ্ভিন্ন ভক্তজনের অশ্রাব্য অনেক কথা লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক কিনা, তজ্জন্য বঙ্কিম বাবু "কৃষ্ণের" পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ দিতেও ঘৃণাবোধ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' দেওয়া কর্ত্তব্য—

"কিন্তু স্বীকৃতমায়ো বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তিস্তাদৃশ্যাপি শ্রিয়াযুজ্যতে।" পরে "নিত্য-শ্রীকঃ সঃ।"

বেদান্তদর্শনে ৩।৩।৪০ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত গোবিন্দ ভাষ্যে।

যেরূপ তিনি নিত্য শ্রীযুক্ত, সেইরূপ তাঁহার লীলাও নিত্য—

যথা প্রকট লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথাতে নিত্যলীলায়াং সান্তবৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতিবনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর বিঘাতনম্॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৫২ অধ্যায়ে কলিকাতামুদ্রিত ও ৮৩ অধ্যায়ে পুনা আনন্দাশ্রম মুদ্রিত।

এই নিত্যলীলাকে লোপ করিয়া তিনি 'গল্প' বলিতেও ভীত হন নাই! ধন্য নভেল লেখার সাহস! নভেল লিখিয়াছেন তাহাই ভাল; এ লীলাতে হস্তক্ষেপ কেন? এ পাণ্ডিত্য তাঁহার মনে মনেই রাখা উচিত ছিল। ভক্তজন-মাত্রেই এ লীলা অন্তশ্চক্ষে দর্শন করেন; এক্ষণও কত সহস্র লোক বৎসরে তাঁহার লীলাদর্শন করিতে যান। বাল্যকালে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ্যপাঠে পড়িয়াছি—

"নিশীথ সময়ে, আজি বৃন্দাবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি।
কালিন্দীর কূলে, দাঁড়ায়ে সঘনে,
রাধা রাধা বলে বাজান বাঁশি॥"

ভক্তজনেই এ বংশীর স্বর এক্ষণও শ্রবণ করিতে পান; যিনি চিরকাল বৃথা

কথায় নভেল লিখিয়া জীবনযাপন করিলেন ও ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার কর্ণে এ বংশীর ধ্বনি কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? এক্ষনও শ্রীবৃন্দাবনের বন পরিক্রমকালে, লীলা যে নিত্য তাহা একটু মনোযোগ দিয়া দর্শন করিলেই তাহা উপলব্ধি হয় যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন তাহার নাম "ভোজনথালি" তথায় ঢেঁকির গড়ের মত একটি ডোবা আছে, সে প্রস্তরটী অতি মসৃণ, নিকটেই বৃক্ষে "দোনা" ধরিয়া আছে, তবে কালমাহাত্ম্যে 'দোনা' বড় নহে, পাতলা তাহাতে কোন দ্রব্য রাখিয়া আহার করা চলে না। যেস্থানে তিনি বেশবিন্যাস করেন তথায় নোলকফল! এক একটি ডাঁটায় সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি নানারঙ্গের নোলক আছে অন্যস্থানে তাহা জন্মে না কেন? যথায় তিনি নৃত্য করেন সেই "চরণপাহাড়ী"তে নূপুর ফল নূপুরের সাদৃশ্য আকার; পাকিলে বীজে পূর্ণ হয় তাহা নাড়িলে ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়। এইরূপ লীলা দর্শন করিয়া ভক্তমাত্রেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এই সমুদয় লীলা দর্শন করিলে যে চক্ষে জল না আইসে ও গাত্রে রোমদ্গম না হয়, সে হৃদয় পাষাণ—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈ র্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদাবিকারো
নেত্রেজলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

শ্রীভাগবতে ২। ৩। ২৪

লীলাদর্শন ভগবৎ স্মৃতি।

বঙ্কিম বাবু শ্রীরাধারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই কারণ শ্রীভাগবতে তাঁহার নাম নাই। শ্রীভাগবতে কেন শ্রীরাধার নাম নাই তাহা সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ কহিয়াছেন। সনাতন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ রাধার লীলা মানসচক্ষে দর্শন করিয়া কখনও হাস্য করিতেন কখনও রোদন করিতেন। যাঁহাকে মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা অবিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। তিনি কহিয়াছেন—

গোপীনাং বিততাদ্ভুত স্ফুটতর প্রেমানলার্চ্চিশ্ছটা
দগ্ধানাংকিল নামকীর্ত্তন কৃতাৎতাসাং বিশেষাৎস্মৃতেঃ।
তৎতীক্ষ্ণজ্বলনোচ্ছিখাগ্র কনিকাস্পর্শেন সদ্যোমহা
বৈকল্যং অভজন্ কদাপি ন মুখে নামানি কর্ত্তুং প্রভুঃ॥

শ্রীভাগবতামৃতে ১। ৭। ১৫৬

অর্থাৎ আমার গুরুদেব কৃষ্ণরসে নিমগ্ন হইয়া কৃষ্ণের এবং তাঁহার প্রিয়তমা রুক্মিণ্যাদির নামসকল সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; কিন্তু অতি বিস্তৃত, অদ্ভুত, প্রকাশ্য প্রেমানল শিখার তাপে দগ্ধীকৃত গোপীগণের নাম কীর্ত্তন করিলে, তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাবশতঃ তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ অনলোৎক্ষিপ্ত শিখাগ্র কণিকার স্পর্শে মহবৈকল্য উদয় হয় বলিয়া, তিনি কখনও তাহাদিগের নাম মুখে আনিতে পারেন নাই।

রাসাধ্যায়ে শুকদেব কোন গোপীর নাম করিতে পারেন নাই, তিনি "কোন গোপী" "কোন গোপী" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—

"কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জ্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দন ভূষিতম্॥
কাচিদঞ্জলিনা গৃহ্নাৎ তন্বী তাম্বুল চর্ব্বিতম্।
একাতদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তাস্তনয়োরধাৎ॥
* * * *

শ্রীভাগবতে ১০। ৩২ ৪-৫

গোপাঙ্গনাগণের লীলা বর্ণনা করিতে করিতে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়াতে শুকদেবের দেহে কখন খেদ, কখন কম্প কখন পুলক, কখন গদ্‌গদ বাক্য, কখন অশ্রুতে পূর্ণ হইতেছিলেন, তিনি অতি কষ্টে গোপাঙ্গনাগণের লীলা বর্ণন করিয়াছিলেন, কিন্তু নাম উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন নাই। আমাদের শ্রীরাধা আর কেহই নহেন, তিনি গোপাঙ্গনাগণের শিরোমণি—

"মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণকান্তা শীরোমণি॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে

গোপাঙ্গনাগণের প্রেম অপ্রাকৃত; যাঁহারা কামের দাস তাঁহারা যেন এ চর্চ্চা না করেন—

ইদং বৃন্দাবনং নাম রহস্যং সমবৈগৃহম্।
ন প্রকাশ্যং কদা কুত্র নবক্তবং ন সৌকচিৎ॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৭২। ৪৮ (পুনা মুদ্রিত)

শ্রীবৃন্দাবনে গোপীলীলায় কামের গন্ধ নাই সে লীলায় প্রেম মাত্র। কাম ও প্রেমে তারতম্য যথা

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরাসলীলা রহস্য।

(লেখক—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।)

ভগবান্ লীলাময়। লীলাময় তিনি, তাঁর লীলার অন্ত বুঝা তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যাতীত। কত যুগে কত লীলা করিয়া ভগবান্ তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহার ইয়ত্তা নাই। রাসলীলা ভগবানের এক অভূতপূর্ব্ব লীলা। ইন্দ্রকে অহল্যার সতীত্ব নাশে প্রণোদিত করিয়া মোহিনীমূর্ত্তিতে মহাযোগী মহাদেবের মহাধ্যান ভঙ্গ করিয়া কন্দর্পের বড় অহঙ্কার বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছিল, ভগবান্ তাই শত শত পীনোন্নত পয়োধরা, স্থূল নিতম্বিনী, মনোমোহিনী গোপললনাগনকে লইয়া নীরব রজনীতে রাস ক্রীড়া করিয়া কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন।

ভগবান্কে যে যে ভাবেই চায় সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পাইয়া থাকে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ আমাকে যে যে ভাবেই ভজনা করে আমি সেই ভাবেই তাহাকে ভজনা করি। যশোদা তাঁহাকে পুত্ররূপে ভজনা করিয়াছিলেন তিনি পুত্ররূপেই তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন—অর্জ্জুন সখা বলিয়া তাঁহার ভজনা করিয়াছিলেন তিনি সেই ভাবেই তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন আর ব্রজনারিগণ তাঁহাকে কান্ত বলিয়া ভজনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই ভাবেই তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। ভগবান্ জগতের স্বামী তাঁহাকে স্বামী ভাবে পতি বলিয়া পূজা করিলে কি কোন অপরাধ হয়? তিনি জগতপতি তাঁহাকে পাইলে লৌকিক পতির আর কি আকর্ষণ থাকে? ব্রজের কামিনীগণ এই জগতপতির সন্ধান পাইয়াছিলেন, কাজেই লৌকিক পতি দিয়া তাহারা আর কি করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ভগবানের এই রাসলীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ইহাকে একটা বীভৎস লাম্পট্যের অভিনয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সত্য কি তাই?

শ্রীশ্রীস্বামীপাদ বলেন যে, ভগবান্ স্বীয় কামজয়ী শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তই রাসক্রীড়ার বিড়ম্বনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ এই রাস পঞ্চাধ্যায়ে শৃঙ্গাররসের বর্ণনাছলে নিবৃত্তিমার্গের বিষয়ই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরানাদির মতে শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সে এই রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। আষোড়শাচ্চ কৈশোরং। যৌবনং স্যাত্ততঃ

পরম্' এই বচনানুসারে একাদশ হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বয়সই কৈশোর কাল। চক্রবর্ত্তী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম বৎসর বয়সে কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করাইয়া শুক্ল প্রতিপদে গোবর্দ্ধন মহোৎসব করেন এবং দ্বিতীয়াতে যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব করিয়া পরে ইন্দ্রের কোপ হইতে গোকুলরক্ষার নিমিত্ত তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। দশমী তিথিতে গোপগণ বিস্মিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথোপকথন করেন, পরে একাদশীতে গোবিন্দের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হয়। দ্বাদশীতে বরুণের নিকট হইতে শ্রীনন্দের মোচন করিয়া পৌর্ণমাসীতে ভগবান্ গোপগণকে ব্রহ্মলোক প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ বৎসরের শরৎকাল সমাপ্ত হইল, পরে অষ্টমবর্ষের আশ্বিনী পূর্ণিমায় রাসোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কিশোরবয়স অষ্টমবর্ষ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এরূপ কৈশোর বয়সে কাহারও হৃদয়ে কামানল প্রজ্জলিত হইতে পারে কিনা এবং কামোদ্রেক হইলেও তাহার স্ত্রী সম্ভোগের কোন ক্ষমতা জন্মে কিনা তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া জলসমীপে বালুকাময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহা যোগিন্য ধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।

বলিয়া কাত্যায়নীর পাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কথা হইতেছে যদি গোপকুমারীগণের লৌকিকভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার বাসনা হইত তাহা হইলে কি তাহারা একত্রে এরূপ দলবদ্ধ হইয়া নদীর জলে স্নান করিয়া কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থনা করিত? রমণীর স্বভাব এই যে সে যে পুরুষকে ভালবাসে সে কি প্রাণ থাকিতে তাহা অন্য রমণীর নিকট প্রকাশ করে?

বস্ত্রহরণকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্
ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যোভবিতুমর্হতি।

অর্থাৎ সাধ্বীগণ। আমাকে পতিভাবে অর্চ্চনা করাই যে তোমাদের

সঙ্কল্প তাহা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ না করিলেও আমি অবগত হইয়াছি। অতএব নিশ্চয়ই তোমাদের কামনা সফল হইবে।

গোপীরা উলঙ্গ হইয়া ভগবানের নিকট হইতে বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, যতক্ষণ তাহারা স্ত্রী জননেন্দ্রিকের উপর হইতে হাত না তুলিয়াছিল ততক্ষণ তিনি তাহাদিগকে বস্ত্র দেন নাই, ইহা হইতে ভগবান এই শিক্ষা দিলেন যতক্ষণ মানুষের বিন্দুমাত্র লজ্জা থাকে— যতক্ষণ এই আমার দেহ দেহাত্মবোধ না যায় ততক্ষণ তিনি কাহারও প্রতি সদয় হন না। গোপকুমারীগণ সর্ব্ব-কামনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্যই ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন। করুণানিদান ভগবান্ তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সেইস্থানে আগমন করিলেন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি অর্পণপূর্ব্বক তন্ময় ভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তিনি দেখিলেন ব্রজকুমারীগণ ঐকান্তিকভাবে তাঁহাকে ভজনা করিলেও তাঁহারা ভগবদ্লাভে অন্তরায়স্বরূপ লজ্জাদি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই অন্তরায় দূর করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট প্রদানের নিমিত্তই ভগবানের এই লীলা।

যাতাবলা। ব্রজং সিদ্ধাঃ, ময়েমারংস্থথক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুচার্য্যর্চ্চনং সতীঃ॥

অবলাগণ। দেবারাধনা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। তোমরা আমাকে পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনারূপ ব্রত আচরণ করিয়া সিদ্ধা হইয়াছ। এক্ষণে ব্রজে গমন কর। আগমিনী শারদীয়া রজনীসমূহে তোমরা আমার সহিত বিহার করিতে পাইবে।"

ভগবান্ বেদব্যাসের তপস্যালব্ধ পুত্র, আজীবন বৈরাগ্যাবলম্বী, স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞান বিরহিত শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের সভামধ্যে যে লীলাবর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই কামময় বা অশ্লীল হইতে পারে না।

দৃষ্টা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌকলং বামদৃশাং মনোহরম্

ভগবান্ দেখিলেন কুমুদবিকাশশীল নিশানাথ ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ হইয়া গগনমণ্ডলে উদিত হইয়াছেন, লক্ষ্মীদেবীর বদনপ্রভার ন্যায় তাঁহার প্রভা প্রকাশ পাইতেছে এবং তদীয় কোমল কিরণে বনস্থলী সুরঞ্জিত হইয়াছে।

তখন তিনি ক্রীড়ার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া স্বীয় বেণুদ্বারা কুটিল নয়না ব্রজবিলাসিনীদিগের মনোহর কল অর্থাৎ মধুর অস্ফুট ধ্বনি গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ মনোহর অর্থাৎ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে চন্দ্র সেই চন্দ্রকে হরণ করিয়া ক্লীং এই কামবীজ গান করিয়াছিলেন। মধুর রসের অনধিকারী অপর কেহই সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পায় নাই। কিন্তু ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট ছিল। তাহাতে চিত্ত আবিষ্ট না থাকিলে কি সেই সঙ্গীত শুনা যায়? তাঁহার বংশীর রব ত চিরদিন ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু তাহা আমাদের কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে কৈ? গোপীগণ তাঁহাতে নিবদ্ধমনা ছিলেন অহোরহঃ সেই মুরলীর কলকণ্ঠধ্বনি শুনিবার জন্য উৎকর্ণা হইয়া থাকিতেন তাই যেই শ্রীকৃষ্ণ বেণুগীত আরম্ভ করিলেন অমনি গোপীরা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন। কেন আসিবেন না? তিনি যে তাহাদের কান্ত। ক—সুখ, অন্ত—পর্য্যাপ্তি—যাহাতে যাবতীয় সুখের পর্য্যাপ্তি রহিয়াছে, তিনিই কান্ত, সুখের পর্য্যাপ্তি প্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন সুখের অন্ত আর কোথায় হইতে পারে?

দুহ্যন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ।

বেণুরব শ্রবণমাত্রে গোপাঙ্গনাগণ আবেগবশতঃ আপন আপন কর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম, দৈহিক ব্যাপার এমন কি স্ব স্ব দেহকেও উপেক্ষা করিয়া বেণুগীতাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। কোন কোন ব্রজদেবী দোহন করাইতেছিলেন, গীত শ্রবণমাত্রে তাঁহারা দোহন পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুৎসুকচিত্তে গমন করিলেন কেহ বা স্থালীস্থ দুগ্ধ চুল্লীতে স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা উৎলানর প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না, কেহ বা গোধূম কনায় রন্ধন করিতেছিলেন, পক্ক অন্ন না নামাইয়াই চলিলেন—কেহই ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিতে পারিলেন না। গমনকালে কোন কোন গোপী পরিধেয় বসনকে উত্তরীয় করিয়া উত্তরীয়বসন পরিধান করিয়াছিলেন, পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে আগ্রহসহকারে বারংবার নিবারণ করিলেও তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না; কারণ নিখিল ইন্দ্রিয়-গ্রাহী শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের চিত্ত আকর্ষণকরতঃ তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন।

ভগবানের প্রতি যাঁহাদের মন প্রাণ প্রধাবিত হইয়াছে জগতের কোন বাধা কোন বিপত্তি কি তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে ?

(ক্রমশঃ)

অদ্বৈত বেদান্ত বিজ্ঞান ও সাধনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার পি.এইচ্.ডি,)

সমানাধিকরণ বৃত্তিত্ব কোন না কোন সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পদার্থের অস্তিত্ব সূচনা করে, কিন্তু ইহা নিরুপাধিক সত্তার বিরোধী ; কারণ, একই অধিকরণে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অবস্থিতি সম্ভব হইলে প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিবে। কতকগুলি স্বতন্ত্র অথবা স্বরূপতঃ অভিন্ন পদার্থ একই মহান্ সত্তার মধ্যে লয় পাইবে ; স্বরূপতঃ অভিন্নত্বই তাহাদের অস্তিত্বের একত্বের জ্ঞাপক, এবং অভিন্নত্ব ও স্বাতন্ত্র্য পরস্পর বিরোধাত্মক। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য ভিন্নত্বেরই জ্ঞাপক, এবং যখন সমস্ত ভেদই অস্বীকৃত হইতেছে, তখন সত্তা অভিন্ন অথবা বহু এরূপ কল্পনা ন্যায়বিরোধী।

সত্তা—সম্বন্ধ পদার্থের সমষ্টি নহে

কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সম্বন্ধ কতকগুলি বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়কেও আমরা পারমার্থিক ও নিত্য সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পদার্থগুলি এরূপভাবে সন্নিবেশিত হইলে উহাদের কোনটিকেই নিরুপাধিক বলা যাইবে না, কারণ প্রত্যেকেই সম্বন্ধবিশিষ্ট ; অথবা বিভিন্ন প্রণালীতে সন্নিবেশিত কতকগুলি ভাব পদার্থের সমন্বয় পুষ্পমাল্যের মত কোন এক পদার্থই সত্তা, ইহাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ এরূপ ভাবপদার্থ সত্যই কতকগুলি সম্বন্ধ পদার্থ লইয়া গঠিত। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সত্তা এক অখণ্ড, সর্ব্বধর্ম্ম ও সম্বন্ধশূন্য।

নিরুপাধি সত্তা কতকগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি মাত্র ইহাও বলিতে পারি না, কারণ এইরূপ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন পদার্থকে কোন এক শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে সন্নিবেশিত করিতে পারা যায় না। অথচ

ইহারা প্রত্যেকেই এক একটী নিরুপাধি সত্বা ইহাও বলিতে পারি না। কারণ নিরুপাধিক সত্বা এবং বহুত্ব সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক এবং অসঙ্গত। কতকগুলি নিরুপাধি সত্বা হয় একটী সঙ্ঘবদ্ধ হইবে বা হইবে না। যদি তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র হয় তবে তাহারা কোন সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে না। যদি তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ না হয় তবে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জগত রচনা করে এরূপ কল্পনা করিতে পারি না। এরূপভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে শৃঙ্খলাসম্বলিত বহু সত্বা নিরুপাধিক (absolute) বা স্বাতন্ত্র সত্বা হইতে পারে না নিরুপাধি সত্বা সর্ব্বব্যাপি বলিয়া এবং কতকগুলি এইরূপ নিরুপাধিক সত্বার একাধিকরণ যুক্তিহ চিন্তা জগতে বিরোধ ও অসঙ্গতি আনয়ণ করে বলিয়া এইরূপ বহু নিরুপাধিক স্বত্বার অস্তিত্ব্য ন্যায়মূলক নিস্তরে বিষয় নহে।

সত্বা বিকাশীল গতি নহে। আমরা সত্বাকে নিত্য আত্ম বিকাশে পুর্ণ একটী পদার্থরূপে কল্পনা করিতে পারি না, কারণ নিত্য পদার্থ নিরুপাধিক পূর্ণত্ব কিন্তু বিকাশ পূর্ণত্বের পরিচায়ক নহে ইহা পূর্ণত্বপ্রাপ্তির একটা চেষ্টা একটা ধারা কিন্তু ইহা স্বরূপত পূর্ণ বা অখণ্ড সত্বা নহে। একটা গতির ধারার ভেতর আমরা সদসতের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাই যে ফুট্‌ছে সেত পূর্ণ নয় এবং সম্পূর্ণ শূন্যও নয়, অতএব ইহা পূর্ণ অপূর্ণের মিলন কিন্তু অখণ্ড পূর্ণ নহে। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে সমস্ত অস্তিত্বের সমষ্টিই অনন্ত পূর্ণত্বের অভিব্যপ্তি; সত্বা এই অনন্ত বিকাশের ধারার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে দেখ। সত্বা শক্তিহীনও নহে শক্তিযুক্ত। কিন্তু পক্ষান্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে অখণ্ড সত্বাকে আমরা শুদ্ধ এবং পূর্ণ ভিন্ন কল্পনা করিতে পারি না যে ধারা নিয়তই আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার ভিতর আমরা পূর্ণত্বের এবং অখণ্ডত্বের পরিচয় পাই না। দেশ কাল এবং কার্য্যকারণের ভিতর দিয়া সমস্ত ধারাই আত্মপ্রকাশ করি কিন্তু এরূপ দেশ, কাল এবং কার্য্যকারণে সীমাবদ্ধ ধারা পূর্ণত্বের আসন কখনই পাইতে পারে না। ইহা এখানে দেখা আবশ্যক যে একটা বিকাশের ধারা কোন একটী অন্তর বা বাহিরের অদৃষ্টের দ্বারা পরিচালিত। যদি আমরা মনে করি একটী বাহিরের অদৃষ্টের দ্বারা এই ধারাটী পরিচালিত হইতেছে তাহা হইলে এই ধারাটী একটী সম্পূর্ণ প্রবাহ হইবে পক্ষান্তরে যদি ইহাই কল্পনা করি যে কোন আভ্যন্তরিক অদৃষ্টের নিয়ম বশে এই ধারা আত্মবিকাশ করিতেছে তাহা হইলে ইহা কি অসঙ্গত কল্পনা হইবে না যে অখণ্ড সত্বা

কতকগুলি ক্রমবিকাশশীল মূর্ত্ত পদার্থের কার্য্য ক্রমের ধারাকে অবলম্বন করিয়া আপনার চরিতার্থ ও সকলতালাভ করিবে। আবার এই ক্রমবিকাশের একটা নিয়তি বা আদর্শ আছে কিন্তু এই আদর্শ বা উদ্দেশ্য এর অস্তিত্ব বাস্তব জগতে কোথায়ও নাই। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে এইরূপ প্রস্ফুটিমুখ আদর্শটী সত্তারূপে জগতের মূল কারণে নিহিত আছে। এইরূপ একটা অদৃষ্ট এই জগৎ ধারার পিছনে থাকিলেও এই ধারা যে পর্য্যন্ত না পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতেছে সেই পর্য্যন্ত ইহাকে আমরা এক অখণ্ড পূর্ণসত্তা বলিতে পারি না পরিণতি বলিলে কোন একটী মুলসত্তার নাম ও রূপের প্রকাশ অথবা বিকাশ বুঝায় কিন্তু অভিব্যক্তা ও সত্তা ত একই পদার্থ নহে যে পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধি অথবা পরিণতি আছে তাহার অপূর্ণতাও আছে সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিবার জন্যই উহা অন্য প্রেরণাদ্বারা পরিচালিত হইতেছে কিন্তু উহা পূর্ণতার স্বরূপ নহে। অতি সরলভাবে বলিতে গেলে ইহা বলা যাইতে পারা যায় যে পূর্ণতা স্বরূপত গত্যাত্মক কার্য্য ক্রমের সহিত এক হইতে পারে না ইহা কুটস্থ সত্তার সহিত একটা প্রশান্তস্থিতির সহিত এক।

(বিবেক চূড়ামনি প্রশান্তমাত্তন্তবিহীনক্রিয়ম্)

মনুস্মৃতি।

১ম প্রবন্ধ।

(লেখক—সম্পাদক)

প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে মনুস্মৃতির স্থান এতই উচ্চ যে যদি কোন স্মৃতি মনুর স্মৃতির বিরুদ্ধ হয়, তাহা আদৌ গ্রাহ্য নয়।

"মনু কে" এবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মনুস্মৃতির মধ্যে মনুর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে যে ব্রহ্মা নিজ দেহ দুই খণ্ড করিয়াছিলেন উহার একখণ্ড পুরুষ এবং অপর খণ্ড স্ত্রী হইয়াছিল এবং ঐ পুরুষের এবং ঐ স্ত্রীর গর্ভে এক বিরাট পুরুষের জন্ম হয় এবং সেই বিরাটপুরুষ তপস্যাদ্বারা মনুকে সৃষ্টি করেন। তাহার পর মনু তপস্যাদ্বারা দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন "মনুর্ণাম কশ্চিতপুরুষ বিশেষোহনেক

বেদশাখাধ্যয়ন বিজ্ঞানানুষ্ঠানসম্পন্ন স্মৃতি পরম্পরা প্রসিদ্ধ” অর্থাৎ মনুস্মৃতি পরম্পরা প্রসিদ্ধ কোন পুরুষ বিশেষ এবং তিনি বেদের বহুশাখার অধ্যয়ন, বিজ্ঞান ও অনুষ্ঠানসম্পন্ন ছিলেন।

মনুর অন্যতম টীকাকার গোবিন্দরাজও বলেন “মনুর্ণাম মহর্ষিবিশেষ বেদার্থ-জ্ঞানেন প্রাপ্তমনুসঙ্গ আগম পরম্পরয়াসকল বিদ্বজ্জনকর্ণগোচরীভূতঃ স্বর্গস্থিতি প্রলয়কারণেধিকৃতঃ অর্থাৎ মনু একজন মহর্ষি যিনি সমগ্র বেদার্থ জ্ঞানহেতু স্বীয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যিনি আগম পরাম্পরয়াসকল বিদ্বজ্জনের কর্ণগোচরীভূত হইয়াছিলেন এবং যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিবার অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুর অপর টীকাকার কল্লুক ভট্ট বলেন “সকল বেদার্থাদিমননাৎ মনুঃ ইত্যাদি” অর্থাৎ সকল বেদের অর্থ মনন করিয়াছিলেন বলিয়াই মনু। মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ের ১২৩ শ্লোকে মনুকে শাশ্বত ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রানমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে কেহ কেহ অর্থাৎ যাজ্ঞিকেরা অগ্নিরূপে উপাসনা করেন, অন্যে শ্রেষ্ঠরূপে প্রজাপতি মনুকে উপাসনা করেন, কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যাধাররূপে ইন্দ্রকে উপাসনা করেন, অপর কেহ সর্ব্বপ্রাণের আধার প্রাণকে উপাসনা করেন, অপর কেহ আনন্দরূপে শাশ্বত ব্রহ্মকে উপাসনা করেন।

মনুর সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

গ্রন্থপ্রারম্ভে দেখা যায় যে মনু একাগ্র হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া ন্যায়ানুগত প্রণালীতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে হে ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সকলবর্ণের ধর্ম্ম বলুন। তৎপর মনু ঋষিদিগের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন।

মনুস্মৃতিতে বারটি অধ্যায় আছে ইহার মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের ১।২।৩ শ্লোকে ও দ্বাদশ অধ্যায়ের ১ ও ২ শ্লোকে মহর্ষি ভৃগুর নাম পাওয়া যায়। মনুর দশ পুত্র-দশ প্রজাপতি যথা মরীচি, অত্রি অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে দেখা যায় মহর্ষিগণ স্নাতক ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অনলপ্রভা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী বিপ্রদিগের

মৃত্যু হয় কেন, তদুত্তরে মনুপুত্র ভৃগু বলিলেন যে কি দোষে বিপ্রগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা শ্রবণ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ১ম ও ২য় শ্লোকে ঐরূপ মহর্ষিগণ কর্ম্মের শুভাশুভ ফলসম্বন্ধে প্রশ্ন করায় মনুপুত্র ভৃগু তাহার উত্তর দিলেন এই দুইস্থান দেখিলে মনু স্মৃতি যে ভৃগু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয়, অথচ প্রথমাধ্যায়ে মনু স্বয়ংই বক্তা। ভৃগু সম্বন্ধেও একটু কথা রহিল। ভৃগুকে একবার অনলপুত্র বলা হইতেছে আর একবার মনুপুত্র বলা হইতেছে। কুল্লুকভট্ট বলেন যে কল্পভেদে ভৃগুকে অগ্নির পুত্র বলা হইয়াছে কল্পভেদেনাগ্নিপ্রভবত্বমুচ্যতে। তিনি উহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতিও দিয়াছেন তস্য যদ্রেতসঃ প্রথমং দেদীপ্যতে তদসাবাদিত্যোঽভবৎ যৎদ্বিতীয়মাসীৎ ভৃগুরিতি। অতএব স্রষ্টাদ্রেত উৎপন্নত্বাৎ ভৃগুঃ সপ্তম অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে মনু যে বিনয়দ্বারা রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১২শ অধ্যায়ের ১২৩ শ্লোকে মনুকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(লেখক—কবিরত্ন শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যত্রযোগেশ্বরঃ কৃষ্ণোঽত্র পার্থ ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। যত্র (যেষাং পক্ষে) যোগেশ্বরঃ (যোগানাং ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বর্ত্ততে) যত্র চ পার্থঃ (অর্জ্জুনঃ) ধনুর্দ্ধরঃ (গাণ্ডীবধন্বা) তত্র শ্রী (রাজলক্ষ্মী) (তত্র) বিজয়ঃ (জয়লাভ) (তত্র) ভূতি (উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি) ধ্রুবা নীতি (সুনিশ্চিতা নীতি অব্যভিচারী ন্যায়) ইতি (এবং) মম মতি (নিশ্চয়ঃ) ৭৭

বঙ্গানুবাদ। হে রাজন যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যে পক্ষে গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন রহিয়াছেন; রাজশ্রী জয় এবং অভ্যুদয় ন্যায় সেই পক্ষকে আশ্রয় করিবে ইহা আমার নিশ্চয় মত। ৭৮

আলোচনা।— গীতা উপসংহারে সর্ব্বশেষে সঞ্জয় আপনার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে কি করিলেন? তাঁহার জিজ্ঞাসার ভাবে বোধ হইয়াছিল কাহার জয় পরাজয় হইল। কৌরবেরা যুদ্ধজয়ী হয় কিনা তাহাই জিজ্ঞাস্য। তাহাই বুঝিয়া সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, ভুবনবিজয়ী গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন যে পক্ষে আছেন রাজলক্ষ্মী বিজয় অভ্যুদয় সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবে ইহাই আমার মত নিশ্চয় জানিবে। তোমার পুত্রগণ কদাচ জয়লাভে সমর্থ হইবে না। অতএব যুদ্ধে জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দই তোমার মঙ্গল। ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে মোক্ষ
সন্ন্যাস যোগো নাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ
ওঁ ইতি ওঁ
ওঁ তৎসৎ ওঁ

সংবাদ ও মন্তব্য।

পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ। মিঃ হিপোলাইট মার্টিনেট একজন মার্কিন ভ্রমণকারী। তিনি পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, এবং তিনি বাসনামত কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি এখন কলিকাতায়। গত মঙ্গলবার তিনি আসিয়াছেন এবং কিছুদিন এখানে বিশ্রাম করিবেন। তিনি পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করেন ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে। আমেরিকার সিটাল নামক স্থান হইতে তাঁহার এই সৌখীন যাত্রা আরম্ভ হয়। মার্কিন রাজ্য পদব্রজে অতিক্রম করিয়া যাইতে তাঁহার চারিমাস মাত্র সময় লাগিয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, আলবেনিয়া, মিশর ও আরব দেশে ভ্রমণ করিয়া মিঃ মার্টিনেট মেসোপোটেমিয়ার বাগদাদ হইতে বসরায় আসেন। বসরা

হইতে তিনি ষ্টিমারে বোম্বাই আসিয়াছিলেন। গত ২২শে মে মার্টিনেট বোম্বাই হইতে কলিকাতায় রওয়ানা হন। ৪২ দিন পথ হাঁটার পর গত ৫ঠা জুন তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। মিঃ মার্টিনেট সম্বলপুর হইতে বেঙ্গলনাগপুর রেলের ঝাড়সাগুড়া ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি রেলপথ ধরিয়া চলিতেও আরম্ভ করেন। সম্বলপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ১৪৪ মাইল পথ তিনি তিনদিনে আসিয়াছেন। ৪০ মাইল পথ তিনি অনায়াসে হাঁটিতে পারেন। মিঃ মার্টিনেট কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশে যাইবেন। অবশ্য একথা আমাদের কাছে নূতন নয়। হিন্দুর তীর্থযাত্রা ছিল ইহার ছোট সংস্করণ।

লর্ডসিংহের স্বাস্থ্য। সহযোগী সংবাদ পাইয়াছেন যে লর্ড সিংহের অবস্থা ভাল নয়। তিনি অনিদ্রা ও অপরিপাক রোগে ক্লেশ পাইতেছেন। রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্য আবার ভগ্ন হইয়াছে। সেখানে তাঁহার আর ভাল লাগিতেছে না। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি মরিতে হয় ত স্বদেশে স্বজনগণের নিকটেই মরিব। তাই তাঁহাকে শীঘ্রই কলিকাতায় আনয়ন করিতে হইবে। আমরা সংবাদটি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। এদেশে কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসা করাইলে কেমন হয়?

যুবরাজের ভারতপ্রীতি। যুবরাজ প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া বড়লাট বাহাদুরকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছেন যে তিনি তাঁহার প্রথম ভারত পরিদর্শন কখনই ভুলিতে পারিবেন না। পরন্তু বিশেষ আন্তরিক সহানুভূতির সহিত ভারতের মহান্ ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। ভগবান্ যুবরাজের মঙ্গল করুন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টারীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৯ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা।	ভাদ্র।	১৩২৯ সাল। ১৮৪৪ শকাব্দা

মেঘনাদে প্রমীলা। ‡

(লেখক—শ্রী[illegible]নাথ কাব্য পুরাণতীর্থ।)

নিশাচরী খ্যাতা তুমি ভারত মাঝারে
রাবণের পুত্রবধু দানব ঝিয়ারী।
পুরাণে এরূপ(ই) বটে এঁকেছে তোমারে
আমি কিন্তু অয়ি! দেবি! জানি তুমি নারী
আর কিছু নও;-প্রীতি ভক্তি স্নেহ দিয়া
যে হৃদয় গঠিয়াছ, কবির ভাষায়
লভি' পরিচয় মুগ্ধ দীন কবি হিয়া।
ভাবিয়া পাই না তোমা' কি দেয়া যায়।
ভাষাহীন কবি কোথা লিপি কুশলতা?
তবু অর্ঘ্য দেব, থাক্ প্রকাশ দীনতা॥

‡ খিদিরপুর মাইকেল লা[illegible]রির পদক পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা।

"হত বীরবাহু" বাণী শুনি ধাত্রীপাশে
ইন্দ্রজিত কোষে অসি উঠিল রাগিয়া,
চলে বীর 'অরাম'ও 'অবানর' আশে
যুদ্ধে যবে ; স্নেহ আনে আশঙ্কা টানিয়া।
বারেক মানসে তাঁ'য় উঠেছিল জাগি'
রণে রমণের ; হায় ! অশুভ প্রাক্তন
বারেক কাঁপিল বুক বুঝি তার লাগি'
বারিতে পারেনি তাই উদ্যত রোদন।
অমঙ্গল ছায়াপাতে ভরেছিল বুক
তবু সে বারণে তব নাহি ভুল চুক॥
হে নারী চরিত্র তব কুসুম কোমল
এযে পুনঃ হতে পারে কুলিশ কঠোর
কে কবে ভেবেছে ; এই প্রণয় তরল
অকস্মাৎ হবে হেন বীরত্বে বিভোর।
পতিরে বিদায় দিতে দেখিয়াছি আমি
কম্পিত হৃদয় ; তথা উঠিল কি রবে
"রাবণ শ্বশুর মোর মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখি ; ভিখারী রাঘবে
এই হেরি বক্ষঃ তব স্নেহ মন্দাকিনী
সরোষে নির্ঘোষে পুন বিক্ষুব্ধা তটিনী॥
ধন্য কবি মাইকেল আঁকি তব ছবি
ভাব ভাষা রস এই এয়ীর মিলনে
সাহিত্যের সোমরস পূর্ণ যাগ হবি
দিয়াছেন ; পান করি তৃপ্ত গৌড়জনে।
ধন্য ধন্য বঙ্গভাষা লভি' তোমা ধনি ?
রাবণ শ্বশুর ধন্য মেঘনাদ স্বামী।
পাঠ করি ধন্য বঙ্গে পুরুষ রমণী
থাকুক লোকের কথা, আরো ধন্য আমি
পাইয়াছি অবসর তোমার কৃপায়
একটু লভিতে স্থান সাহিত্য সভায়॥

হে মধু! তোমার লেখনীর মধু
প্রমীলা প্রকৃতি মাধুরী মাখা;
কোমলতা গুণে আদর্শ নারী
বীর্য্য সতীর বর্ম্মে ঢাকা।
নহে কুহকিনী রিপু-পরায়ণা
ধর্ম্ম তাহার পতি-আরাধনা
প্রমোদ কাননে বাসব বিজয়ী
নাহি তাতে তার করের লেখা
মিছে মনে করা "আর্ম্মিডা" ছবি
"টসোর" নায়িকা নকল শেখা॥
প্রমীলা চরিত কল্পনা পূত
এযে জাহ্নবী জীবন-ধারা
পতির কারণে শত ব্যাকুলতা
স্বামীর জন্য আপন-হারা।
বিদায়ে যেটুকু প'ল আঁখিজল
রণযাত্রীর শেষ সম্বল
পতি ও পুত্রে দেশের জন্যে
ত্যজিতে নারীর র'লেও সাধ
অশ্রু মুছিবে করে, আর মনে
যাচিবে বিধির আশীর্ব্বাদ॥
লঙ্কা কণক সৌধ চূড়ায়
আবদ্ধ আঁখি দেখার তরে
রক্ষ রাজার বিজয় কেতন
কি ভাবে উড়িছে দেউল'পরে।
অন্য দিবস উড়ে কিনা উড়ে
তার তরে কভু আঁখি নাহি ঘুরে
হে পতাকা আজি তোমার জীবনে
উহার জীবন তুমি কি জানো?
আজিকার দিনে উহার জীবনে
ধ্রুব তারা তুমি ইহা কি মানো?॥

আঁচল উজল পুষ্প বিভায়
কম্পিত কর গাঁথিছে মালা
ফোটা ফোটা রূপে মাঝে মাঝে তার
মুক্তা আঁখির সলিল ঢালা॥
"কুসুমের মালা গাঁথন চিকনি
পরাব কাহারে কহলো সজনি ?"
বাসন্তী পানে রাখিয়া নয়ন
সজল চক্ষে কহিল বালা
"কুঞ্জে কেন এ তিমির পুঞ্জ
কে হরিয়া নিল আমার আলা ?"
সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্যমুখীর
বেদনায় ভরি উঠিল বুক
কহলো ললনে ; এর আগে কভু
বাজেনিত' বুকে উহার দুখ॥
সম ব্যথা-ভারে মগ্ন দু'জন
রজনী দোঁহারি বিষাদ কারণ
রক্তিম রঙে ভাসিয়া তপন
বিদায় নিয়াছে প্রতীচী-কোলে,
গিয়াছে রমণ রণজয় আশে
জয়ী হোয়ে পুনঃ ফিরিব বোলে॥
সহসা থমকি কহিল তরুণী
"বাসন্তী এত লাগে না ভালো ;
কি হ'বে বিফলে হেথায় থাকিয়া
চলো লঙ্কার ভিতরে চলো।
অবিশ্বাসের হাসিলে যে হাসি
দুষ্কর যাহা তাই ভাল বাসি
বাসববিজয়ী সহধর্ম্মিণী
এ কথা কি তুমি ভুলিতে বলো ?
ত্রিলোক বিজেতা শ্বশুর আমার
চলো লঙ্কার ভিতরে চলো॥

"বাসন্তী তুমি কি বলিছ শুনি
দুয়ারে রামের বিরাট সেনা
তুমি জানো না কি শোন বিধুমুখী
আছে তোমা মোর বিপুল সেনা।
পর্ব্বত সম অতি ভীম তনু
নল নীল আছে অঙ্গদ হনু
তারা নিবারিবে আমার গতি কি
শুনি হাসি পায় তোমার কথা
পর্ব্বত ত্যজি বহে যবে নদী
কে নিবারে তার সে ব্যাকুলতা।

ললনা-ললাম বীরেন্দ্র প্রেয়সী !
কঞ্চুকে আবরি অঙ্গ কোমলতা দলি' কোথা চলিলে উলসি ?
বক্ষে তব লৌহ বর্ম্ম চক্ষে জ্বলে কালানল প্রদীপ্ত বদন;
রুদ্রের এ মূর্ত্তি বুঝি মনোভাব ধ্বংশ করি' দহিল মদন।
হে ধনু-ধারিণী ?
কোন কল্প জগতের রঙিণ তুলিকাস্পর্শে অনুক্তকাহিনী
আঁকে গেল কবির লেখনী ॥
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে দোলে ফল উচ্চ কুচ কবচে আবরি
রৌদ্রবেশে হে সুন্দরী
হেমময় কোষে শোভে খরশান অসি আর দীর্ঘ শূল করে
অপূর্ব্ব সমরসাজে এলে তুমি ভৈরবীর ভীমরূপ ধরে।
বাজালে দামামাবাদ্য বামাদল যুদ্ধ আশে মাতিল অন্তরে
নৃমুণ্ডমালিনী সখী নৃমুণ্ডমালিনী যথা সমর ভিতরে।
অয়ি সর্ব্বনাশি !
একি সংহারের দীপ্তি সমরের মহাতৃপ্তি খেলা আত্মনাশী
বিনাশের লালসা বিকাশি ॥
স্তব্ধ হোল মধ্যরাতে মত্ত যোদ্ধা শত শত রাঘব শিবিরে
কেহ চাহিল না ফিরে;
বিশ্বধ্বংসি কালানল শিখা যেন উড়ে আসে রমণীর বেশে
ত্র্যম্বলোচনের ভস্ম দর্পণে হয়েছে ধ্বংশ একি করে শেষে,

অঙ্গদ সুষেণ নীল জাম্বুবান হনুমান আরো কত যে সে
ভঙ্গ দিল হেরি দীপ্ত তীব্র শাপরূপী যেন উল্কা সর্ব্বনেশে
মিথ্যা জয় আশা
নিশ্চল নিস্তব্ধ বুঝি স্পন্দনা রহিত সব হারায়েছে ভাষা
নিরখি' রমণী দীপ্তভাসা ॥
শিঞ্জিনী টঙ্কার বৃথা উলঙ্গ অসির আর নাহি প্রয়োজন,
হের বৈদেহী রমণ
লঙ্কাদ্বার মুক্ত করি রক্ষিল সম্মান তব হে বীরেন্দ্র সতী
যাও যথা ইন্দ্রজিত নিকুম্ভিলা লজ্ঞসেবী ব্রহ্মচারী পতি।
একি বাসবের ছলা লঙ্কার পতন, দেব বিজয় আরতি
অলক্ষ্যে পশ্চাতে হের ফুলসাজে সুসজ্জিতা হাবময়ী রতি।
হরষ অন্তরে
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে টঙ্কারিয়া মুহুর্ম্মুহু হানে ফুলশরে
পঞ্চশর পুষ্পধনু করে ॥

কেঁদনা কেঁদনা ধনি! হাস হাস সুবদনি!
রণজয়ে ইন্দ্রজিতে শুধু প্রয়োজন,—
তোমার মুখের হাসি প্রভুর আশীষ রাশি
যার ভয়ে চমকিয়া ফিরিবে শমন।
ব্রহ্মচারী মেঘনাদ আজি মিলনের সাধ
অন্তরের অন্তরালে রাখ অয়ি নারী!
বোঝ না দেবের লীলা যজ্ঞ করে নিকুম্ভিলা
আজ দেবে ইন্দ্রজিত পূর্ণাহুতি তারি।
"বন্দী করি স্বমন্দিরে" বৃথায় রেখেছে কিরে
মন্দোদরী শ্বাশুড়ী কি মমতা-বিহীন
ইহা কি কখনো হয় মার প্রাণ মায়াময়
আজি শেষ পরীক্ষায় বিজয়ের দিন।
ধৈর্য্য ধর স্থির হও তুমিত অবুঝ নও
পতিব্রতা চিন্তা করো পতির কল্যাণ
কল্যাণী মুরতি ধরে তুমি দেব ব্রহ্মপুরে
ব্যাকুল বিবশ কেন আজি তব প্রাণ।

নাহি থাকে অলঙ্কার　　　　খসে পড়ে বার বার
　　উঠে কেন প্রাণে হেন ব্যথা যন্ত্রণার।
দূর হতে আসে যেন　　　　রোদনের ধ্বনি কেন
　　অস্ফুট বেদনা গাথা মূর্ত্ত হাহাকার।
"যাও সখি! যজ্ঞাগার　　　　যুদ্ধে কাজ নাই আর"
　　কি কহিলে যেন বীর না যান সমরে।
দুখানি চরণ ধরে　　　　বলিও মিনতি করে
　　বিসর্জ্জিতে রণসাধ আজিকার তরে॥

বাড়বাগ্নি শিখা সম মূর্ত্তিমতী ছবি গরিমার
এই কিগো জীবনের অস্তিমের শেষ লীলাভার।
উত্তরীয় রণবর্ম্ম কোথা গেল আকাশ-কুসুম
কোথা গেল অন্তরের রাগারুণ কামনার ধূম।
　　মিটেছে সমর সাধ নিভেছে বাসনা
　　চিতায় শয়নলাভ অন্তিম প্রার্থনা॥
ব্যথার জ্বালার মাঝে ওকি হাসে অরুণ নয়ন;
হোথা কি ঘুমায়ে আছে নিশান্তের অন্তিম চুম্বন?
তাহারি মদির মোহে অশান্ত মিলন পিপাসার
বাসনা দমিয়া রাখে শোক ক্ষুব্ধ ধ্বনি হাহাকার।
　　রাবণি-শিয়রে তব শোক দীপ্ত ছবি
　　প্রতীচীর কোলে রক্ত অস্তগামী রবি॥
বক্ষে বুঝি বাজে ব্যথা এই শেষ দৈহিক মিলনে;
কত আশা ছিল কাল নিজ হাতে সাজায়ে রমণে
পাঠাইবে রণস্থলে; সে আশা নির্ম্মূল করি হায়।
শেষ সাধে বাদ সাধে মন্দোদরী একটি কথায়
　　"ও বিধুবদন হেরি এ পোড়া পরাণ
　　জুড়াইব; তাই তব হ'ল নাক ত্রাণ॥
নতশিরে এ আদেশ অঙ্গিকারী' হে বীর রমণী!
দেখায়েছ তব বীরতা যেমন শীলতা তেমনি।
বুঝিয়াছি দেবি! না পড়িলে বাঁধা মন্দোদরী পাশে
সাধ্য কিসে লক্ষ্মণের যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিতে নাশে।

চিরজীবী নহে কেহ আসিবে মরণ,
হেন মৃত্যু করে বীর সাদরে বরণ ॥

পতি শব পাশে বসিয়া প্রমীলা
আননে দিব্য বিভা
চিতার আগুণে দেখাতে চাহিছে
সতীর গরিমা কিবা।
পাশে হের তার বীর সখিদল
নয়নে অশ্রু ঝরে
ভেঙ্গে আসে বুক বিয়োগ ব্যথায়
মুখে ভাষা নাহি সরে।
আজি কর্বুর গৌরব রবি
গিয়াছে অস্তাচলে
লঙ্কার রাজ-লক্ষ্মী বুঝিবা
তাই সবে ছেড়ে চলে।
চন্দনকাঠে সজ্জিত চিতা
শায়িত শবের কাছে
দাঁড়ায়ে গভীর দুখে কল্যাণী
বিদায় মেলানি যাচে।
ক্রমে মনে এল মায়ের কাহিনী
আঁখি ভরে এল জল
হরিণ-নয়না নেত্র সলিলে
ভাসাল' ধরণীতল।
কহিল বক্ষে নিঃশ্বাস চাপি'
"ফিরে যাও সহচরী
বাসন্তী আর আঁখিজল ফেলা
ব্যর্থ আমার স্মরি।
ফিরে যাও সবে দৈত্যপ্রদেশে
মোর বাপ মায়ে বোলো
এসব বারতা; বিধাতার মনে
যা' ছিল পূর্ণ হোলো।"

পতি-পাশে সতী চিতায় বসিল
　　　　সকলি হইল শেষ
আকাশে হইল পুষ্পবৃষ্টি
　　　　জয় গাথা গেল দেশ।
পরে কত শত শতাব্দী গত
　　　　শ্রীমধুসূদন কবি
হাসি কান্নার মুক্তা খচিত
　　　　আঁকিল মোহন ছবি।
তাহারো অর্দ্ধ শতাব্দী প্রায়
　　　　আজি এ পল্লী হতে
ভক্ত এ কবি রিক্ত অর্ঘ্য
　　　　ভাসিল মনোরথে।

স্বর্গ-সিংহাসন।

পৌরাণিক নাটক।

(লেখক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ)

উদ্বোধন-সঙ্গীত

আমায় কেন বারণ করোনি।
পিছল পথে চল্‌তে জানিনি।
গভীর কালো আঁধার রাতে
কেউত আমার নেইক' সাথে
পথ দেখাতে চপলার (ও) আলো জ্বালো নি।
রাতের শেষে ফরসা হ'লে
　　　　দৃষ্টি যদি চলে
দেখ্‌বে কাদা জলের ধারা
　　　　আছে নানান ছলে।
বিফল হোয়ে মনোরথে
সাধ্য কিসে চল্‌বে পথে

দিনের আলোয় চলার মত(ও) পা'টা রাখো নি।
আমায় কেন বারণ করো নি।

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

স্থান—ইন্দ্রের রাজসভা।

ইন্দ্র, কুবের, পবন ও শনি।

শনি—(ইন্দ্রের পানে তাকাইতে তাকাইতে) আমি তাকাই কিম্বা নাই তাকাই তবুও হতভাগা লোকগুলো বল্‌বে কিনা অমুকের উপর শনির দৃষ্টি পড়েচে। ওরে নির্ব্বোধেরা মিছামিছি শনির উপর অত ঝাল ঝাড়িস্ কেন? শনি তোদের করেছে কি? এইত দেবরাজের পানে ঘন ঘন তাকাচ্ছি এতে তাঁর কি আস্‌ছে যাচ্ছে।

ইন্দ্রঃ—প্রভঞ্জন, কহ তবে বারতা তোমার,
ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ
কোন গুহ্য সমাচার
নিয়ে এলে অমরার মঙ্গল কারণ।
অন্তর প্রদেশ মোর
বুঝিতে পারিনে কেন
থেকে থেকে উঠিছে কাঁপিয়া?
অবিজ্ঞাত আশঙ্কার শঙ্কা এত কেন
মাঝে মাঝে মোর বুকে উঠিছে ভেদিয়া?

পবন :— আশঙ্কার কারণত' দেখি নাক কিছু।
পলায়িত দানবেরা নিয়াছে আশ্রয়
পাতালের অন্ধকার গুহার ভিতর
অবশিষ্ট দু'এক জনারে
সেনাপতি তারকারি
দেছেন তাড়ায়ে দূর দণ্ডক কাননে।

ইন্দ্র :—একলা কি কার্ত্তিকেয় দানবের পিছু
তাই বুঝি আমার হৃদয়
অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিছে সতত।

পবন :—না-না, রয়েছেন সাথে সাথে
সহকারী সেনাপতি দেব হুতাশন।

ইন্দ্র :—সেও ভাল। ছল কপটী দুর্জ্জন যত দিতির কুমার
কোন অবসরে কোন মায়া ধরে
মায়ার প্রবন্ধে চাহে জিনিতে সমর।
দৈত্য মায়া ভীষণ জগতে
যার ছলে ভুলেছেন একদিন
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পঞ্চবটী বনে।
ধনাধিপ, হয়নিত' রাজকোষ
নিঃস্বপ্রায় দানব সমরে।

কুবের :—দেবেন্দ্র, যদিও দানব-যুদ্ধে আমাদের বিস্তর লোকসান সহ্য করতে হোয়েচে তবুও আপনার একমাত্র দাক্ষিণপ্রদেশ ও গন্ধর্ব্বদেশ সে ব্যয়ভার বহন করছে। রাজকোষ পরিপূর্ণ ই আছে। (শনির প্রতি) বলি, ও দেবতা, ঘন ঘন দেবরাজের প্রতি শুভদৃষ্টি কর্‌ছ কেন? নরলোকে ও দানব-বংশে কি শুভদৃষ্টি করবার মত লোকের এর মধ্যে অভাব হোয়ে গেল।

শনি :—(সক্রোধে) যক্ষ-রক্ষ-গুহ্যক-চণ্ডাল, তোর স্থান দেবলোকে হ'ল কেন? তুই থাক্‌বি হয় পাতালে-নয় নরকের অন্ধকারে-নয়ত পৃথিবীর বিবরে আমার উপরে কথা বল্‌তে আসিস্ কোন সাহসে?

কুবের :—প্রভু রাগত হবেন না। আপনার উচ্চবংশে জন্ম-থাকেন উপর আকাশে অথচ নজর ভাগাড়ের পানে। অর্থাৎ জাতিতে ব্রাহ্মণ কর্ম্মে চণ্ডাল। আমার কথা বলা এই জন্যে একবার দয়া করে মহাদেবের বড় ছেলের মুখের পানে চেয়েছিলেন—আর আমাকে সমস্ত রাজ্য খুঁজে উত্তর দিকে মাথা করে শোওয়া হাতীর মাথা কেটে আন্‌তে হোয়েছিল।

শনি :—(উচ্চৈস্বরে) দেবরাজ দেবতার মধ্যে কি এমন একজনও ভাল লোক নেই—যার জন্যে এই শঙ্কর অন্ত্যজটাকে জাতে তুলে নিতে হোয়েচে। আর তাকে আপনি এতদূর নাই দিয়েছেন যে, সে দেবরাজ সভায় বসে দেবরাজের সম্মুখে দেবতার অপমান করে। ধিক্ আপনার দেবত্বগর্ব্বকে।

কুবের :—দেবতা, অত চট্‌ছ কেন?

ইন্দ্র :—থাম যক্ষপতি। শনৈশ্চর,
পরিহাসও বুঝিবার নাহি কি ক্ষমতা তব।
অগ্নির সংযোগে ক্ষুদ্র তৃণের মতন
হঠাৎ উঠিল জলে—শুনে কুবেরের পরিহাস-বাণী।

তোমারও নয়নের শত শত কটাক্ষেও
কোন ক্ষতি হ'বে না'ক স্বর্গ অধিপের।
আপনা আপনি তোমাদের এই ব্যবহার
অলক্ষ্যে দানববৃন্দ হাসে দেখে শুনে।

(কার্ত্তিক ও অগ্নির প্রবেশ)

সেনাপতি, কুশলে আসিলে ফিরে দানব সংগ্রাম হ'তে।

কার্ত্তিক :—ভাবিয়াছিলাম—নির্ব্বাপিত দানবের
সমগ্র বীরত্ব বহ্নি অলকা সমরে।
তাই শুধু আমি আর দেব হুতাশন
মাত্র দুইজন
গিয়াছিলাম পিছু পিছু দণ্ডক কাননে।
হেরিলাম অকস্মাৎ ফিরিল দানব
ভীষণ সমরসাজে দাঁড়াল সম্মুখে।
সে দুর্ব্বার গতি যেন
চলে স্রোতস্বতী সাগর মিলনে।
সহিতে না পারি
সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দিল হুতাশন।

কুবের ও পবন :—তার পর—তার পর—

কার্ত্তিক :—দাঁড়ালাম প্রাণপণে সে দুর্ব্বার বেগ অবরোধে।
দেখিলাম আক্রমিল হুতাশন
পৃষ্ঠদেশ দাবানলরূপে
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি দাও দাও করে
দাবানলে আচ্ছাদিল সমগ্র কানন।
সভয়ে পিছন পানে চাহিল দানব।
সেই অবসরে বিদ্ধ করি নিশিত শায়কে
দলে দলে অমরারিগণে
পাঠালাম শমন-সদন।
ভঙ্গ দিল প্রাণভয়ে অবশিষ্ট দুই চারিজন।

ইন্দ্র :—সাধু! সেনাপতি সাধু তোমার বাহুর বল
স্বর্গরাজ্যে ভিত্তির সমান।

চিরদিন সাহায্যে যাহার
জয়ী আমি দানব সমরে।
দেব হুতাশন! বুঝিয়াছি
অধিগত করিয়াছ পূর্ণভাবে রাজনীতি তুমি।
যে কৌশলবলে আমি
জয়ী তুমি দানব সমরে।
নিন্দনীয় হলেও সে অনিন্দিত নীতিবিদ কাছে।
সহায়তা বিনে তব
জিনিতে নারিত রণে স্কন্দ তারকারি।

অগ্নি :—হে দেব সম্রাট্!
সমস্ত দেবতা তব আজ্ঞাবাহী দাস।
ক্ষুদ্র আমি, কতটুকু ক্ষমতা আমার?
যথাসাধ্য করেছি সমর
দানব বিজয় তরে।
সহিতে না পারি
অবশেষে ভঙ্গ দেছি সম্মুখসমরে।
হৃদি হতে মুছিবারে পলায়ন ক্ষত
করিয়াছি আশ্রয় কৌশল।
প্রশংসার অর্থবাদ কি আছে ইহাতে।

(ক্রমশঃ)

শরণাপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার পি. এইচ্. ডি.)

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি শরণাপত্তি আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অবলম্বন। সাধনাপথে অনেকদূর অগ্রসর না হইলে জগদ্ব্যাপারবৈচিত্র্যে যে ঈশ্বরেচ্ছাদ্বারা পরিচালিত এটা বেশ ভালো স্ফুরিত হয় না। পুনঃ পুনঃ আত্মনিবেদন ও

বিচারের ফলে সংস্কৃত বুদ্ধি আমাদের নিকট জ্ঞানের স্তর প্রকাশিত করিয়া দেয়। তখনই শরণাপত্তি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ়ভূমি লাভ করে। এরূপ অবস্থায় জীবের ক্ষুদ্র অভিমান--সাঙ্খ্যের ভাষায় অস্মিতাবুদ্ধি—নষ্ট হইয়া যায়।

দার্শনিক মতভেদে শরণাপত্তির রূপ এবং লক্ষ্যভেদ হইবে। যামুনাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, জীবগোস্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবের ঈশ্বর হইতে একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা মানিয়া থাকেন। মুক্তির দৃষ্টিতে ইঁহাদের ভিতর নানারূপ ভেদ থাকিলেও ইহারা সকলেই স্বীকার করেন যে জীব নিত্য পদার্থ। ইহা শ্রুতিসিদ্ধ বিচারের দ্বারা মানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুক্তির অবস্থায় জীবের স্বাতন্ত্র্যভাব একেবারে লয় হইবে না। অনাদিকাল হইতে জীব ঈশ্বর বিমুখভাবশতঃ মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া সংসার ভোগ করিতেছে। ঈশ্বরের সহিত তাহার যে নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহার স্ফুরনই তাহার মুক্তির পথ খুলিয়া দেয়। জীবের ভিতর ঈশ্বরাবোধ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার ভিতরে রাজসিক ও তামসিক ভাবগুলি নষ্ট করিবার দরকার হয়। এজন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে নানাবিধ পথ এবং উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করিতে শিখিলে অন্তঃকরণে রাজসিক এবং তামসিক বিকারগুলি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া আসে এবং সাত্ত্বিক ভাবগুলি জাগিয়া ওঠে। সাধক অল্পদিনের ভিতরই এই শরণাপত্তির প্রভাব জীবনে অনুভব করিয়া নিজের অন্তঃকরণকে প্রত্যেক অবস্থায় ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা পরিচালিত করিতে শিক্ষা করে না। ক্রমে ক্রমে নিজের অন্তঃকরণকে প্রাণ, মন, বুদ্ধিরও আত্মসমর্পণ দ্বারা এমন গঠিত করিয়া তুলেন যে সমস্ত বিষয় পরিচালনা তিনি তখন নিজের ইচ্ছার দ্বারা করেন না। প্রত্যেক ব্যাপারে ঈশ্বরেচ্ছা বা নির্দ্দেশ কি এইটুক বুঝিয়া আপনাকে নিমিত্তমাত্র করিয়া জগতের ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া যান। ইচ্ছা এখন পরিচালিত হয় পরিমার্জ্জিত এবং নিবেদিত বুদ্ধির দ্বারা। বুদ্ধি প্রকাশ করে জগদ্ব্যাপার বৈচিত্র্যের ভিতর ঈশ্বরের বোধ এবং ইচ্ছা। সাধক যখন আরও উচ্চতর স্তর প্রাপ্ত হন, যখন তাহার ভিতর হইতে ঈশ্বরবোধের বিচ্ছিন্ন হয় না নিত্যযুক্ত হইয়া যখন তিনি ঈশ্বরের জ্ঞানের অপরিমেয়তা, প্রেমের গভীরতা এবং ইচ্ছার ও শক্তির অপ্রতিহততা অনুভব করিতে থাকেন তখন তিনি লীলা বিভূতির স্তর ত্যাগ করিয়া নিত্য বিভূতিতে আরোহণ করিতে

চেষ্টা করেন। জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের দৃষ্টি রামানুজের লীলাবিভূতি পর্য্যন্তই আচ্ছন্ন ছিল। তিনি তাহার নীতিশাস্ত্রের ভিতর দিয়ে (Vide Sterret's Ethics of Hegel) এই বিশ্বের একটী ধর্ম্ম সাম্রাজ্য (Moral state) স্থাপিত হইবার একটা প্রয়াস চলিতেছে এই কথা বলিয়াছেন। হেগেলের মতে এই বিশ্বের ভিতর দিয়া নিত্যজ্ঞান (Idea) আত্মবিশ্লেষণ (Self differentiation) এবং আত্মসমন্বয় (Self integration) দ্বারা আপনাকে বহুতে পরিণত করিয়া এবং বহুকে একাত্মতায় প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই দুই পরস্পর বিরোধশক্তির পরস্পর সমন্বয়ে বিশ্বব্যাপী একটা নীতিপূর্ণ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্ম এইরূপ একটা নীতি এবং ধর্ম্মের রাজ্য সংস্থাপন করিতে নিয়োজিত হয়। বৈষ্ণবদার্শনিকগন ভগবৎলীলা বৈচিত্র্যের ভেতর এটাকে লীলা বিভূতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এইরূপ একটী মানব সাম্রাজ্য স্থাপিত করায় ভগবৎলীলার শ্রেষ্ঠতম কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ ইহাকে তাহারা প্রাকৃত বিভূতির ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রকৃতির ভেতর দিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ ফুটিয়া ওঠে না। এইজন্য রামানুজ ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঈশ্বরের লীলাবিভূতি অতিক্রম করিয়া নিত্যবিভূতিতে প্রবেশ করিতে চান। শরণাপত্তি যখন কোন বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় না, প্রেমের অফুরন্ত আস্বাদ যখন জীবের ভিতরে সমস্ত প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্ত করিয়া দেয় তখন ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ বোধ ফুটিয়া ওঠে। এই স্বরূপবোধের ভিতর অনুভব করে ঈশ্বরের সহিত একটা নিত্য প্রীতির মিলন। এই অবস্থায়ও জ্ঞান ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, প্রেমরসাস্বাদ করে এবং ইচ্ছা ভগবৎসেবায় নিয়োজিত হয়। এই অবস্থার পর জীবের যতদিন প্রাকৃত শরীর থাকে ততদিন তিনি অন্তরের অন্তরতমস্তরে নিত্য মিলনের আনন্দ উপভোগ করেন। বিচ্ছিন্নাবস্থায় প্রিয়জনের বিরহ ক্লেশ মিলনের স্মৃতিতে অভিষিক্ত হইয়া এক অভিনব ভাব সম্পাদন করে। এই বিরহ ভূমিতে অবসন্নহৃদয় বিরহব্যথায় মিলন সুখাস্বাদনে আবার উন্মুখ হয়। এখন আর সংশয় নাই, সন্দেহ নাই, নিজের সমস্ত সত্তাটা এখন কোন অদৃষ্টস্বরূপ শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া মিলন, বিরহ, পুলক, অশ্রু কখন বা ভগবদ্ভাবে কখন বা ভক্তভাবে পরিচালিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। এরূপাবস্থায় শরণাপত্তি সম্পূর্ণ স্থিতিলাভ করিয়াছে। জীবত্বের চাঞ্চল্য

অপগত হইয়াছে। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জীব এখন অন্যান্য সমস্তশক্তির পিছনে ভগবৎশক্তিকে ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ তাহাতে শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইচ্ছাদ্বারা এখন আর কোন কার্য্য হয় না। নদীর স্রোত যেমন আপনাপনি জোয়ার ভাটায় কখনও বা পূর্ণপ্রবাহা বা ক্ষীণপ্রবাহা হয়, অনুভূতির এইস্তরে পূর্ণ শরণাপন্ন অবস্থাতে ভক্তের জীবনও কখন মিলনের আবেগে স্ফীত হইয়া আনন্দে ভরে ওঠে কখনও বা বিরহের শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া মিলনের স্মৃতিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টার ভিতর নিজের অস্তিত্ব বোধ নাই, ইচ্ছা নাই। আপনা হইতেই এই বেগ আসিয়া থাকে এবং আপনা হইতেই লয় পায়। ভক্ত যখন দেখে মিলন বা বিরহ তাহার ইচ্ছাতে সঙ্ঘটিত হয় না তখনই সেই নিত্য লীলার অঙ্গীভূত হইয়াও পূর্ণ শরণাপন্ন হইয়া নিত্যলীলায় আনন্দ আস্বাদ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। মিলনের সুখ বা বিরহের ব্যথা কোনটা আসিবে তা জানা নাই—জানিবার দরকারও নাই কারণ ভগবৎ ইচ্ছাতেই তাহার প্রীতি ভগবানের সুখই তাহার সুখ, সে মাত্র ভগবানের সুখবোধবৈচিত্র্যের উপায়, তাহার নিজের সুখও নাই, দুঃখও নাই। তার শুধু নিজেকে দেওয়াই সুখ, সে তার সব দিয়ে ফেলেছে, আর কোন উপায় নাই। ভক্তিবাদের শরণাপত্তির এই পূর্ণ নিয়তি।

অদ্বৈতজ্ঞানবাদীদেরও একটা শরণাপত্তি আছে। তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিবার পূর্ব্বে উপাসনার স্তরে ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হন। যতদিন অজ্ঞানকৃত জীবত্ববোধ থাকিবে ততদিন জ্ঞানীর নিকট ঈশ্বরসত্তা এবং ঈশ্বরোপাসনা এবং ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের প্রয়োজন থাকে। উপাসনা চিত্তবৃত্তিকে একাগ্রভূমিতে পৌঁছিয়া দেয় এবং সত্ত্বের স্ফুরণের দ্বারা চিত্তকে জ্ঞানলাভ করিবার অধিকারে উপাসনা এবং ধ্যানের গভীরতায় নানাপথগামী সঙ্কল্প বিকল্প স্থির হইয়া আসে, তখনই বুদ্ধি জাগিয়া ওঠে, বোধের উৎকর্ষের সহিত জীবত্বভাব ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। কারণ অন্তঃকরণ তখন তাহার ক্ষুদ্রত্ব বা অণুত্বভাব ত্যাগ করিয়া বিরাটভাব ধারণ করে। সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহার স্বারাজ্যসিদ্ধিতে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে জীবের অন্তঃকরণ যদিও আপাততঃ অণু বলিয়া মনে হয় কিন্তু তাহার ভিতরে একটা বিরাটভাব ও একটা ব্যাপকসত্তা নিহিত আছে। অদ্বৈতবাদের সাধনার প্রথমস্তরে ঈশ্বরভক্তি এবং শরণাপত্তিকে গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক জীবের ভিতর যে ঈশ্বরত্ব আছে তাকে

ফুটিয়া তোলার প্রয়াস হয়। সাঙ্খ্যযোগের বিচারের দিক দিয়া হয়ত এস্তরের একটা বিশেষ আবশ্যকতা জ্ঞানী জীবনে অনুভব করে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে বিচারের দ্বারাও চিত্তকে সম্যক মার্জ্জিত করিলে অন্তঃকরণের ব্যাপকসত্ত্বা আপনা হইতে কখন কখন জাগিয়া ওঠে। এখানেই মানুষের ক্ষুদ্রজীবভাব নষ্ট হইয়া একটা অনবচ্ছিন্ন সত্ত্বার বোধ ফুটিয়া ওঠে। এই স্তরে সাধকের অনুভব হয় "আমি রুদ্র, আমি বসু, আমি আদিত্য, আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নিকে আমি ধারণ করি।" এই অবস্থায় সাধক সমস্ত বিশ্বকে নিজের স্বরূপের ভিতরে অনুভব করিতে থাকেন। তখন সমস্ত বিশ্বব্যাপী একটা জ্ঞান ঘন অবস্থায় সাধক আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাও শরণাপত্তির অবস্থাবিশেষ। যদিও এখানে জীববোধ নাই তথাপি এই। জ্ঞান ঘন ভূমি ফুটে উঠে সাধকের জীবত্বের স্থানে ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এখানেই সর্ব্বদাই ভেসে উঠ্‌ছে সেই বিরাট এবং সার্ব্বভৌমিক আনন্দ। এখানেই সঙ্কীর্ণতা নষ্ট হইয়াছে। শান্তিময় উদারমুক্তির ক্ষেত্র জাগিয়া উঠেছে। বিশ্বে আর কাহার এমন অস্তিত্ব নাই যে সর্ব্বব্যাপী আমির থেকে পৃথক এবং স্বাতন্ত্র্য। এই অবস্থাকে স্থির করিতে হইলে সকলের ভিতর যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া সকলের ভিতর অনুস্যূত যে প্রজ্ঞানঘন সত্ত্বা তাহার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। এই আশ্রয় গ্রহণ করিলে বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে প্রজ্ঞানঘন আপনা হইতে প্রকাশিত হন। কিন্তু এতেও জ্ঞানের শেষ স্তরে উপনীত হইতে পারা যায় না। এখানেও অজ্ঞানের ক্ষীণাবরণ এখনও বর্ত্তমান তাহাতেই এই প্রজ্ঞানঘন অধিচরণে সমস্ত বিশ্ব ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অবস্থা অতিক্রম করিতে হইলে ঐ অজ্ঞানের দ্রষ্টা হইতে হইবে। সাক্ষী চৈতন্যের শরণাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে। বিরাট অন্তঃকরণ ধারণ করিয়া আছে যে বিশ্ব সেই বিশ্বের দ্রষ্টা সেই অন্তঃকরণের সাক্ষী অবস্থায় স্থিতিলাভ করার নামই ত নির্ব্বাণমুক্তি। ঈশ্বরে এবং ব্রহ্মে এক মায়ার উপাধি ভিন্নত আর কোন ব্যবধান নাই। যতক্ষণ মায়ার উপাধি থাকে ততক্ষণে মায়াধীশ্‌ রূপে চৈতন্য ঈশ্বর সত্ত্বাপ্রাপ্ত হন। মায়ার দ্রষ্টা যিনি তিনি সাক্ষী, যিনি সাক্ষীর সাক্ষী তিনিত নিরুপাধি চৈতন্য। সাধকের জীবত্ব বুদ্ধি অপগত হইলে একটা ঈশ্বরভাব ফুটিয়া উঠে কিন্তু এ অবস্থাও সাধনার এবং সিদ্ধির পরাবস্থা নহে। অতএব এ অবস্থার শরণাপত্তি নির্গুণ ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সংস্কৃতবুদ্ধির

যখন সমস্ত মলিনতা এবং আবরণ নষ্ট হয়, অপরোক্ষ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সাধকের সাক্ষী স্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। এই শরণাপত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম, কারণ ইহা সমস্ত উপাধি বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমা আনন্দ ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানঘনকে প্রকাশিত করিয়া দেয়। এই হইল জ্ঞানীরই শরণাপত্তি।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমস্যা।

(লেখক—প্রফেসার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,)

সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মনান্তর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল সমসাময়িক ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করায় বিশেষ ফল নাই। বর্ত্তমান যুগ বুঝিতে গেলে অতীতের ইতিহাস আশ্রয় করা আবশ্যক। অপরদিকে অতীত ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝার জন্য বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পরস্পর সম্বন্ধব্যাপারেও এই পদ্ধতি অবলম্বনীয়।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শত্রুতা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও আধুনিকযুগের প্রারম্ভেই দেখা যায় অনেক ব্যাপারেই ইহারা বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরমে আসিল। নৌবলে, বাণিজ্যে, উপনিবেশ-স্থাপনে এবং ভারতবর্ষাদি দেশে সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা উভয়েরই ঈপ্সিত ছিল। কিন্তু এই জীবনমরণ সংগ্রামে বিধাতাপুরুষ ইংলণ্ডকেই সমধিক উপায়সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ফ্রান্স ইউরোপের ভূভাগান্তর্বর্ত্তী হওয়ায় সর্ব্বদা স্থলেই বিপন্ন হন এবং তজ্জন্য স্থলে আত্মরক্ষাই অত্যাবশ্যকীয় হয়। ইংলণ্ডের কিন্তু এই উৎকট ভাবনা ছিল না। সমুদ্রই ইংলণ্ডের রক্ষকস্বরূপ হইল এবং নিজে অদৃশ্য থাকিয়া ইংলণ্ড সামর্থ্য ও সুযোগ বুঝিয়া ফ্রান্সের অহিতে রত রহিলেন। ফলও অনুরূপ হইল। ফ্রান্সের নেতৃপুরুষ প্রথম নেপোলিয়ন এককালে সমস্ত ইউরোপ আয়ত্ত করিয়াও অবশেষে পরাজিত হইলেন। তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের একাধিপত্যও ঘুচিল এবং বিশ্বব্যাপারে ইংলণ্ড সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তৃত্ব চালাইতে লাগিলেন।

এই বিপর্য্যয় পরে ১২ বৎসর ফ্রান্সের অতি হীনাবস্থায় কাটিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফরাসীবিপ্লব হইলে ফ্রান্সের সৌভাগ্যসূর্য্য আবার উদীয়মান হইল। কিন্তু ৪০ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের অবস্থা এবং ফ্রান্সের অভিপ্রেত উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখা গেল। একদিকে ইউরোপের রাজন্যবর্গ বিপ্লবদমনে চিরসঙ্কিত সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অপরপক্ষে ফ্রান্সেরও পূর্ব্ববৎ বিশ্বজিগীষা আর জাগিল না। ইংলণ্ড দেখিলেন যে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য হইলে তাঁহার যে আশুবিপদ সূচিত হইত তাহার কোনও আশঙ্কা নাই। উভয়পক্ষেই শত্রুতার মূলকারণ নিষ্কাষিত হইল। বরং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়দেশেই প্রজাতন্ত্রমূল শাসনবিধি প্রচলিত হওয়ায় প্রীতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইল। অবশেষে এই ঘনিষ্ঠতা বদ্ধমূল হইলে রুষিয়া চীন প্রভৃতি দেশে একই দলভুক্ত হইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শত্রুতা এতদিনে দৃষ্টির অন্তরালে গেল।

কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী হইল না। প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী সম্রাট হইবার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার অভিসন্ধিসম্বন্ধে ইংলণ্ডের দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়। অনেকেরই বিশ্বাস হইল যে তিনি পিতৃব্যের পদানুসরণ করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন। রুষিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করিয়াও এই সন্দেহ যায় নাই। বস্তুতঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের সে অভিপ্রায় ছিল না। ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা রক্ষাকরতঃ একদিকে নিশ্চিন্ত থাকিয়া ইউরোপ ভূভাগে রুষিয়া প্রভৃতি দেশসহ সমকক্ষতা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক এই মনান্তরের ফল অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল। ১৮৬৪, ১৮৬৬ এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ঘটনাক্রমে ফরাসীসাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইল এবং জর্ম্মাণ ইউরোপে শ্রেষ্ঠতালাভ করিলেন। ফ্রান্সের দুর্গতির সীমা রহিল না। ইংলণ্ডের সাক্ষাৎভাবে ক্ষতি তখনই না হইলেও বিপদের আভাষ ক্রমশঃ দেখা দিতে লাগিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর ইউরোপের ইতিহাস জর্ম্মণ সাম্রাজ্যেরই ইতিহাস বলা যায়। নবযুগে জর্ম্মণির প্রতিষ্ঠাতা বিসমার্ক স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে ফ্রান্স কখনও শত্রুতা ভুলিবে না এবং অপর দেশগুলিও জর্ম্মণির আকস্মিক অভ্যুদয়ে অপ্রসন্ন হইয়া আছে। এই নূতন সৃষ্টি জর্ম্মণ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করাই বিসমার্কের শেষ জীবনের ব্রত ছিল। তখনও জর্ম্মাণি বাণিজ্যাদি ব্যাপারে ইংলণ্ডের সমকক্ষতা কামনা করেন নাই। সুতরাং ইংলণ্ড ও

জর্ম্মণির বিবাদ অঙ্কুরেই ছিল। বিস্‌মার্ক শুধু স্থলভাগেই দেশরক্ষা উদ্দেশ্যে জর্ম্মণি অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর Triple Allionce নামে সুবিখ্যাত সংস্থাপন করেন। ইউরোপের ভূমধ্যভাগে এই বিরাট শক্তিপুঞ্জ স্থাপন করে ফ্রান্স ও রুষিয়া উভয়েরই লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইল। প্রবলতর জর্ম্মণির বিরুদ্ধ চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল বোধ করিয়া ফ্রান্স আফ্রিকা ক্যাম্বোডিয়া প্রভৃতি দূরদেশে এবং রুষিয়া সাইবিরিয়া চীন প্রভৃতি অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার নীতি অবলম্বন করিলেন এই অবসরে নূতন জর্ম্মণি সাম্রাজ্যও দিনে দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এই যুগের সাধারণ লক্ষণ নিজ ইউরোপ অপেক্ষাকৃত শান্তিবিস্তার কিন্তু অন্যত্র নানা বিবাদ বিসম্বাদ। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সকলেই বহির্ভাগে স্ব স্ব রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন। জগতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ চীন ও আফ্রিকা দেশে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনায় ফল নাই। স্থূলতঃ দুইটী বিষয় প্রণিধান-যোগ্য। প্রথমতঃ ঘটনাচক্রে সমস্ত আফ্রিকা ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। দ্বিতীয় কথা এই যে সাম্রাজ্যবিস্তারলোভে ইংলণ্ড জর্ম্মণি উভয়েই পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। অপরদিকে ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ড রুষিয়াকে ঘোর সন্দেহের চক্ষে দেখিলেন এবং মিসরদেশে আধিপত্য লইয়া ফ্রান্সের সহিতও মনান্তর ঘটিল।

ইতিমধ্যে ইউরোপের ভিতরও ধীরে ধীরে অনিষ্টের ছায়া পড়িল। ফ্রান্স ও রুষিয়ার সম্মিলন চিরদিনই জর্ম্মণির অভীপ্সিত এবং যতদিন বিস্‌মার্কের কর্তৃত্ব ছিল ততদিন তাঁহারই চেষ্টায় এই সংযোগ ঘটে নাই। কিন্তু বিস্‌মার্কের পদচ্যুতির অল্পদিন পরেই ফ্রান্স ও রুষিয়া একত্রে Dual Alliance স্থাপন করিলেন। Triple Alliance হেতু জর্ম্মণির যে একাধিপত্য ছিল, তাহাতে অন্তরায় আসিল। তবে যুদ্ধের আশঙ্কা মধ্যে মধ্যে উঠিলেও ফলতঃ যুদ্ধ হয় নাই। Triple Alliance ও Dual Alliance উভয়ের শক্তি সমান বিবেচিত হওয়ায় বলপ্রয়োগে কোনও পক্ষেরই ভরসা হয় নাই। অপরদিকে ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণি ও রুষিয়া সকলেরই ভিন্ন সূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় কোনও দলেই যোগ দিলেন না।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে একটী যুগ পরিবর্ত্তন হইল। এই সময়ে জর্ম্মণি নৌবলে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন আর এই সময়েই বুয়ার যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ড সমগ্র জগতে নিজেকে সহায়হীন দেখিলেন।

তখন হইতে উভয়পক্ষেই অবিরাম চেষ্টা চলিল। জর্ম্মণি অল্পকালের মধ্যেই সুবৃহৎ নৌবহর নির্ম্মাণ করিলেন। ইংলণ্ডও নৌবলবৃদ্ধির চেষ্টায় থাকিয়া অন্যত্র সহায় খুঁজিতে থাকিলেন। ফলে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও জাপান সম্মিলিত হইলেন। ক্রমশঃ অপরদিকেও ঘটনা অনুকূল হইয়া আসিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের নিকট পরাজিত হওয়ায় রুষিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে গতি প্রতিহত হইল। রুষিয়া পুনরায় ইউরোপে বিশেষতঃ তুরস্কের অন্তঃপাতী দেশসমূহে মন দিলেন। ফ্রান্স ও জর্ম্মণিকৃত পূর্ব্বপরাজয়ের প্রতিশোধগ্রহণে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিলেন। ফলে একপক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অপর পক্ষে ইংলণ্ড ও রুষিয়ার মনোমালিন্য দূর হইয়া ঘনিষ্ঠ প্রীতি স্থাপিত হইল। মোটের উপর একদিকে Triple Alliance এবং অপরদিকে Triple Entente সম্মুখীন হইয়া ইউরোপে মহাযুদ্ধের সূচনা করিল।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের কথঞ্চিত বিবরণ করিবারও অবকাশ এখানে নাই। ৪ বৎসর ধরিয়া অজস্র রক্তপাত ও অর্থব্যয়ে পৃথিবী ধ্বংসপ্রায় হইলে সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্ব স্ব অভীষ্টলাভ করিয়াছেন। জর্ম্মণি ও তাহার মিত্রপক্ষ সর্ব্বতোভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ী অন্যতম শক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত। এখন এই বিরোধের কারণ এবং ফলাফল বিচার করিতে হইবে।

বিরোধের কারণ বুঝিতে গেলে মিত্রতা কেন হইয়াছিল সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে হয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে মিত্রতা ব্যক্তিবিশেষের মিত্রতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই ব্যাপারে ভিন্ন স্বার্থে স্বার্থী শক্তিদ্বয়ের সমাবেশই রাজনৈতিক মিত্রতা বলা যায়। এস্থলে স্পষ্টই দেখা যায় যে জর্ম্মণির সহিত একত্রে যুদ্ধ করিলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লুণ্ঠিত প্রদেশ দুইটীর পুনঃপ্রাপ্তিই ফ্রান্সের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ড নৌবলে স্বীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদই প্রধানতঃ কামনা করিয়াছিলেন। সন্ধিসর্ত্তফলে ইংলণ্ডের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অপরপক্ষে ফ্রান্সের উদ্দেশ্য সফল হইলেও ভবিষ্যতে তাহার রক্ষাসম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। এইখানেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ভেদ সূচনা হইয়াছে। জর্ম্মণির পুনরুত্থানে ফ্রান্সের যে পরিমাণে আসন্ন বিপদ উপস্থিত হয় ইংলণ্ডের তাহা নয়। ফ্রান্স জর্ম্মণির প্রতিবেশী কিন্তু ইংলণ্ড সমুদ্ররক্ষিতা বলে দেখা যাইতেছে যে সন্ধিসর্ত্তানুসারে প্রতিশ্রুতিপালনে জর্ম্মণির ত্রুটী

হইলেই ইংলণ্ড সামনীতি ও ফ্রান্স দণ্ডনীতির পক্ষপাতী। মিত্রের এই ব্যবহার ফ্রান্সের চক্ষে শত্রুব্যবহার তুল্য। গৌণ আরও কয়টী কারণ বিদ্যমান থাকিলেও ইংলণ্ড ফ্রান্সে মনান্তর ঘটিবার এইটী মুখ্য কারণ বুঝিতে হইবে। তবে দূরদৃষ্টিতে মনে হয় যে মোটের উপর মিত্রভাব চলাই উভয়ের স্বার্থানুমোদিত। জর্ম্মনি সম্প্রতি ধূলিশায়িত হইলেও এই অবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। জর্ম্মণির পূর্ব্বাবস্থা অল্পমাত্রে ফিরিলেই ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহযোগিতা আত্মরক্ষার্থ আবশ্যক মনে করিবেন। চাণক্যের বাক্যও সফল হইবে, অগ্নিই লৌহসহ লৌহের সংযোগকরণে সমর্থ।

শ্রীশ্রীরাসলীলা রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অগ্নিতে হাত ইচ্ছায় দিলেও তাহা দগ্ধীভূত হয়, আবার অনিচ্ছায় দিলেও তাহা দগ্ধীভূত হয়। ভগবানকে—কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ ঐক্য, সৌহার্দ্দ ইহার একটী দ্বারাও যিনি সর্ব্বদোষহারী শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই তন্ময়তাপ্রাপ্ত হন। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ ও গোপীকাদি কামে, শিশুপালাদি ক্রোধে, কংসাদি ভয়ে, পাণ্ডবাদি স্নেহে, আত্মারামগণ ঐক্যে এবং কৌশিকাদি সৌহার্দ্দে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হিতে ॥

গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে—

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা
প্রতিযাতব্রজংনেহ স্থেয়ং স্ত্রিভিঃ সুমধ্যমাঃ

অর্থাৎ হে সুমধ্যমাগণ। এই রজনী ঘোররূপা। হিংস্রক জন্তুগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এই ভয়ানক স্থানে স্ত্রীলোকের অবস্থান করা একান্ত অবিধেয়, অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও"—এই বলিয়া তাহাদিগকে ব্রজে ফিরিতে বলিয়াছিলেন। এখন ভাবুন দেখি, ভগবানের হৃদয়ে যদি

গোপবালাগণকে লইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন কামনা থাকিত তাহা হইলে কি তিনি তাহাদিগকে এইরূপে ব্রজে ফিরিতে বলিতেন ?

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতারঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥

হয়ত তোমাদের পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং স্বামী তোমাদিগকে গৃহমধ্যে বা বনমধ্যে দেখিতে না পাইয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতেছেন, খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহারা যদি এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তোমাদের ও আমার লজ্জা ভয় রাখিবার স্থান হইবে না।

এত লজ্জা, এত ভয় যাঁহার তিনি কি কখনও লাম্পট্য দোষে দুষ্ট হইতে পারেন ? কোন্ কামাতুর নির্জ্জন বনমধ্যে নীরব নিশীথে ষোড়শী রূপসী কামিনী পাইয়া তাহাদিগকে গৃহে ফিরিবার জন্য এরূপভাবে অনুরোধ করেন ? বিবাহিতা গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান বলিলেন—"তোমরা শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও, পতিদের সুশ্রূষা কর, সতীত্ব ধর্ম্মের জন্য পতিব্রতাগণের সেবা কর।" একথা যাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে তিনি কতদূর ইন্দ্রিয়জয়ী, কতদূর মহান্ তাহা বলাই বাহুল্য।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষাং স্ত্রীনাং পরোধর্ম্মো হ্যমায়য়া
তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ। প্রজানাং চানুপোষণম্

হে কল্যাণীগণ ! হে সাধ্বীগণ ! অকপটে শুদ্ধান্তঃকরণে আপন স্বামী শ্বশ্রূ শ্বশুরাদির সেবা এবং পুত্র ভৃত্যাদির পালনই স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, সুতরাং অন্যের সুশ্রূষা করা ধর্ম্ম নহে।

এরূপ পাতিব্রত ধর্ম্ম যে পুরুষ স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেন তিনি কি ভাবে লাম্পট্য দোষে দুষ্ট হইতে পারেন তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধোজড়ো রোগ্যধনোহপিবা
পতি স্ত্রীভির্ণহাতব্যো লোকে পশুভির পাতকী

অপাতক স্বামী দুঃশীল হউন, ভাগ্যহীন হউন, বৃদ্ধ হউন, সামর্থ্য হীন, হউন, রোগগ্রস্ত হউন বা দরিদ্র হউন সদগতি লাভাভিলাষিণী রমণীগণ কখন সেই পতিকে পরিত্যাগ করিবেন না। কুলকামিনীগণের উপপতি সেবা স্বর্গ-প্রাপ্তির প্রতিকূল, ইহা পূর্ব্ব সঞ্চিত যশোনাশক, অচির স্থায়ী, অতি তুচ্ছ, দুঃখ সাধ্য, ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত।

এইভাবে গোপীগণকে গৃহে ফিরিতে পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও যখন তাহারা গৃহে ফিরিল না বরং অশ্রুজলে কুঙ্কুম বিধৌত করিতে লাগিল তখন তিনি বিকশিত কমল পরিমল বাহী-সমীরণ পরিশেবিত সুশীতল বালুকাপূর্ণ যমুনাপুলিনে গোপবালাদিগকে লইয়া রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। রমণ করিতে করিতে ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্য গর্ব্ব দর্শন করিয়া তাহাদের অহঙ্কার দূর করিবার নিমিত্ত এবং গোপীশ্রেষ্ঠা মানিনী বৃষভানু নন্দিনীকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে আকুল হইয়া তাঁহাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পরস্পর মিলিত হইলেন সম্মুখে অশ্বত্থ, প্লক্ষ কুরবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক্ প্রভৃতি বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যাঁহার সুমধুর হাস্যে মানিনীর মান দূরীভূত হয়, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা দেখিয়াছ কি? এইভাবে পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইল না, তখন কোন গোপিকা পূতনার ন্যায় আচরণ করিয়াছিল। কেহবা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাহার স্তনপান করিয়াছিল। কোন গোপীকা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অনুকরণ করিল। কিঙ্কিনীর শব্দযুক্তা কোন এক গোপিকা হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তাহারা যমুনার তীরে কবরীর মালা দেখিতে পাইয়া বলিল নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে সেই কামিনীর বেণী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বাত্মরত আপনার দ্বারাই আপনি পূর্ণকাম। আত্মারাম—আপনা আপনিই রমনশীল ও অখণ্ডিত অনাশক্ত চিত্ত। স্ত্রীদিগের বিভ্রম শৃঙ্গার ভাবসাত ক্রিয়াবিশেষ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তথাপি তিনি শ্রীরাধার সহিত রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি সর্ব্ব আহ্লাদের সার যে প্রেম, তাহারও পরমাবধি যে মহাভাব তাহাই হ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং তিনি আপনাআপনি রমণশীল হইলে হ্লাদি মহাসারভূতা শ্রীরাধার সহিত রমণেই অধিক সুখী। তন্ত্র বলিয়াছেন, সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী নাম্নী যে শক্তি তাহার সার ভূতা এই শ্রীরাধা এবং এই রাধাই মহাভাব স্বরূপা ও নিখিলগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ কেবল কন্দর্পের দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য এই রাসলীলা করিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতে যাইতে যেই তাঁহার অহঙ্কার হইল এবং যেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন আমায় ক্রোড়ে করিয়া তোমার অভীপ্সিত স্থানে লইয়া যাও তখনই তিনি রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

গেলেন। এদিকে গোপীগণ চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া শ্রীরাধার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া দুঃখপ্রকাশকরতঃ যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া তাহারা করযোড়ে বলিতে লাগিল হে সখে! আমরা তোমার দাসী। তুমি আমাদিগকে তোমার মনোহর বদনকমল দর্শন করাও। হে কমললোচন! আমরা তোমার কিঙ্করী। তোমার অধরসুধা দ্বারা আপ্যায়িত কর, নতুবা আমরা মরিয়া যাইব। গোপীগণ যখন এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তখন তিনি সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন। কোন ব্রজাঙ্গনা নয়নমার্গে ভগবানকে হৃদয়ে আনয়নকরতঃ চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া পুলকিত শরীরে যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারা স্তন-কুঙ্কুমরঞ্জিত নিজ নিজ উত্তরীয় বসনে সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমের আসন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। হেমময় মণি সকলের মধ্যে মরকত মণি যেমন শোভা পায়, তেমনি ভগবান দেবকী-নন্দন সেই গোপীগণের মধ্যে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাহাদের কবরী ও কাঞ্চী শিথিল হইয়া পড়িল। তাহাদের কর্ণোৎপল অলকভূষিত কপোল ও ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

এখন কথা এই, ভগবান্ বিলুপ্তধর্ম্মের উদ্ধারসাধন, বর্ত্তমান ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরূপে লোকরক্ষা মর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা, এবং অভিরক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে নিজেই পরদারসম্ভোগরূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ তিনি তাহা করেন নাই। তিনি সকলধর্ম্মের আশ্রয়। তাঁহার অবতারত্ব-গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ভক্তিপ্রচার ও তাহার পরিণাম— প্রেম। তিনি ভক্তিবিস্তার এবং তদেকসাধ্য ধর্ম্মের সফলতার জন্য সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদুদিগের পতি। তিনি সকল কামনারই বহির্ভূত। অগ্নি সকলদ্রব্য দহন ও ভক্ষণ করিলেও যেমন তাঁহার অভক্ষ্য-ভোজন বা বধাদি জন্য কোন দোষ হয় না, সেইরূপ তেজস্বী ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সেই কর্ম্ম কোন দোষের নিমিত্ত নহে। শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়শক্তিকে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সমুদ্রোত্থিত কালকূট মহাদেব পান করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যব্যক্তি যদি ভ্রমে তাহা পান করে, তাহা হইলে তাহার যেরূপ প্রাণনাশ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারে নাই এমন লোক যদি শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার অনুকরণ করিতে যায় তবে সে নিশ্চয়ই

বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার আত্মপর ভেদাভেদ নাই, তাঁহার আবার পর কে? তিনি নিরাকার হইলেও লীলার জন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি যখন যেরূপ লীলা করেন, তখন তদুপযুক্ত দেহেই বিরাজিত হন। ভগবান্ নিরাকার, তিনি পরমাত্মা। সকলের অন্তরে থাকিতে হইলে কোন আকারের অপেক্ষা করে না। তজ্জন্যই পরমাত্মা নিরাকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, পরন্তু তিনি নিরাকার নহেন।

এই সব গূঢ়তত্ত্ব বুঝি না বলিয়াই আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে রাসলীলাকে স্থূলদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থের বীভৎস লীলা বলিয়া মনে করি।

আবাহন।

(লেখক—সম্পাদক)

(১)

এস দেবি! সরস্বতি! হৃদয়-সরসে মম,
দেও দাসে সুর-শ্রুতি, শুনি বীণার মূর্চ্ছনা
নাচিবে গাহিবে সদা তানে তানে দাস তব,
নাচে গাহে যথা বিশ্ব আনন্দে অনন্তযুগ।
দেও দাসে অবিজ্ঞান দেবি! জ্ঞান-স্বরূপিণি
ভ্রম-জ্ঞান পরিত্যজি যাহে স্বরূপে দেখিব
এই পঞ্চীকৃত বিশ্ব, হৃদাকাশে মানবের
বিরাজে নক্ষত্র যথা চন্দ্র—সূর্য্য—গ্রহতারা
নরচিত্তবৃত্তিরূপে ধরি বহুবিধরূপ।
যথা কভু বহে বায়ু মলয় পবনরূপে
কভু প্রভঞ্জনবেশে, উলটি পালটি বিশ্ব।
ক্রোধ যথা রুদ্ররূপে করে গুঁড়া গিরি-চূড়া
যথা বরুণ করুণারূপে করে সুশীতল
তপ্ত মেদিনী অবিরাম-বারিবরিষণে।

যথা ষড়্ ঋতু সদা ষড়্ মিত্রামিত্ররূপে
মানবের ভাগ্যলিপি রচে বহুবিধরূপে।

(২)

চল দেবি যাই মোরা কল্পনায় দিব্যরথে
অতীতের ক্রোড়স্থিত কৈলাসে মানসে তথা
অযোধ্যানগরে অঙ্গ-বঙ্গ-মিথিলা-মগধে
কলিঙ্গ-সৌরাষ্ট্র-কাশী কাঞ্চি কিষ্কিন্ধ্যা কেরলে
বিন্ধ্যদেশ জনস্থান লঙ্কা মথুরা প্রয়াগে
পঞ্চবটী চিত্রকূট কেকয়—পহ্লবদেশে
আর যত জনপদে সুবিখ্যাত এ ভারতে।

(৩)

চল দেবি! যাই মোরা তমসা তটিনী তটে—
যথা তব বরপুত্র রত্নাকর রত্নাকর
মহর্ষি বাল্মীকি তপোবলে বিধূত-কল্মষ
তব কৃপাবলে দেবি লভি দুর্লভ শকতি
রচেন নারদাদেশে আদিকাব্য রামায়ণ
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক, যাহা থাকিবে জগতে
যাবৎ থাকিবে গিরি, যাবৎ বহিবে নদী
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর উঠিবে অনন্তাম্বরে।

প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্।

(লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃষ্ণা। অজ্জউত্ত! সয়ং জ্জেব দাব অহং এদস্সিং অথে নিচ্চং অহি উজ্জা সম্পাদং উণ অজ্জউত্তস্স অণ্ণাএ ব্রহ্মাণ্ড কোড়ী হিং পি ণ মে উ অরং পূর ইস্সদি। *

* আর্য্যপুত্র স্বয়মেব তাবদহ মেতস্মিন্নর্থে নিত্যমভি যুক্তা সাম্প্রতং পুনরার্য্যপুত্রাজ্ঞয়া ব্রহ্মাণ্ড কোটিভিরপি নমে উদরং পূরয়িষ্যতি।

তৃষ্ণা। আর্য্যপুত্র! স্বয়ংই আমি এ বিষয়ে নিত্য নিযুক্তা আছি, তারপর আবার আর্য্যপুত্রের আজ্ঞা, এখন আর কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদর পূর্ণ হবে না।

ক্রোধঃ। হিংসে। ইতস্তাবৎ।

হিংসে। এদিকে এস (হিংসার প্রবেশ)

প্রবিশ্যহিংসা। অজ্জউত্ত! ইয়ম্হি আণবেছ অজ্জ উত্তো। ✽

হিংসা। আর্য্যপুত্র! এই যে আমি, আদেশ করুন আর্য্যপুত্র।

ক্রোধঃ। প্রিয়ে! ত্বয়া সহধর্ম্মচারিণ্যা মাতাপিত্রাদি বধোঽপি মমেষৎ করএব। তথাহি;—

কেয়ং মাতাপিশাচী কইহসজনকো ভ্রাতরঃ কেতুকীটাঃ
বধ্যোঽয়ং বন্ধুবর্গঃ কুটিলাবিটস্থলচেষ্টিতাজ্ঞাতয়োঽমী
(হস্তৌনিষ্পীড্য)
আগর্ভং যাবদেষাং কুলমিদমখিলং নৈবনিষ্পেষয়ামি।
স্ফূর্জ্জন্তঃ ক্রোধ বহ্নের্দধতিবিরতিং তাবদঙ্গেস্ফুলিঙ্গাঃ
(অবলোক্য)

এষ স্বামী তদুপসর্পামঃ। (সর্ব্বে উপসৃত্য) জয়তি জয়তি দেব।

ক্রোধ। প্রিয়ে! তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, তোমার সহিত মিলিত হো'লে মাতৃবধ পিতৃবধও আমার কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

পরজবাহার কাওয়ালী।

প্রিয়ে পরশ করিলে তব অঙ্গ।
ব্রহ্মহত্যা আদি করি মনে হয় রঙ্গ॥
মা-বেটী পিশাচী হয়, বাবাত কিছুই না
ভ্রাতৃবন্ধু আদি হয় নগণ্য পতঙ্গ।
জ্ঞাতিবন্ধু বর্গ যত, কুটিল ধূর্ত্ত চেষ্টিত
পিশিয়া মারিতে মনে বড় হয় রঙ্গ।
(হস্তে হস্তে ঘর্ষণ করিয়া)
আগর্ভ সকল কুল না হইলে নিরমূল,
শীতল না হবে ক্রোধ-অনল স্ফুলিঙ্গ॥

✽ আর্য্যপুত্র! ইয়মস্মি আজ্ঞাপয়তু আর্য্যপুত্রঃ।

(সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া)

এইত মহারাজ, নিকটে যাওয়া যাক্ (নিকটে গিয়া সকলে) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা। (বিলোক্য) শ্রদ্ধায়াস্তনয়াশান্তি অস্মৎ কুলদ্বেষিণী সা ভবদ্ভির্নিগ্রাহ্যা। ইতি।

রাজা। (দৃষ্টি করিয়া) শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদের প্রতি বিদ্বেষিণী তোমরা তাহার নিগ্রহ কোর্‌বে।

সর্ব্বে। যথাদিশতি দেবঃ (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ)

সকলে। যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান)

মহা। শ্রদ্ধায়াস্তনয়া ইত্যুপক্ষেপেণ উপায়ান্তরমপি হৃদয় মারূঢ়ং, তথাহি,—শান্তির্নাম শ্রদ্ধাপরতন্ত্রা তৎ কেনাপ্যুপায়েন উপনিষৎ সকাশাৎ শ্রদ্ধাকর্ষণং কর্ত্তব্যং ততো মাতৃবিয়োগ দুঃখাদতি মৃদুতয়াশান্তি রূপরতা ভবিষ্যতি অথবাসীদন্তী বাহুচিরং বিরংস্যতি। শ্রদ্ধাকাকর্ষ্টুং মিথ্যাদৃষ্টিরেব বারবিলাসিনী পরং প্রগল্ভা তদস্মিন্‌বিষয়ে সৈবনিযুজ্যতাং (পার্শ্বতোহবলোক্য) বিভ্রমবতি! সত্বর মাহূয়তাং মিথ্যাদৃষ্টিঃ।

মহা। ওঃ! "শ্রদ্ধার কন্যা"—এই কথাটি বলায় আর একটি উপায় মনে হ'ল। শান্তি শ্রদ্ধাপরতন্ত্রা, সুতরাং কোন রকমে উপনিষদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাটা আকর্ষণ করে নিতে হবে, তাহ'লে কোমলস্বভাবা শান্তি মাতৃবিয়োগ দুঃখে অচিরেই মারা যাবে; আর যদি একান্তই মারা না যায়, তাহ'লে নিতান্তই অবসন্ন হোয়ে পড়্‌বে অথবা অনতিবিলম্বে পলায়ন কোর্‌বে, তাতে সন্দেহ নাই। [illegible]—ইত। এখন শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ কোর্‌তে কা-কে পাঠাই (চিন্তা করিয়া) ওঃ! বারবিলাসিনী মিথ্যা দৃষ্টি অত্যন্ত প্রগলভা, তাঁকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করা যাক্ (পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া) বিভ্রমবতি! মিথ্যা দৃষ্টিকে শীঘ্র ডেকে আন।

প্রবিশ্যবিভ্র। জংদেও আণবেদি।

(ইতি নিষ্ক্রম্য মিথ্যাদৃষ্ট্যা সহ প্রবিশতি)

(বিভ্রমবতির প্রবেশ)

বিভ্র। যে আজ্ঞা মহারাজ

---

* যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।

(প্রস্থান ও মিথ্যাদৃষ্টিসহ পুনঃ প্রবেশ)

মিথ্যা। সহি! চিরেণ দিট্‌ঠস্স মহারাঅস্সমহং কধং পেখ্‌খিস্সং ণংখু মহারাও উবালহিস্সদি। †

মিথ্যা। সখি! বহুকাল পরে আজ আমি কি কোরে মহারাজের মুখ দর্শন কোর্‌ব? বোধ হয় মহারাজ আমায় কতই তিরস্কার কোর্‌বেন।

বিভ্র। সহি! তুহ দংসণেণ মহারাও অপ্পাণংজ্জেব জই চেদিস্সদি তদো উবালহিস্সদি। *

সখি! তোমায় দেখে যদি মহারাজের চৈতন্য লোপ না হয় তবেত তিরস্কার কোর্‌বেন।

মিথ্যা। সহি! কীসং মং অলিঅং সোহগ্‌গং সম্ভাবিঅ বিলম্বেসি। *

সখি! আমার একটা মিথ্যা সৌভাগ্য কল্পনা কোরে কেন বিড়ম্বনা কোর্‌ছ?

বিভ্র। সহি! সম্পদংজ্জেব পেখ্‌খিস্সং তুহসোহগ্‌গস্স অলি অত্তণং অন্নচ্চ ঘুম্মাণং বিঅ পিঅ সহি এলো অনং পেখ্‌খামি তাকিং উণ পিঅ সহী এ উন্নিদাএ কারণম্? †

বিভ্র। সখি! তোমার সৌভাগ্যের সত্যাসত্য এখনই দেখা যাবে। যাক্ সে কথা, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। বলি সখি! তোমার চোখ ছুটি যেন ঘুর্‌ছে, আচ্ছা ভাই! তোমার রাতজাগার কারণটা কি?

মিথ্যা। সহি! এক বল্লহাও জাও ইত্থি আও হোন্তি তাণং বিনিদ্দা দুল্লহা কিং উণ অম্মাণং সঅলজণবল্লহাণং। ¶

মিথ্যা। সখি! যে সকল রমণী কেবল একটিমাত্র পতির সেবা করে তাদেরও নিদ্রা দুর্লভ হয়, আর আমরাত ভাই! বহু বল্লভা, আমাদের ঘুম হবে কি কো'রে?

---

† সখি! চিরেণ দৃষ্টস্য মহারাজস্য মুখং কথং প্রেক্ষিষ্যে নখলু মহারাজ উপালপ্স্যতে।

* সখি! তব দর্শনেন মহারাজ আত্মাসমেব যদিচেতিষ্যতিতদা উপালপ্স্যতে।

* সখি! কীদৃশং মাং অলীকং সৌভাগ্যং সম্ভাব্যবিড়ম্বয়সি

† সখি সাম্প্রতিমেবপ্রেক্ষিষ্যে তব সৌভাগ্যস্যালীকত্বং। অন্যচ্চ, ঘূর্ণমানমিব প্রিয়সখ্যালোচনং প্রেক্ষতৎকিং পুনঃ প্রিয়সখ্যা উন্নিদ্রায়াঃ কারণং?

¶ সখি! এক বল্লভায়া স্ত্রিয়ো ভবন্তি তাসামপি নিদ্রা দুর্লভা কিং পুনরস্মাকং সকল জনবল্লভানাং?

বিদূ । কে উণ পিঅ সহিএ বল্লহা । ¶

কে কে প্রিয় সখীর বল্লভ ?

মিথ্যা । মহারাও জদো উবপি কামো, কোহো, লোহো, অধবা অলং বিসেসেণ এথউলে জে জাদা তেজ্জের হিঅঅ নিহিদাএ মএ অহিরমেন্তি মএ বিণা বালো জুআথবিরোবাণচিঠ্‌টদি । ¶

মিথ্যা । মহারাজ, কাম, ক্রোধ, লোভ, অথবা নাম ধরে ধরেই বা আর কয়টির কথা বোল্‌ব ? এ কুলে যে যে জন্মেছে সকলেই আমাকে হৃদয়ে লয়ে রমণ করে । কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, এ বংশের কেহই মুহূর্ত্তের জন্তেও আমায় ছেড়ে থাকে না ।

(ক্রমশঃ)



সংবাদ ও মন্তব্য ।

বাঙ্গালীসমাজে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ।

দিনাজপুরের এক ভদ্রসন্তান স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করে । সে পূর্ব্ব হইতেই প্রথমা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিত । কিন্তু সম্প্রতি উক্ত ভদ্রসন্তান অবলা গৃহলক্ষ্মীর পৃষ্ঠদেশে উত্তপ্ত লৌহদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া দগ্ধস্থানে লঙ্কাবাটার প্রলেপ দিয়াছে । বধূর শ্বশুর শাশুড়ী গুণধর পুত্রের কার্য্যে বরাবর উৎসাহ দিয়াছেন । পুলিশ এই ঘটনার সন্ধান পাইয়া স্বামীকে চালান দিয়াছে । এডুকেশন গেজেট ।

বাঙ্গালায় মেয়েদের আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে, শাশুড়ীদের দুর্ব্যবহারের জন্য ।—পঞ্চায়েৎ । দিনাজপুরেও এক বধূ নির্য্যাতনের মামলা দায়ের হইয়াছে । এবার এই তৃতীয় দফা ।—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদালতে দৌড়াদৌড়িতে এসব আপদ দূর হইবে না—অন্যদিক হইতে সায়েস্তা

¶ কে পুনঃ প্রিয়সখ্যা বল্লভাঃ ?

¶ মহারাজ অত উপরি, কামঃ, ক্রোধো, লোভঃ অথবা অলং বিশেষেণ অস্মকুলেযেজাতাস্তে হৃদয়নিহিতয়া ময়া অভিরমন্তে ময়া বিণাবালঃ স্থবিরো যুব। বা ন তিষ্ঠতি ॥

করা চাই—সমাজ দেহে তেমন শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে।—শঙ্খ। যে সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি এইরূপ অসম্মান ও অত্যাচার সেই সমাজের উন্নতি অসম্ভব।

গৌরীশঙ্কর অভিযান—

পৃথিবীর মধ্যে অন্য কেহই যাহা করিতে পারেন নাই, জেনারেল ব্রুস ও তাঁহার দল তাহাই করিয়াছেন। ইঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গিরিশৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের চূড়ায় পৌঁছিবার জন্য গত বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এইসকল অদম্য উৎসাহী পুরুষগণ ২৭,২০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। আর কিছুদূর যাইতে পারিলেই তাঁহারা বিজয়মাল্য পরিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এবৎসর তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে আগামী বৎসর তাঁহারা পুনরায় চেষ্টা করিবেন।

ধন্য এই ইংরাজজাতি। ইহাদের এইপ্রকার অদম্য উৎসাহ, দুর্জ্জয় সাহস এবং নির্ভীকতা আছে বলিয়াই ইহারা অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর। আর আমরা মুখে মুখে বক্তৃতা দিয়াই দেশ বড় করিতে চাই। ফাঁকি দিয়া যদি কোন জাতি বড় হইতে পারিত তাহা হইলে বোধ হয় আমরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জাতি হইতে পারিতাম।

স্বামীর প্রতি জাপানী স্ত্রীর অনুরোধ।

আমি যে সময় ঘুম থেকে উঠিব তোমারও সেই সময় উঠিতে হইবে। কোন ভদ্রলোক কিংবা পুত্রকন্যার সম্মুখে আমাকে গালি দিতে পারিবে না। যখন বাড়ী হইতে অনেক দিনের জন্য অনুপস্থিত হইবে, তখন আমাকে বলিয়া যাইবে কোথায় যাইতেছ।

যে কাজ তুমি নিজেই করিতে পার সেই কাজের জন্য আমাকে বিরক্ত করিও না।

পুত্রকন্যার সম্মুখে এমন কোন কাজ করিও না যাহাতে তাহারা খারাপ শিক্ষা পায়। আমার নিজের খরচের জন্য আমাকে আলাহিদা টাকা দিতে হইবে। লেখাপড়া করিবার জন্য প্রত্যহ আমাকে কিছু সময় দিতে হইবে। আমাকে "অরকরা" (এই-এদিকে আয়) বলিয়া ডাকিতে পারিবে না। আমি তোমার স্ত্রী এবং তোমার নিকট উপযুক্ত সম্মান পাইবার দাবী করি।

আমাদের গৃহিণীরা এইরকম অনুরোধ করিলে মন্দ হয় না।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৯ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড ৭ম সংখ্যা।	কার্ত্তিক।	১৩২৯ সাল। ১৮৪৪ শকাব্দাঃ

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্। *

লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশ্চন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ।

(১)

জ্যোৎস্নারাশিবিশোভিরম্যবসনা মেঘাদ্বিমুক্তস্ফুরৎ-
তারারাজিবিরাজিহারধবলা সৌদামিনীকাঞ্চিকা।
ফুল্লোল্লাস-সরোজরাশিললিতা কাশচ্ছলচ্চামরৈঃ
দুর্গাং স্তোতুমনাঃ সমাগতবতী সাধ্বীব কান্তা শরৎ ॥

(২)

খাতোত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গিমকুলব্যালোলমালোজ্জ্বলা
মাতৃপ্রেমগলৎ-সপঙ্কজ-জলৈ ক্ষৌমাম্বরে স্তা সতী।

* এই স্তোত্রটী আশ্বিন মাসের হিন্দু-পত্রিকা মুদ্রিত হইবার পরে আমাদের হস্তগত হয়; তজ্জন্য ইহা আশ্বিন মাসের পত্রিকায় মুদ্রিত করা যায় নাই। হিঃ সঃ

কর্ষেদ্দাম'কুমু'স্বনৈর্বদধতী নিশ্বপ্রসূ 'স্বাগতং'
হংসশ্রেণিরবৈঃ স্তুবীতি ঘটিনী বিশ্বেশ্বরীং তাং কিমু ?॥

(৩)

কৈলাসং নিলয়ং বিহায় গিরিজা মর্ত্ত্যাং ভুবং যাস্যতি
তস্মাদষ্টতনু নির্যোজয়তি কিং মুর্ত্তীঃশিবস্তৎকৃতে ।
ভূমীরম্যপথা সতী বিতনুতে পূজাং সরোজাদিভিঃ,
তৎস্নানায় জলং নিরাবিলমহো প্রেমদ্রবং কিং ভবেৎ ?॥

(৪)

অগ্নির্যাগ্রমনা নু হব্যবহনে যৎপূজনে তিষ্ঠতি,
মন্দং গন্ধবহো বহন্ সুনিয়তং স্নিগ্ধঃ সুগন্ধৈর্যুতঃ ।
ধূপীকর্ত্তুমনাঃ শ্রমং ব্যজয়তি ত্বাং তালপত্রৈঃ কিমু ?
মেঘমুক্তসুনির্ম্মলা চ তনুতে তারাঃ খমূর্ত্তিঃ করম্ ॥

(৫)

'আয়াহি দেবি ! কৃপয়া নিলয়ে তবৈব
নেহাস্তি কিঞ্চন তবার্চ্চনযোগ্যরূপম্ ।
যৎপূজনায় তনুতে যতনং সুবোধঃ
তত্রাপরাধ ময়ি নঃ শুভদে ! ক্ষমস্ব ।'

(৬)

ইত্থং নিবেদ্য চরণে জগদম্বিকায়াঃ
সংযম্য চেন্দ্রিয়গণং কৃতচিত্তশুদ্ধিঃ ।
আদায় পুষ্প-নিবহং স্বয়মাহৃতঞ্চ
ত্বৎ পূজনায় যততে যজমানমূর্ত্তিঃ ॥

(৭)

সোমোঽপ্যয়ং তব শুভাগমনং বধার্য্য
ফুল্লং করৈঃ কুমুদকৈরববৃন্দমস্থ ?।
আহৃত্য মেঘনিবহৈর্নির্মুক্তহৃষ্টঃ
পূর্ণোভবত্যনুদিনঞ্চ কলাকলাপৈঃ ॥

(৮)

সৌম্যায়নে নিজরুচাং খলু নিষ্প্রভত্বং
নিশ্চিত্য তীক্ষ্ণকিরণঃ স পুনস্তদাপ্ত্যৈ ।

ভূমীপথং খরকরৈ রপপঙ্করম্যং
কৃষ্টৈব তোষয়তি কিং জগদীশ্বরি ত্বাম্ ? ॥

(৯)

এহ্যেহি ত্বং জননি ! শুভদে ! ভারতং তে নিজস্বং
হাহাকারধ্বনিমুখরিতং সর্ব্বদা দুঃখমগ্নম্।
সান্দ্রানন্দং বিতর সুখদে ! ভারতে তাপদগ্ধে
শান্তির্ভূয়াদয়ি ! তব পদে শাশ্বতীভক্তিরস্ত !

(১০)

মাতর্দুর্গে ! চিরমিহ তব স্বাগতানন্দমুগ্ধাঃ
কিং বক্তব্যং কিমু তব পদে দেয়মেতন্ন বিদ্মঃ।
পত্রং পুষ্পং জলমুপহৃতং গৃহ্যতাং ভক্তিকল্পাং
ষট্ শক্রন্ নঃ শময় সুচিরং শান্তিদে। দেহি শান্তিম্ ।

(১১)

জ্ঞানিবৃন্দচিত্তচারি-রাজহংসরূপিকে—
অজ্ঞানদৈত্যখণ্ডকারি বোধখড়্গধারিকে ! ।
পাপতাপশান্তিকারিমুক্তিবারিদায়িকে !
এহি দেবি দেহি শর্ম্ম, রক্ষ দক্ষপুত্রিকে ! ॥



প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকম্।

লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

মহা। (বিলোক্য) প্রাগ্রেব প্রিয়তমা মিথ্যাদৃষ্টিঃ যা এষা ;—
শ্রোণীভারভরালসা দরগলন্মাল্যাপবৃত্তিচ্ছলা—
লীলোৎক্ষিপ্তভুজোপদর্শিতকুচোৎপীড়ান্নখাঙ্কাবলিঃ।
নীলেন্দীবরদামদীর্ঘতরয়াদৃষ্ট্যাধয়ন্তী মনো

দোরান্দোলন লোলকঙ্কণ ঝণৎকারোত্তরং সর্পতি ॥

মহা। (দর্শন কো'রে) এই যে প্রিয়তমা মিথ্যাদৃষ্টি যে,—

থিয়েটার সুর।

রাগিণী জঙ্গলা—খেমটা।

(ঐ দেখ) আস্‌চে মোর প্রাণপ্রিয়া কিবা ভঙ্গিমায়
বাহু লতিকায়, দুলিয়ে চলে যায়
ঝণ্ ঝণ্ ঝণ্ শব্দ কো'রে প্রাণটি কেড়ে লয় ॥
নীলপদ্ম প্রায় দীঘল আঁখিদ্বয়
চুপি চুপি আসি হৃদি মনটি হরে লয়
দুলিয়ে বাহুদ্বয়, যেন কি দেখায়
গলিত মালা পুন পরা ছলা কো'রে হায় ।
শ্রোণীগুরুতর তাহে গমন মন্থর
নাচি নাচি আসে যেন গজরাজ প্রায় ॥

মিথ্যা। (উপস্থত্য) জয়তু জয়তু মহারাও গ *

(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

মহা। প্রিয়ে!

দলিতকুচনখাঙ্কমঙ্কপানিং রচয় মমাঙ্ক মুপেত্যপীবরোরু!
অনুহর হরিণাক্ষি! শঙ্করাঙ্কস্থিতহিমশৈলসুতাবিলাসলক্ষ্মীং ॥

মিথ্যা। (সস্মিতং তথাকরোতি)

মহা। প্রিয়ে! অঙ্কে আরোহণ করি কর আলিঙ্গন।
শঙ্করাঙ্কবিহারিণী পার্ব্বতী যেমন ॥

মিথ্যা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া আলিঙ্গন)

মহা। (আলিঙ্গনসুখমভিনীয়) অহো! প্রিয়াপরিষ্বঙ্গাৎ পরাবৃত্তমিব নবযৌবনেন, তথাহি;—

যঃ প্রাগাসীদভিনববয়ো বিভ্রমা বাপ্তজন্মা
চিত্তোন্মাথী বিগতবিষয়োপপ্লবানন্দসান্দ্রঃ।
বৃত্তীরান্তস্তিবয়তি তবাশ্লেষজন্মাসকোঽপি
প্রৌঢ় প্রেমা নববরপুনর্ম্মান্মথো মে বিকারঃ ॥

---

* জয়তু জয়তু মহারাজ ॥

মহা। (আলিঙ্গন সুখাভিনয়) অহো! প্রিয়ার আলিঙ্গনে যেন নব-যৌবন ফিরে পেলাম ;—

প্রিয়ে! প্রথম-যৌবনে জন্ম হয়েছিল যার।
চিত্ত-প্রমথনকারী মন্মথ-বিকার॥
বিষয়-অভাবে পুন যাহা বৃদ্ধকালে।
লুক্কায়িত ছিল হায় চিত্ত-অন্তরালে॥
তব আলিঙ্গনে প্রিয়ে বর্দ্ধিত আকার।
ধারণ করিল পুন মন্মথ-বিকার॥

মিথ্যা। মহারাঅ! অহম্পি সাম্পদং ণবজ্জোবণা বব সম্বুত্তা ণংখু ভাবানুবন্ধো প্পেমো কালেবি বিহলেদি তা আণবেদু ভট্টা কিং ণিমিত্তং সুমরিদম্হি? ※

মিথ্যা। মহারাজ! আমিও যেন আজ নবযৌবন ফিরে পেলাম। ভাবানুবন্ধ কোনকালেই নষ্ট হয় না। মহারাজ আমাকে কি জন্য স্মরণ কোরেছেন আদেশ করুন॥

মহা। প্রিয়ে!

স্মর্য্যতে সহি বামোরু! স্থিতো যো হৃদয়াদ্বহিঃ।
মচ্চিত্তভিত্তৌ ভবতী শালভঞ্জীব রাজতে॥

মহা। প্রিয়ে!

হৃদয়-বাহিরে দেখ থাকে যেই জন।
তাহাকেই সবে প্রিয়ে! করে ত স্মরণ॥
হৃদয়ভিত্তিতে তুমি সকল সময়
রহিয়াছ চিত্রিত পুত্তলিকা প্রায়॥

মিথ্যা। মহাপ্পসাদো এ সো। †

মিথ্যা। এটি মহারাজের মহা অনুগ্রহ।

মহা। অন্যচ্চ দাস্যাঃ পুত্রী শ্রদ্ধা বিবেকেন সহ উপনিষদং যোজয়িতুং কুট্টিনী-ভাবমাপন্না, অতঃ ;—

প্রতিকূলামকুলজাং পাপাং পাপানুবর্ত্তিনীং।
কেশেষ্বাকৃষ্য তাং রণ্ডাং পাষণ্ডেষু নিযোজয়॥

※ মহারাজ! অহমপি সাম্প্রতং নবযৌবনেব সংবৃত্তা ন খলু ভাবানুবন্ধং প্রেম কালেঽপি বিঘটতে। তদাজ্ঞাপয়তু ভট্টারকঃ কিং নিমিত্তং স্মৃতাস্মি॥

† মহাপ্রসাদ এষঃ॥

মহা। দাসীর বেটী শ্রদ্ধা বিবেকের সহিত উপনিষদের মিলন কো'রতে কুট্‌নী-পানা কোরছে, অতএব —

আমাদের প্রতিকূলা পাপানুবর্ত্তিনী।
প্রতিপক্ষকুলে জাতা সে রাঁড়ী পাপিনী ॥
কেশে আকর্ষণ করি অচিরে তাহারে
পাষণ্ডে নিয়োগ কর বলিনু তোমারে ॥

মিথ্যা। এদ্দহ মেত্তে বিসএ অলং ভট্টুণো অহিং নিবেসেণ বঅণমেত্তকেণ জ্জেব ভট্টুণো সদ্ধা দাসীব্ব আণ্ণাং করিস্সদি। সাহু মএ মিচ্ছা ধম্মো মিচ্ছা মোক্খো সোক্খ বিগ্‌ঘ করাহং মিচ্ছা সত্থপ্পল বিদাইংত্তি ভণন্তী বেঅ মগ্‌গং জ্জেব পরিহরি স্সদি কিং উণ উ অনিসদং। অবি অ, বিসআণন্দ বিমুক্কে মোক্খে দোসং দংসঅন্তী এ মএ উ অনিসদো বিরত্তা করিজ্জই সদ্ধা। *

মিথ্যা। এই অতি সামান্য বিষয়ের জন্যে মহারাজের চিন্তা কোরবার কোনই প্রয়োজন নাই। এককথাতেই শ্রদ্ধা আপনার দাসীর ন্যায় আজ্ঞা পালন কোর্‌বে। উপনিষৎ ছাড়ান ত সামান্য কথা ;—"ধর্ম্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, শাস্ত্রের প্রলাপ বাক্য সকল সুখের বিঘ্ন করে"—সর্ব্বদা এইরূপ ব'লে ব'লে তাঁকে বেদমার্গই ছাড়াব এবং বিষয়ানন্দ-বিহীন মোক্ষে দোষ দেখিয়ে উপ-নিষদের প্রতি শ্রদ্ধাকে একান্তই বিরক্তা কোরে দেব।

মহা। যদ্যেবং সুষ্ঠু প্রিয়ং সম্পাদিতপ্রায়ং প্রিয়য়েতি (পুনরালিঙ্গ্যচুম্বতি)

মহা। আঃ!—তা হ'লেত আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদিত প্রায়ই বোল্‌তে হ'বে। (আলিঙ্গন ও চুম্বন)

মিথ্যা। ভট্টা প্পআসে এবং প্পউত্তেণ ভট্টিণা লজ্জেমি।

মিথ্যা। স্বামিন্! প্রকাশ্যে এরূপ করায় বিশেষ লজ্জা বোধ করি।

মহা। ভবতু বা সাগরং প্রবিশামঃ (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

মহা। তাহ'লে আর কি করা যায়, সাগরে প্রবেশ করি ॥ (সকলের প্রস্থান)

ইতি মহামোহপ্রধান নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

---

* এতাবন্মাত্রে বিষয়ে অলং ভর্ত্তুরভিনিবেশেন বচনমাত্রকেণৈব ভর্ত্তুঃ শ্রদ্ধা দাসীব আজ্ঞাং করিষ্যতি সাধ্বস্তু ময়া করণভূতয়া,—"মিথ্যা ধর্ম্মো মিথ্যা মোক্ষঃ সৌখ্যবিঘ্নকরাণি মিথ্যা শাস্ত্র প্রলপিতানীতি"—ভণ্যমাণা বেদমার্গ-মেব পরিহরিষ্যতি কিংপুন রুপনিষদং ॥ ইতি সং ॥

ভারত-জননী।

লেখক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাঞ্জিলাল।

(১)

নমো নমো ভারত-জননী।
স্বয়ং শৈল-কিরীটিনী, প্রকৃতির সোহাগিনী,
ব্যাস-বাল্মীকির জন্মভূমি ;
সাম-গান-মুখরিতা, কৃষ্ণ-পদ-পবিত্রিতা,
জগতের বর্ষ-কুল-রাণী,
নমো নমো ভারত-জননী।

(২)

পদ-তলে মহাসিন্ধু পাদ-প্রক্ষালনে রত,
মস্তকে মুকুটরূপে হিমালয় সমুন্নত ;
যমুনা-জাহ্নবী-আদি হার-রূপে শোভে হৃদি,
ভূলোকে গোলোকরূপা পুলকদায়িনী,
নমো নমো ভারত-জননী।

(৩)

নির্ম্মল আকাশে যাঁর উজল চাঁদিমা হাসে,
অসংখ্য হীরকখণ্ড তারারূপে পরকাশে,
দীপ্ত-দিবাকর-করে দিবা আলোকিত করে,
অন্নপূর্ণারূপে যিনি জগত-পালিনী ;
হরিত বরণ-ভাতি, রত্ন-গর্ভা ভগবতী,
ভূতলে অতুল ভূমি গৌরব-শালিনী,
নমো নমো ভারত-জননী।

(৪)

জগত-পালন বিষ্ণু রামরূপে অবতরি
পবিত্রিলা যাঁর দেহ কমল-লোচন হরি ;
যাঁর ভীমার্জ্জুন সম কোথা বীর-পরাক্রম ?
যাঁহার শঙ্কর-শুক জ্ঞানি-শিরোমণি,
প্রতাপসিংহের ধাত্রী, শিবাজীর স্তন্যদাত্রী,
হে মোর জননি,

তব যশোগাথা গাই হেন শক্তি মোর নাই,
জগতে মহিমময়ী মুকতি-দায়িনী,
নমো নমো ভারত-জননী।

(৫)

জগতের জনগণ নগ্নদেহে যেইকালে
আমমাংসে নিবারণ করিত জঠরানলে,
সে কালে সন্তান তব আর্য্যবংশ-সমুদ্ভব
অরণ্যে করিত বসি ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ,
গাইত সানন্দ-চিত্তে বেদগাথা সনাতন।
সভ্যতার লীলাভূমি গভীর জ্ঞানের খনি
হে মোর জননি,
কালিদাস-ভবভূতি-কূজিত যে ভূমি,
অতুল-ঐশ্বর্য্যময়ী শকতি-রূপিণি
অমল-শ্যামল-কান্তি চিত্ত-বিনোদিনী
নমো নমো ভারত-জননী।

(৬)

পুণ্যবতী হে জননি, তব পুণ্য-সীমা নাই,
আপনি গোলোক-নাথ জনমিলা তব ঠাঁই ;
শাক্যসিংহ-লীলাভূমি, চৈতন্য-জননী তুমি ;
শৌর্য্যবীর্য্য ব্রহ্মচর্য্য শিখাইতে মানবেরে
তব দেহে ভীষ্মদেব জনমিলা নরাকারে।
পরশিতে তব কায়া, ছাড়ি স্বর্লোক-মায়া
অবতীর্ণা সুরধুনী পতিত-পাবনী ;
ধর্ম্মভূমি কর্ম্মভূমি, জগত-বন্দিতা তুমি,
দর্শনের পুণ্যালোকে সদা আলোকিনী ;
হে দেব-রূপিণি,
গৌরব-সৌরভে তব বসুন্ধরা আমোদিনী,
সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী, আত্মবোধ-বিকাশিনী,
সতী-সীতা-সাবিত্রীর জনমদায়িনী,
নমো নমো ভারত-জননী।

উপনিষৎ।

লেখক—সম্পাদক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং শৃণুয়াৎ, কেন কমভিবদেৎ, কেন কং মন্বীয়াৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।

যে স্থানে দ্বৈতভাব থাকে, সেই স্থানেই একজনে অন্যের ঘ্রাণ লয়, একজন অন্যকে দর্শন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, জানে; যে স্থানে দ্বৈতভাব না থাকে অর্থাৎ বিশ্বই ব্রহ্মময় জ্ঞান হয়, সে স্থলে কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে শ্রবণ বা মনন করে, বা জানে? যাহা দ্বারা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ জানা যায়, সেই পরব্রহ্মকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে? যিনি বিজ্ঞাতা তাঁহাকে আর কিরূপে জানিবে!

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

শঙ্করস্বামী বলেন যে, 'বিষয়' আর 'বিষয়ী' বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, একে অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। 'বিষয়' কখন 'বিষয়ী' হইতে পারে না, কিম্বা 'বিষয়ী' কখন 'বিষয়' হইতে পারে না। একটি পদের কর্ত্তা কখন কর্ম্ম হইতে পারে না, কিম্বা কর্ম্ম কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। কর্ত্তা চিরকালই কর্ত্তা, কর্ম্ম চিরকালই কর্ম্ম; একে কখন অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। "এই শরীর এবং নামরূপধারী তাবৎ বিশ্ব আমার বহির্ভাগে, আমি উহা নহি। তাহারা বিষয়, আমি বিষয়ী; তাহারা কর্ম্ম, আমি কর্ত্তা; তাহারা জ্ঞাত, আমি জ্ঞাতা, তাহারা, "তুমি", আমি "আমি"। 'আমি', "আমি" ভিন্ন তাবৎ নামরূপধারী বিশ্বকে জানিতে পারে, বিষয়ী বিষয়কে জানিতে পারে, জ্ঞাতা জ্ঞাতকে জানিতে পারে, কিন্তু "আমি" "আমি"কে কিরূপে জানিবে? বিষয়ী—বিষয়, আমি—তুমি, জ্ঞাতা—জ্ঞাত বা অস্মৎ—যুষ্মৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। এই বিষয়ী চিদাত্মাতে বিষয়-ধর্ম্ম আরোপকে অধ্যাস বলে। একজন পূর্ব্বে রৌপ্য দেখিয়াছে, রৌপ্যের কতকগুলি গুণ তাহার স্মৃতিপটে আছে; সে ব্যক্তি পরে

শুক্তিকা দেখিয়া 'উহা রৌপ্য' জ্ঞান করিল, অর্থাৎ রৌপ্যের গুণ শুক্তিকায় আরোপ করিল, ইহাকেই অধ্যাস বলে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা বা মায়াহেতু এইরূপ ভ্রম হয়। এই ভ্রম-হেতুই বিষয়ী বা শরীরীকে বিষয় বা শরীর বলিয়া জ্ঞান হয়—সাক্ষী বা জ্ঞাতাস্বরূপ বিষয়ী আত্মাকে বিষয় বলিয়া জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ "আমি" কেবল "আমি" হইতে পারে, "আমি" কেবল "আমির" সত্তা বুঝিতে পারে, "আমি" "আমি"কে জানিতে পারে না। "আমি" কেবল "আমি" ভিন্ন তাবৎ বস্তু জানিতে পারে, কিন্তু "আমি"কে জানিতে পারে না। "আমি" "আমি"কে জানিলেই, "আমি" "আমি" থাকিল না, উহা "তুমি" বা "যুষ্মৎ" হইয়া গেল, বিষয়ী বিষয় হইয়া গেল, কর্ত্তা কর্ম্ম হইয়া গেল, সুতরাং অনুপপত্তি হইল। কিন্তু যদি চ বিষয়ী কখন বিষয়-ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না, তথাপি ভ্রমবশতঃ "আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, অহমিদং মমেদং, আমি এইরূপ ইহা আমার ইত্যাদি" মিথ্যাজ্ঞানের কথা সংসারে শুনা যায়। উহা মায়া বা অবিদ্যাহেতু যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলা হয়। এই অধ্যাস দূর করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য।

এই যে আমি তোমাকে দেখিতেছি, আমি তোমার কি দেখিতেছি? তোমার হস্ত, পদ, মুখ ইত্যাদি, তোমার শরীর, বিষয় মাত্র দেখিতেছি। তোমার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি দেখিতেছি, উহাও বিষয়। ইহার একটিও বিষয়ী নহে। তোমার প্রকৃত "আমি"কে আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যাহা কিছু উপলব্ধি করিতেছি, উহা সগুণ, মায়া বা উপাধিবিশিষ্ট "আমি"। তোমার প্রকৃত বা নির্গুণ "আমি" একই, উহাতে স্বগত, সজাতীয় বা বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। একই সূর্য্য যেমন বারিধিপৃষ্ঠে তরঙ্গসংযোগে বিবিধ দৃষ্ট হয়, তেমনি একই "আমি" একই বিষয়ী, মায়া-সংযোগে বিভিন্ন "আমি" রূপে প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। আমার "আমি", তোমার "আমি", তাহার "আমি", সকলের "আমি"ই এক, ঐ তরঙ্গের ও এই তরঙ্গের এবং সকল তরঙ্গের সূর্য্যই যে এক, তাহাই উপনিষৎ বা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। যে "আমি"কে দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছিন্ন মনে করা হয়, সেই আমি যে দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছিন্ন নয়, তাহাই উপনিষদে নানাবিধ যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "আমিত্বের প্রসার"ই বেদান্তের উদ্দেশ্য। তোমার সগুণ "আমি" ও আমার সগুণ "আমি"র মধ্যে সজাতীয় ভেদ আছে, কিন্তু তোমার নির্গুণ "আমি" ও আমার নির্গুণ "আমি"তে উহা নাই।

সূর্য্য যেরূপ স্বীয় কিরণ দ্বারাই প্রকাশমান, তাহার অস্তিত্ব-জ্ঞাপনের জন্য বাহ্য কিরণের আবশ্যক নাই, তদ্রূপ "আমি" ও "আমি দ্বারা" প্রকাশমান। আমরা "আমি" হইতে পারি, কিন্তু প্রকৃত 'আমি'কে জানিতে পারি না। যাহা জানি, তাহা সগুণ "আমি"। ঐ গুণের অভ্যন্তরে যে "আমি" তাহা হওয়া যায়, জানা যায় না, ইহাই উপনিষদের মর্ম্ম। ঐ "আমি"কে 'ইহা নয়, উহা নয়' এইরূপে "অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা," বর্ণনা করা যায়। বিষয়ান্তর্গত তাবৎ বস্তু "আমি" নহে, এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে।

স এষ নেতিনেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানু-শাসনাঽসি।

বৃহদারণ্যক।

তাঁহাকে কেবল "না" বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, তিনি অগ্রাহ্য, অক্ষয়, অসক্ত, বর্ণ এবং বেদনারহিত। জ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইতে পারে? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন।

জ্ঞানে ত্রিবিধ পদার্থের প্রকাশ থাকে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান। যদি কেহ বলেন 'আমি ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছি,' বুঝিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হন নাই। কারণ ঐ জ্ঞানে 'আমি' পদ দ্বারা 'জ্ঞাতা'র, 'ব্রহ্মকে' পদ দ্বারা 'জ্ঞেয়ের' এবং 'অবগত হইয়াছি' পদ দ্বারা "জ্ঞানের" প্রতিপাদন হয়। যতক্ষণ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার একত্ব-প্রতিভাস না হয়, ততক্ষণ সাধক ত্রিপুটীভেদের রাজ্যে বিদ্যমান থাকেন। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান নির্ব্বিকল্পক, তাহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীভেদ থাকে না। জ্ঞাতা জীব, যখন নিজেকে জ্ঞেয় বা ব্রহ্ম বলিয়া বুঝেন এবং জ্ঞানকে আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করেন, তখন ত্রিপুটী-ভঙ্গ হয় অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একত্ব প্রতীত হয়; তখন আর কে কাহাকে জানিবে? তখন সকলই একত্ববোধে পর্য্যবসিত হয়, দ্বৈতবোধ থাকে না। এই উচ্চতম মহান্ একত্ববোধ উপনিষদের প্রতিপাদ্য। যখন সকলেরই এই একত্বজ্ঞানে পরিনিষ্ঠা, তখন একত্বজ্ঞানে উপনীত হওয়াই জীবের চরম ও পরম প্রার্থনীয়। এস্থানে উপনীত হইলে অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অমৃতত্ব লাভ করা যায়। অজ্ঞান-কল্পিত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এখানেই কৃতকৃত্যতা।

এই পরব্রহ্ম-বিজ্ঞান বা ব্রহ্মভাব-লাভের প্রণালী উপনিষদে বর্ণিত আছে। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদিসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইলে তবে উপনিষদে বা আত্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে। কোন্ পদার্থ নিত্য, কোন্ পদার্থ অনিত্য, ইহা স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য নিত্য, অন্য সমস্ত পরমার্থতঃ অসত্য অনিত্য, ইহা বুঝিতে হইবে। সংসারের অনিত্যতা অসত্যতা স্থির করিয়া ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ ফলভোগ-কামনা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। শম (ইন্দ্রিয়সংযম) দম (মনঃসংযম) প্রভৃতি লাভ করিতে হইবে। অসার অনিত্য সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য একান্তভাবে কৃতনিশ্চয় হইতে হইবে। পরে আত্মবিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারে উপনীত হইতে হইবে। কিরূপে অসৎ অতিক্রম করিয়া সৎস্বরূপে পৌঁছা যায়, কিরূপে তমঃ অতিক্রম করিয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করা যায়, কিরূপে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা উপনিষৎ-শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের উপায় উপনিষৎ। সকল উপনিষদেই এই তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। সংসার-বন্ধ-মোক্ষ, ব্রহ্মভাব-লাভ—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপতাপ্রাপ্তি সমস্ত উপনিষদে নানা প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

স্বর্গ-সিংহাসন।

লেখক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইন্দ্র—পঞ্চশর,

শুনে সুখী হইলাম বচন তোমার!
পুরস্কার—বাসবের সহ একাসন
অমর সভায়।
যাত্রার প্রাক্‌কালে
তুলিয়া পঞ্চমতানে সুরের মূর্চ্ছনা,
হে মেনকা—হে উর্ব্বশী—

হে সঙ্গীত-কলাশিল্প-
শারীর-রূপিণী
কর মুগ্ধ বাসবের শ্রবণ-যুগল।

(উর্ব্বশী ও মেনকার গীত)

ওগো মোর নাহি কোন পরিচয়
কি যে আমি বলিতে না পারি,
এই জানি ওগো! এই জানি শুধু
এ জগতে আমি শুধু নারী।
রক্ত মাংসে গড়া মোদেরো শরীর
এও যাচে ওগো পিপাসার নীর
ভোগের কেবলি নয় উপাদান
যায় না শুধু এ যেন হারি'।

(সকলের প্রস্থান)

(বিজয়ের পুনঃ প্রবেশ)

বিজয়—একি হ'ল? দেবরাজ চেলেন স্ফূর্ত্তির গান—আর এরা তুল্‌ল—বিষাদের সুর। লাগিয়েছিল ভাল। জমেও আস্‌ছিল বেশ! কিন্তু তবু যেন বিষাদ-রাগিণীর এ সুর সংযোজন কেমন একটা অবসাদ টেনে আন্‌ছে। হঠাৎ সকলে মাথা নীচু করে চলে গেলেন—খোঁজ নিতে হ'ল—ব্যাপার কতদূর গিয়ে গড়ায়।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মা উপবিষ্ট।

(গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ।)

সত্য নিত্য মুক্ত সনাতন!
জয় প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
ওঙ্কাররূপী জয় প্রণব-শাসক
জয়—চিত মুরতিধর ভুবন পালক
জয়—অনন্ত জ্ঞান চয়
হে রাজস বান্ধব

প্রসীদ প্রসীদ আমি দীন হীন আকিঞ্চন।
ব্রহ্মা—এস এস দেবর্ষি-প্রবর
কোন্ প্রয়োজনে আসিয়াছ আজি
পবিত্রিতে ব্রহ্মালোক
বৈষ্ণবের পদধূলি দানে।
নারদ—পিতঃ, কোন্ দোষে বল তব পদে
অপরাধী এ দীন তনয় ?
ব্রহ্মা—কেন—কেন হেন কথা বলিছ আমায়
বুঝিতে সমর্থ নহি ভাষার্থ ইহার।
নারদ—পুত্র প্রতি কেন হেন পরিহাস-বাণী
করিলে প্রয়োগ তাত ?
লাগে বড় বিসদৃশ হেন আচরণ
তনয়ের বক্ষঃ-দেশে তব।
আমি মাত্র তনয় তোমার ;
তুমি পিতা মহাগুরু মম।
উপচার—সম্মানের পদ
তব দাবী আমার সমীপে।
আমি নাহি চাহি কভু
সম্মানের বাণী।
ওযে ঘোর অকল্যাণ
মূর্ত্তিমান অভিশাপরূপী।
ব্রহ্মা—হে মহাবৈষ্ণব,
অভিমান করো নাক' ইথে।
এ সম্মান প্রাপ্য নহে তব।
যে সম্মান করিয়াছি প্রদর্শন
প্রাপ্য তাহা তব
অন্তরের মহাপুরুষের।
তাই বলি—
আমায় দেখান' এই সৌজন্যের তরে
প্রয়োজন নাহিক তোমার।

শুধু মাত্র দরকার
ভিতরের তব মহামানবের।
নারদ—হে দয়াল বিশ্বপিতা
বুঝিতে পারে না এ দীন সন্তান
দয়ার অপূর্ব্ব লীলা তব।
ব্রহ্মা—হে ধীমান,
কি আমার দয়ার অপূর্ব্ব লীলা
তুমিও সমর্থ নহ বুঝিতে যে সব?
নারদ—কেমনে বুঝিব সব—
হে শিল্পি, শিল্পের তব নবীন সাধনা?
এ কি শুধু সৌন্দর্য্যের রস-প্রদর্শন?
শুধু কি কৌশল ইহা রচনা-নীতির?
প্রাণের কি নাহি সাড়া কোন স্থানে?
যে দিকে যখন চাহি আঁখি মেলি'
দেখি যেন প্রাণহীন সব;—
শবের মতন রয়েছে পড়িয়া!
আত্মা সব গেছে চলে কোন দূরলোকে।
শাপের খোলস মত আছে শুধু পড়ে
জড়প্রায় জীবদেহ যত।
বলে দেয় জগতের—
অন্তরের কাণায় কাণায়
মায়াময় মিথ্যা প্রহেলিকা
কুহেলি-জড়িত।
ব্রহ্মা—হাসি পায় মনে—হে নারদ,
কি দেখিলে তুমি মম বিশ্ব-রচনায়
রিক্ত লিপি-কুশলতা।
যা'তে তব অন্তরের সে মহাপুরুষ
ফুকারি' উঠিল কেঁদে।
বুঝাইয়া নাহি দিলে
বুঝিতে পারি নে—

ভাষার এ হেঁয়ালি তোমার!
নারদ—দেব, ভাষার এ নহেত' হেঁয়ালি।
দেখুন চাহিয়া—
মংসরী সংযম-শূন্য দেব পুরন্দর
আজি সে অমরপতি ত্রিদিব-ঈশ্বর।
আর শান্ত শুদ্ধ পবিত্র-হৃদয় ত্বষ্টা
আজ হ'বে ব্রত-ভঙ্গ তা'র।
ব্রহ্মা—পাপভার পূর্ণ হ'লে পরে
পতন নিশ্চয় হ'বে তার।
তখন, নাহিক ক্ষমতা কারো
রক্ষা তা'রে করিতে জগতে।
যতদিন থাকে পুণ্য-জোর
ততদিন পাপ সয়ে যায়।
পূর্ণ পাপে দেবেন্দ্রেরও পতন নিশ্চয়।
জেনো সব প্রাক্তনের ফল।
পূর্ব্বার্জ্জিত শুভাশুভ
সিদ্ধি কিম্বা ধ্বংস আনে টেনে।
নাহি ইথে পক্ষপাত পরম পিতার।
ভুল বুঝে—
কারো নাক' বিশ্বে কভু ভুলের বিস্তার।
নারদ—ভুল—সবি ভুল দেব!
দেখি চেয়ে—
এ সুন্দর বিশ্ব মাত্র ভুলের নিবাস।
সেই শুধু মায়া মোহ দানে
রেখেছে ভুলিয়ে সবে।
ব্রহ্মা—মিথ্যা ক্ষিপ্ত হ'য়ো না নারদ,
দেবেন্দ্রের প্রাক্তনের ফল যাহা
অবশ্য ভুগিতে হবে তাঁরে।
ত্বষ্টাও লভিবে নিজ কর্ম্মোচিত ফল।
এই বিশ্ব মাঝে

কেহ কারো ইষ্টানিষ্ট
করিতে সমর্থ নহে।
তবে সব কাজে হ'য়ে থাকে
একজন নিমিত্তের ভাগী।

নারদ—ভাল প্রভু!
কিন্তু এ'কি ইচ্ছা করিছ প্রকট,
কহ দেখি ইচ্ছাময়!
জগতের কোন্ শুভ ফল
সংসাধিত হ'বে ইথে।

ব্রহ্মা—চেওনা জানিতে ফল আগে—
দেখে গিয়ে কার্য্য কর,
অনুমানি' ফল তার ;
অবশ্য কার্য্যের শেষে
চরমে চরম ফল পারিবে জানিতে।

নারদ—যথা আজ্ঞা
চলিলাম প্রভু!
বারান্তরে অবসর মত
হেরিতে বাসনা র'ল শ্রীচরণ।
ত্বষ্টার সাধনার পরিণতি
দেখিতে উৎসুক বড় অন্তর আমার।
চলিলাম নৈমিষ কাননে।
(পূর্ব্বের গীতটি গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—তপোবন।

(ত্বষ্টা তপস্যায় নিযুক্ত।
দূরে পবন ও মদন দণ্ডায়মান।
মেনকা ও উর্ব্বশীর গীত।)

বইছে ঐ ফুর্‌ফুরে হাওয়া

এমন সময় খালি বুকে
যায় কি কোথাও বাওয়া।
সারা বিশ্ব প্রেমে মগন
বক্ষে ধরে বুকের রতন
এ সময়ে যেমন তেমন
থাক্‌বে শুধু লোকে কাছে
বাঁকি আমার পাওয়া।

ঘণ্টা—(সবিস্ময়ে) এ কি?
একি হেরি সব
মায়াময় মিথ্যা প্রলোভন।
কোথা' হ'তে ভেসে আসে নূপুর-শিঞ্জন?
কোথা' হ'তে কে গাহিছে
হেন অপরূপ প্রাণোন্মাদি গান?
এই কি গো বিভূতি-সঞ্চার?
এরেই কি সাধনার অন্তরায়
ভাবি' মুনিগণ
যত্ন সহকারে করিতেন পরিহার।
বিভূতি! বিভূতি!
তুমি সাধারণ বেশে
কেশ-স্পর্শ করিতেও পারিবে না মোর।
(পুনরায় মেনকা উর্ব্বশীর গীত)
চোখ বুঁজে কি দেখ্‌ছ যোগী
চোখ বুঁজলে কি ফল হয়।
ভেক নিও না দিক্‌ করো না
তাই করো যা' রয় স'য়।
রসতত্ত্ব সে অপার তত্ত্বে
মোক্ষ পাবে চিত্তরে,
রসে যে ফুল আপনি ফোটে
ভ্রমর মাতে গুঞ্জনে।
আহা তুমি রিয়েছ ভুলে

হের বারেক চোখটি খুলে
আঁখি ও যার বন্ধ থাকে
কিছু নয় তার কেউ নয় ॥

পবন—মীনধ্বজ, এই সমুচিত অবসর
শরের সন্ধানে তব।
করো না করো না দেরি আর ॥
বিলম্বে কার্য্যের হানি।

কাম—এই সুযোগের অপেক্ষায়
আমিও রয়েছি বসি'।
স্থান কাল পাত্রের
ঠিক যদি নাহি হয় সমাবেশ,
কার্য্য হয় বিফল জগতে।
নাহি ভয়
দেব কার্য্য অবশ্যই হইবে সাধন।

(শরত্যাগ)

(পুনঃ গীত)

বহ ধীরে বহ ধীরে বসন্ত বাতাস।
বাজ্‌বে যোগীর বক্ষে ভীষণ
ফেল নাক' শ্বাস।
চায় না যে জন চক্ষু মেলে
তা'র সেবাতে কি সুখ পেলে
বক্ষ ভরা দাগা সে ত'
দীর্ঘ হা-হুতাশ।

(ক্রমশঃ)

পল্লী ও সহর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত কবিরত্ন।)

ভাঙ্গা গড়া ভগবানের খেলা। নদীর এক কূল ভাঙ্গে, অপর কূলে চরা পড়ে। অত্যুচ্চ পর্ব্বত সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হয়; গভীর সাগরতলস্থ ভূমি দ্বীপাকারে উত্থিত হইয়া, মানবের আবাসভূমি হইয়া, নগর উপবন সৌধমালায় শোভিত হয়। অল্প অনুসন্ধানে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এ সকল ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সংসাধিত হয়। "তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়।" এ কেবল ঈশ্বরেরই হাত। ভগবান মনুষ্যকে ঈদৃশ কোন ক্ষমতা অর্পণ করেন নাই। ঈশ্বর মনুষ্যকে সুখ দুঃখ সৃষ্টির এবং হ্রাস বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি ক্ষমতা দিয়াছেন,—যদিও তাহার ফলদাতা ঈশ্বর, তথাপি মনুষ্যকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া তদনুসারে কার্য্যকরী শক্তি দিয়াছেন, মানুষ তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপন আপন দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারেন। যদিও ইহার মূলে ঈশ্বর কর্ত্তা, তথাপি মানুষের চেষ্টা ভিন্ন ইহা সম্পন্ন হয় না।

আমরা বহুদিন হইতে বঙ্গের পল্লীগুলির ক্রমাবনতি এবং সহরের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবনা উপলক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলাম। আমরা সহরের উন্নতিকামী এবং পল্লীর অবনতির জন্য দুঃখিত। ভূমিই জগতের সমস্ত উন্নতির প্রসূতি। পৃথিবীতে মনুষ্য-বসতিস্থানের ভূমি-অংশ সহর অপেক্ষা পল্লীতেই অধিক এবং অবশিষ্ট স্থানও পল্লীবাসী দ্বারাই ব্যবহৃত হইয়া মানবসমাজের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে। চিন্তাশীল মাত্রেই ইহা অনুভব করিতে পারিবেন।

বঙ্গের পল্লী একদিন দৃশ্যে মনোহর এবং বাসে অতি সুখকর ছিল। তখনও বঙ্গ সহর শূন্য ছিল না। তখনকার সহরের পরিবর্ত্তে এখন নূতন নূতন সহর হইয়াছে, কিন্তু পল্লীগুলি এখন জন মানবের বাসের অযোগ্য হইয়াছে। ক্ষুদ্র জমিদার, তালুকদার, মহাজন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কৃষক শ্রেণী ইহারাই পল্লীর অধিবাসী। পূর্ব্বে সহরে অতি অল্প জমিদারদিগেরই পৃথক বাসভবন থাকিত। যখন মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল তখন নাটোরের রাণী ভবানীর এবং কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরই মুর্শিদাবাদে পৃথক বাসভবন থাকার কথা শুনা যায়। তখন সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বঙ্গের অনেকেরই ক্ষেতে ধান, পুকুরে

মাছ, গোয়ালে গোরু, বাগানে তরকারি থাকিত। তখন সংসারে অন্ন-বস্ত্রের জন্য হাহাকার করিতে হইত না।

বঙ্গের পল্লীভবন তখন সংসারে বাসের শান্তি নিকেতন স্বরূপ ছিল। বঙ্গভূমির তাৎকালিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য স্মরণ করিলে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়া মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। পূর্ব্বে যে সকল নির্ম্মলজলে পরিপূর্ণ জলাশয় পল্লীর শোভা সম্পাদন করিয়া, পল্লিবাসীর, পথিক জনের, গো-মহিষাদি পশুগণের পিপাসা-নিবৃত্তি করিয়া স্বাস্থ্যবর্দ্ধন করিত, আজ সেই সকল দিঘী পুষ্করিণী ঘন-সন্নিবিষ্ট শৈবালজালে আচ্ছাদিত, পঙ্ক-পরিপূর্ণ হইয়া মেলেরিয়ার জন্মভূমি বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কোনটী শুষ্ক হইয়া লতাগুল্মে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। বহু-যত্নে, বহু-ব্যয়ে প্রস্তুত আম্র কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি সুস্বাদু যত্নলভ্য ফলের বাগানসকল আপাদ-মস্তক লতাজালে জড়িত হইয়া নিবিড় অরণ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, শৃগাল ব্যাঘ্র শ্বাপদকুলের বাসস্থান হইয়া পথিক জনের ভীতির কারণ হইয়াছে। যে সকল পল্লীগ্রামে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন জমিদার তালুকদারগণের বাসস্থান বাড়ী ইষ্টকালয় দেবমন্দিরশোভিত ছিল, বারমাস ক্রিয়া উপলক্ষ্যে লোক-যাতায়াত-কলরবে বাড়িটী মুখরিত থাকিত, বহু দরিদ্র অন্ন-বস্ত্র পাইয়া প্রতিপালিত হইয়াছে, আজ তাদৃশ বহু সংসার উৎসন্ন গিয়া ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গের অনেক পল্লীই পূর্ব্বে অবিরল বসতি ছিল, একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ী পর্য্যন্ত ব্যবধান কম ছিল, যে ব্যবধান ছিল তাহাও এখনকার মত জঙ্গলাবৃত ছিল না। গৃহস্থেরা ডাকাডাকি করিয়া পরস্পরের খবর লইতেন; এমন কি খাদ্য প্রস্তুত হইলে পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করিয়া আনন্দ ও স্বজনতা বৃদ্ধি করিতেন। এখন আর প্রায় পল্লীতেই পূর্ব্বমত ঘন বসতি নাই। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে প্রায় গৃহস্থভবনে পয়স্বিনী গাভী, হৃষ্ট-পুষ্ট গো-বৎস দৃষ্ট হইত। পর্ব্ববিশেষে কৃষকেরা স্ব স্ব বলবান বলীবর্দ্দ সকল সজ্জিত করিয়া সকলের নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের প্রতিযোগিতায় আপন আপন গোরুর শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিত। সে এক আমোদ উৎসবের দিন ছিল। তখন জনপদবাসীরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। গ্রামে কথকতা, যাত্রা, রামায়ণ, পাঁচালী, ত্রৈরাত্রিক আমোদ এখনকার মত রুচি-সম্মত না হইলেও তখনকার মত রুচিসঙ্গত ছিল। উৎসব আনন্দ দেশের নিত্য সহচর ছিল। পাঠশালার শিক্ষা এখনকার মত উচ্চ অঙ্গের না হইলেও তৎকালোপযোগী এবং সামান্য ব্যয়সাধ্য ছিল। তখন

গুরু মহাশয়ের নিকট হস্তলিপি, গণন অঙ্ক, হিসাব কষা যে রকম সহজে শিক্ষ হইত, এখন এম্ এস্ সি ক্লাশের ছাত্রও মুখে মুখে তত শীঘ্র উত্তর দিতে সম নহেন। পল্লীগ্রামে বারমাস ধনী মধ্যবিত্তের গৃহে কোন না কোন উৎসব থাকাতে গ্রামটী আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ থাকিত। দেউল, দোল, দুর্গোৎসব পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলকাজেই লোকে দুটী পাঁচটী বা ততোধিক— যাহার যেমন সাধ্য—লোক ভোজন করান যেন কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইত। এখন পল্লীগ্রাম হইতে সে ভাবটী এককালে উঠিয়া গিয়াছে। পল্লীই নাই, তার ভাব থাকিবে কি প্রকারে ?

আমরা প্রাচীন বঙ্গের পল্লীগ্রামের চিত্র যেটুকু বর্ণনা করিতে পারিলাম তাহা প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা ইহার কতকটা ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। এখন আর সে ভাবের কিছুই নাই ৫০। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যিনি কোন পল্লী পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্বপরিচিত স্থান বলিয়া কোন মতে চিনিতে পারিবেন না। অধিকাংশ পল্লীর এতই অধঃপতন হইয়াছে। এই প্রকার পতনের কারণ—ম্যালেরিয়া, পুষ্করা লাগা, দেশের জলবায়ু দূষিত হইয়া দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া ইত্যাদি নানা কারণে পল্লীবাসের অযোগ্যতা অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। স্থান বিশেষে ইহার কোন কোনটী সত্য হইতে পারে কিন্তু ইহাই সাধারণ কারণ নয়। বিশেষতঃ এই সকল কারণ নষ্ট করিয়া পল্লী ভাল করিবার উপায় আছে। সে উপায় দৃঢ়তার সহিত কোন স্থানে অবলম্বন করা হয় নাই। সাধারণতঃ ওলাউঠা সামরিক জ্বর দেশব্যাপী হইলে গভর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কোন থানায় কিছু কুইনিন বা কয়েকগণ্ডা কলেরাপিলসহ একজন ডাক্তার প্রেরণ করিলেন জঙ্গল কাটার নোটীশ জারি হইল, কিছুদিন এই প্রকার চলিল, কার্ত্তিকমাস পরে শীতের প্রারম্ভে ম্যালেরিয়ার তেজ একটু কম পড়িল ; শীতের প্রবল আক্রমণে জঙ্গলগুলি নিস্তেজ হইল, আমাদের পল্লী-উদ্ধার ও শেষ হইল। বঙ্গের অনেক পল্লীরই এখন প্রায় এই রকম অবস্থা।

আমরা অতি সংক্ষেপে সামান্য আকারে বঙ্গের বর্ত্তমান পল্লী সকলের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলাম। আমরা এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বঙ্গের পল্লীর অধঃপতনের প্রকৃত কারণ কি। আমাদের মনে হয়—প্রথম, বৈদেশিক শাসন যুগে আমাদের অভাব জন্য বিদেশ গমনের অপরিহার্য্যতা; দ্বিতীয়, বৈদেশিক সংস্পর্শে আমাদের রুচি ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে

ভারতের লোক সংখ্যা যত ছিল, এক্ষণ তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে। বঙ্গেও নানা উপলক্ষ্যে বিদেশী লোকের আমদানী অনেক হইয়া লোক-সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এই লোকবৃদ্ধি সহরেই অধিক হইয়াছে। বঙ্গদেশ—সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বিশেষণে যে বিশেষিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, একটুও মিথ্যা নয়। এখন যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, তেমনই বিদেশে রপ্তানিও অনেক বাড়িয়াছে। অপরদিকে পূর্ব্বাপেক্ষা শস্য বপনোপযোগী ভূমির পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে—বঙ্গদেশের জমাজমি অনেক উঠিত হইয়াছে; পূর্ব্বে নীলকরেরা যে সমস্ত জমিতে নীল বুনান করিতেন সেই সকল জমি বহুবিধ শস্য বপনোযোগী হইয়াছে। তথাপি লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাহুল্যে দেশের উৎপন্ন শস্যে দেশের লোকের সর্ব্বপ্রকারের ব্যয় কুলান ভার হইয়াছে। পূর্ব্ব তুলনায় লোকের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু আয় বৃদ্ধির অনুপাতে পাশ্চাত্য সংঘর্ষে ব্যয় অনেক বাড়িয়াছে। বিদেশে গমন করিয়া দু-পয়সা আনিতে না পারিলে অতি অল্প লোকেরই চলে। সুতরাং বিদেশ গমন আমাদের অপরিহার্য্য। সেই বিদেশ-গমনও ৩০ বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় আজ অনেক বাড়িয়াছে। এখন বিদেশ-গমন কেবল বঙ্গের বাহিরে ভারতে নয়। সুদূর জর্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান পর্য্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা ঈদৃশ বিদেশ গমনের পক্ষপাতী—বিরোধী নই; মূলে অর্থাগম চেষ্টা থাকিলেও দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা—জ্ঞান-সঞ্চয় অভিজ্ঞতা-লাভ এ বিদেশ গমনের ফল। ইহা এখন আবশ্যক হইয়াছে। এই বিদেশ গমন—তিনপ্রকার। এক, বঙ্গবাসীর জন্মপল্লী পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশের মধ্যে; দুই, পল্লী ত্যাগ করিয়া ভারতের মধ্যে। তিন, ভারতের বাহিরে ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে। এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই ত্রিবিধ বিদেশ গমনের দ্বারা ব্যক্তিগত উন্নতি এবং অর্থাগম যাহা হইতেছে, তদ্দ্বারা পল্লী পুষ্ট হইতেছে না; সহর পুষ্ট হইতেছে।

যেহেতু পল্লীবাসী যে সকল লোক শিক্ষালাভ অথবা অন্যবিধ উপার্জ্জন উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই পল্লীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। পল্লী জন্ম-ভূমির সন্তান যাঁহারা ভারত ত্যাগ করিয়া ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সিবিলিয়ান কি বারিষ্টার হইয়া কিম্বা চিকিৎসা বিভাগে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া অথবা শিল্প-

বিভাগে উচ্চপদ লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন পল্লী জন্ম-ভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া পৈতৃক ভদ্রাসন বাটীতে বসবাস করিয়া পল্লী-জননীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে যত্নবান হইয়াছেন? স্ব স্ব কর্ম্মোপলক্ষ্য অথবা সমশ্রেণীর সহবাস প্রয়োজনে সহরে বাস প্রয়োজন হইলেও জন্মভূমিতে—পৈতৃক বাস্তু-ভিটায় দ্বিতীয় বাসস্থান রক্ষা করিয়া জন্ম-ভূমি পল্লীর উন্নতির জন্য কয়জন মহাত্মা যত্নশীল হইয়াছেন। কোন কোন পল্লীতে এমন একজন শ্রেষ্ঠপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন যিনি যশো-মান-প্রতিপত্তি অর্থ সম্পদে ভারতের নক্ষত্র স্বরূপ,—বঙ্গ-পল্লীর ভাস্কর স্বরূপ; তাঁহার সেই দীপ্তির ২।৪টী কিরণচ্ছটা পল্লীতে পতিত হইলে পল্লীখানি চিরউজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইত। আমরা ঈদৃশ জীবিত ও মৃত খ্যাতনামা অনেক পুরুষের নাম করিতে পারি। এই গেল আমাদের পূর্ব্ব কথিত ওনং পল্লীত্যাগী—যাঁহারা পল্লীগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুদূর ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে জ্ঞান-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উন্নতি লাভ করিয়া দেশের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও জন্মভূমি পল্লীকে একবারও মনে করেন নাই। ইহারা পল্লীজননীর ক্রোড়চ্যুত উজ্জ্বল রত্ন সকল।

দ্বিতীয়, এক সম্প্রদায় পল্লী সন্তান আছেন, যাঁহারা পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া ভারতের সুদূর প্রদেশে বাস করিয়া তথাকার অধিবাসিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সংপ্রতি "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামে একখানি সুন্দর উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গপল্লীর বহু খ্যাতনামা পুরুষের নাম জানা যায় যাঁহারা বঙ্গের পল্লীভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চল পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে গণনীয় ব্যক্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়া বসবাস করিতেছেন। বঙ্গপল্লী তাঁহাদের অন্তর হইতে চির অন্তরিত হইয়া আছেন। এই সকল ব্যক্তি প্রয়োজন উদ্দেশে বিদেশবাসী হইলেও যদি জন্মভূমি বঙ্গপল্লীর প্রতি স্নেহ দৃষ্টি রাখিতেন, তাহা হইলে বঙ্গের পল্লীগ্রামের এতদূর অধঃপতন হইত না।

আমাদের কথিত প্রথম সম্প্রদায় বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশে বাস করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থানকেই স্থায়ী বাসস্থানরূপে স্থির করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের অভাব পূরণ ও জীবিকানির্ব্বাহ জন্য অর্থাগম প্রয়োজনে বিদেশ গমন আমাদের অপরিহার্য্য। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে জন্মস্থান পল্লীভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশকে স্থায়ী বাসস্থান করায় দেশের সহিত তাঁহাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের মায়া মমতা সেই বিদেশের উপরেই জন্মিয়াছে।

সপরিবারে কর্ম্মস্থানে বাসের প্রচলন এখন যেমন হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এমন ছিল না, তখন অতি অল্পসংখ্যক চাকুরেই সপরিবারে কর্ম্মস্থানে বাস করিতেন। সেও অধিক বেতনের পদস্থ চাকুরের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি মাত্র। তাঁহারাও পূজা পার্ব্বণ দীর্ঘ বন্ধ উপলক্ষ্যে বাড়ী যাইতেন। এখন ছোট বড় সকল চাকুরেই—কনেষ্টবল চাপরাশি কর্ম্মচারীরাও সপরিবারে কর্ম্মস্থানে বাস করিতে না পারিলে তৃপ্ত হন না। সত্যই চিরদিন সংসার এক নিয়মে চলে না। কাল, দেশ, পাত্র অনুসারে প্রচলিত প্রথাও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বারমাস একাকী বিদেশে বাস করায় অনেক প্রকার অসুবিধা আছে তাহায় সন্দেহ নাই। যেমন সকল রোগের এক ঔষধ নয়, তেমনি একটী নিয়ম সকল সংসারে খাটে না। সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সপরিবারে দূরদেশে বাসের সহিত বঙ্গপল্লীর অবনতির যে সম্বন্ধ আছে আমরা এস্থানে তাহাই উল্লেখ করিব।

জগতে সূর্য্য যেমন গ্রহগণের কেন্দ্রস্বরূপ, সূর্য্য গ্রহ-গণকে আকর্ষণ করেন, গ্রহগণও সূর্য্যকে আকর্ষণ করে। এই পরস্পর আকর্ষণেই জগতের স্থিতি ও গতি। ভাবিয়া দেখিলে আমাদের গৃহ সংসার ও সেইমত। গৃহাশ্রমী মাত্রেরই নিজস্ব বাসভবন থাকা প্রয়োজন। পরান্ন-ভোজন অপেক্ষাও পরগৃহ-বাস ক্লেশের। সেই বাসস্থানই আমাদের সংসারে কেন্দ্রস্বরূপ। বিদেশ-বাসী পুরুষেরা যদি কেন্দ্রস্থানীয় স্ব স্ব বাসভূমিকে আকর্ষণ করেন এবং তাহার রক্ষা ও উন্নতিবিধানে চেষ্টা করেন, আর যাঁহারা বাসভবনেই বাস করেন তাঁহারাও সংসারস্থ বিদেশবাসী স্বজনদিগকে আকর্ষণ করেন—তাদের সুখ দুঃখের সহায় হন, তাহা হইলেই সংসারাশ্রমের সুখ—সংসারের স্থিতি এবং উন্নতি হয়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পল্লীভূমিরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আজকাল কাল-দেশ-পাত্র অভেদে সপরিবারে বিদেশবাসের যে প্রথা, ইহা সর্ব্বত্র ইষ্টকর নয়। ইহা গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া—বিচারহীন হইয়া দৃষ্টানুবর্ত্তন করা মাত্র। আমরা এরূপ অনেক দেখিতেছি যে অল্প আয়ের চাকুরীতে কোনমতে সংসার চলিয়া যাইতেছে, সংসারে প্রাচীন প্রাচীনা পিতামাতা বা তাদৃশ কেহ আছেন একমাত্র বধূই তাঁহাদের যত্ন প্রতিপালনের অবলম্বন; ঈদৃশ সংসারে বিদেশবাসী উপার্জ্জক আধুনিক প্রথার অনুকরণে স্ত্রীটীকে বাসায় আনিতে না পারিলে তৃপ্ত হন না। আবার এখনকার বধূমাতারাও বাসায় যাইতে না পারিলে আপনাদিগকে ভাগ্যহীনা মনে করেন।

এ অবস্থায় পিতামাতার সেবা-যত্ন, ক্লেশ-নিবারণ, পল্লীগ্রামের বাসভবন রক্ষা, যাহা হয়, তাহা অনায়াসে অনুমেয়। আবার পিতামাতাও যদি বধূমাতার অনুসরণ করেন তাহা হইলে পৈতৃক জন্মভূমি জন্মের মত ত্যাগ করিতে হয়; যে হেতু অল্প আয়ে দু'দিক রক্ষা হয় না। অন্য দিকে যাঁহারা অধিক উপার্জ্জক তাঁহারাও সপরিবারে বিদেশে বাস হেতু স্বভাবতঃ বাড়ীর উপর মমতাহীন হইয়া পড়েন। বধূমাতারাও স্বামি-সন্নিধানে আবদার পালনের সুযোগ সুবিধা পান; ভবিষ্যৎ নানা চিন্তা জানাইয়া অঞ্চলের কোণে কিঞ্চিৎ বান্ধিতে সচেষ্ট হন। স্বামী মহাশয় একা কতদিক রক্ষা করিবেন সুতরাং ক্রমে বাড়ীর টান শিথিল হইয়া পড়ে। সংসার-কেন্দ্রের আকর্ষণ পরস্পরের কম হইয়া যায়। সুতরাং পৈতৃক পল্লীভবনের উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটে। বিদেশে সপরিবারে বাসের উপকারিতার সহিত এই অপকারিতা অনেকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

বস্তুর অবস্থান্তর-প্রাপ্তি।

লেখক—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিকদার তত্ত্বনিধি।

এক শক্তি হ'তে এ দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, জগৎ শক্তিরই প্রকাশমাত্র। শক্তি (Energy) বা প্রাণ যখন মহাকাশে (Etherএ) ক্রিয়মাণা—কম্পমানা হয় তখনই মাত্র স্থষ্টবস্তুর উদ্ভব। মহাকাশ নিষ্ক্রিয়, যখন প্রাণ বা শক্তি তাহাতে কার্য্য করে তখনই ক্রিয়া প্রকাশমানা। তাই শিব শব—কালী তাঁর উপরে নৃত্যশীলা। প্রাণের (Energyর) ক্রিয়া কম্পন (vibration)। জগতে আমরা যা কিছু ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করি, জ্ঞান লাভ করি, তাহা মাত্র শক্তির কার্য্য। দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদন ইত্যাদি দ্বারা আমরা শক্তিকে অনুভব করি, আমাদের শক্তির (Energyর) মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন মাত্র উপলব্ধি করি; মস্তিষ্কমধ্যে যে ক্রিয়া হয় বা অনুভব হয়, তাহা শক্তিরই কার্য্য-ভেদ মাত্র। জগতের যত বিভিন্ন বস্তু আছে তাহা শক্তির বিভিন্নভাবের প্রকাশ বা খেলা; (Energy) শক্তির বিভিন্ন কম্পন বা নৃত্যই বিভিন্ন বস্তু, অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুসকল শক্তির বিভিন্ন কম্পনের সমবায় মাত্র। মানুষ—পশু—গাছ পালা, শৈত্য, উষ্ণত্ব লালত্ব নীলত্ব—এমন কি সুখ দুঃখ সকলই শক্তির বিভিন্ন কম্পনের সৃষ্টি। [illegible]

ও ব্রহ্ম-শক্তি এক; নিস্তরঙ্গ অবস্থাকে সাধারণতঃ ব্রহ্ম বলে—এবং তরঙ্গায়িত লীলাময় অবস্থাকে শক্তি বলে এবং তাহারই এক অবস্থা জগৎ। বাস্তবিক পক্ষে নিস্তরঙ্গ ও তরঙ্গায়িত উভয়টা নিয়েই ব্রহ্ম; তাই সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। লীলা বাদ দিয়ে লীলাময় নহেন। একটী পুষ্করিণীর সকল জল যদি তট সমান থাকে তবে সেই জলরাশি হিসাবে তাহা নিত্য, কিন্তু সেই জলের বিভিন্ন অংশের তরঙ্গ পরিবর্ত্তনীয় ব'লে সে হিসাবে অনিত্য। তরঙ্গ কখনও উঠে, কখনও লয় পায়; কিন্তু উঠা লয় হওয়া চিরকালই চলিলে সে হিসাবে তরঙ্গও নিত্য. কারণ তাহার একান্ত ধ্বংস নাই। সেইরূপ জগৎ এক হিসাবে নিত্য, অন্য হিসাবে অনিত্য; পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু একান্ত ধ্বংস নাই! তরঙ্গ ও জল উভয় নিয়ে যেমন পুকুর, নিষ্ক্রিয় ও ক্রিয়াশীল উভয় অবস্থাযুক্ত একই ব্রহ্ম, এবং সৎ। যাহা হউক দেখা গেল জগৎটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না! ইহার ব্যবহার-ভেদে জাগতিক বস্তুর সহিত সম্বন্ধভেদে—তার দেখবার দৃষ্টি ভেদে ভাল বা মন্দ। যাতে মানুষের সংকীর্ণতা তাই মন্দ এবং তাতে দুঃখ, আর যাতে প্রসারণ আনে তাই ভাল এবং তাতে আনন্দ (সত্যানুসরণ দ্রষ্টব্য)। জড় ও চৈতন্য দুটী পরস্পর বিরোধী ভিন্ন বিষয় নহে, একেরই বিভিন্ন দিক-মাত্র—ভাব মাত্র (পুণ্যপুথি দ্রষ্টব্য)। ভাবের রকমভেদেই ভাল-মন্দ।

জড়-জগতের আলোচনা ভগবৎ-প্রাপ্তির বিরোধী নহে। এপথ দিয়েও ভগবানে পৌঁছান যায়। যাতে যাতে মনের সংকীর্ণতা ছাড়িয়া উদারতা আত্মপ্রসারণ—এনে দেয় তাই সাধনীয় এবং তাতেই ভগবৎ-প্রাপ্তি বা আত্ম-সাক্ষাৎকার (পুণ্যপুঁথি দ্রষ্টব্য)। এ হিসাবে বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনাও সাধনা। একথা সত্য—এসব শাস্ত্র সত্যের আলোচনা, তা' সত্য—বেদ। জড়-রাজ্য ও চৈতন্য-রাজ্যের নিহিত সত্য—এক মহাসত্যের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, কারণ এদুটী রাজ্য একেরই বিকাশ, এক উর্দ্ধমুখ বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা, তখন যে কোন একটী শাখা হইতে মূলে পৌঁছান সম্ভব। এখন সাহস করে বলা যেতে পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্যে লক্ষ্য রাখা যায়—সত্যে লক্ষ্য থাকে অর্থাৎ আত্ম-প্রসারণের দিকে যায়, তখন জড় বিজ্ঞানাদি আলোচনায় পাপ হবে না, বরং পুণ্য হবে। কারণ জড় বিজ্ঞানাদির সত্য আবিষ্কারে শরীর সমাজ দেশ মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পাবে।

বক্তব্য কথা রেখে অনেক কথা বলা হয়েছে, পাঠক ক্ষমা করবেন। বলার উদ্দেশ্য জড় ও চৈতন্য রাজ্যের সত্য যুগপৎ সাক্ষাৎকার করা প্রয়ো-

জনীয় এবং সে সময় উপস্থিত। যাঁহারা শাশ্বত সংবাদ ও সুপথ-সঙ্কেত এবং সুপাঠ-পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা তাহার ঈঙ্গিত পাচ্ছেন।

এখন কথা হচ্ছে যখন জগতের সকল পদার্থই, কি জড় কি উদ্ভিদ কি চেতন, এক শক্তির প্রকাশ ভেদ, তখন এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ সৃজন করা যায় কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কতকগুলি কথা বলা আবশ্যক। প্রত্যেক পদার্থই নির্দ্দিষ্ট শক্তিকম্পনে গঠিত, যেন নির্দ্দিষ্ট সুরে বান্ধা। অভি-ব্যক্তি-বাদ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এক Protoplasm (চেতন পদার্থের সর্ব্ব প্রাথমিক অবস্থা) ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে মানুষে পরিণত। একটী বীর্য্যকীটাণু একটী Cell জড়পদার্থ গ্রহণানন্তর জড়শক্তি সঞ্চয়ে নিজ দেহ বর্দ্ধিত করে, ক্রমশঃ অসংখ্য কীটাণু বা (Cell) প্রস্তুত করে। তখন পূর্ব্বোক্ত-রূপ আশা করা বাতুলতা নহে। জগৎ-সৃষ্টি-কৌশল অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি যে যেমন এক Protoplasm মনুষ্যে পরিণত হ'তে হ'লে তাকে কোটী কোটী (Stage) অবস্থার মধ্য দিয়া যেতে হয়; সেইরূপ সর্ব্বত্রই একই নিয়ম। কি উদ্ভিদ্ জগৎ কি প্রাণী জগৎ কি জড়জগৎ। নিম্নতম পদার্থকে উচ্চতম পদার্থে পরিণত হ'তে ক্রমশঃ উন্নীত হ'তে হয়। জড়কেও বিভিন্ন অবস্থার (Stageএর) মধ্য দিয়া এমন স্থানে যেতে হয়েছে যাহা সম্পূর্ণ জড়ও নহে বা সম্পূর্ণ উদ্ভিদও নহে অর্থাৎ উভয়ধর্ম্মী। তৎপর নিম্নতম উদ্ভিদ্ ক্রমশঃ উচ্চতম উদ্ভিদ, তৎপর উদ্ভিদ ও প্রাণীর উভয়ধর্ম্মী, তৎপর নিম্নতম জীব, এইরূপে ক্রমশঃ মনুষ্য।

সৃষ্টপদার্থ যখন বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে অর্থাৎ উন্নতির পথে একটী পদার্থ প্রথমতঃ ঠিক তার পরবর্ত্তী উন্নততর পদার্থে পরিণত হয়, তৎপর ক্রমশঃ এইরূপ করিয়া অগ্রসর হয়। তখন একটী পদার্থ ঠিক তার পরবর্ত্তী উচ্চতর বা নিম্নতর পদার্থের সব চেয়ে বেশী সুসদৃশ। অর্থাৎ যদি সমস্ত জাগতিক পদার্থকে বিভিন্ন কম্পনে (Vibrationএ) গঠিত ধরা যায়, তবে সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী পদার্থদ্বয়ের কম্পন নিকটবর্ত্তী ও অনেকটা সদৃশ। তখন একটী পদার্থকে অন্যটাতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। একটী পদার্থকে ঠিক তার নিকটবর্ত্তী পদার্থে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজ! যে কোন পদার্থকে তার ঠিক উচ্চতর বা নিম্নতর পদার্থে পরিণত করাই অপেক্ষাকৃত সুগম। যেমন বরফের নিকটবর্ত্তী উচ্চতর অবস্থা জল, তখন বরফে কম্পন যোগে জল উৎপন্ন হইবে। উচ্চতরে পরিণত করিতে কম্পন যোগ এবং নিম্নতর অবস্থায়

পরিণত করিতে বিয়োগ করিতে হইবে। কম্পনের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনও প্রয়োজন হতে পারে। এইরূপে কোন একটী ধাতুকে তার সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী ধাতুতে, কোনও উদ্ভিদকে তার নিকটবর্ত্তী উদ্ভিদে বা কোনও প্রাণীকে তার নিকটবর্ত্তী প্রাণীতে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। যদি বিভিন্ন পদার্থকে তাদের কম্পন অনুসারে ভাগ করা সম্ভব হয় অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থের কম্পনের ডিগ্রি ধরিতে পারিলে এবং ঐ কম্পনের ডিগ্রির পরিবর্ত্তন সাধন করতে উপায় আবিষ্কার করতে পারিলেই Artificially প্রকৃতিকৃত জাগতিক পদার্থের Evolution বা Involution উন্নতি অবনতি সম্পাদন সম্ভব হইবে। অনেক সময় এই মূল নিয়মের অজ্ঞাত অবস্থাতেও উহার কার্য্য করা সম্ভব হয়। মূল-নিহিত নিয়মের বিষয় আলোচনা করা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের কাজ প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করা, প্রকৃতির নিয়ম বা অন্তর্নিহিত সত্যকে লাভ করা, তাহাকে কাজে লাগান। সত্যদ্রষ্টা ঋষি-পদবাচ্য। এখানে না উল্লেখ করলে অন্যায় হবে যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আলোচ্য প্রবন্ধের মূল তথ্য সর্ব্বজনীন সৎসঙ্গে (হিমাইতপুর পাবনা) আলোচিত হইয়াছিল।

এখন সে সময় আগত-প্রায়, যখন জড়চৈতন্যের অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্মের বিভিন্ন বিকাশের সত্য বা বেদ যুগপৎ আবিষ্কার করে বেদদ্রষ্টা ঋষিগণ জগতকে এক অভিনব সভ্যতা প্রদান করবেন। ভারত এ স্বর্গরাজ্য মর্ত্ত্যে প্রতিষ্ঠা করিবার কতটুকু সাহায্য করিবে ও ধন্য হইবে? আবার কবে ভারতগগন কম্পিত করিয়া ঘোষিত হইবে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

বিশ্ব-যজ্ঞে হিন্দুর স্থান।

লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

যে হিন্দুজাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য গ্রীক মোগল-পাঠান প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের প্রবল নিষ্পেষণে তিলমাত্র নিষ্পেষিত এবং আক্রমণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, সেই হিন্দুজাতির বিশিষ্টতা যে আজ প্রতীচ্য সভ্যতার তরঙ্গাভিঘাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। আজ চিরসত্য "সনাতনধর্ম্মে" সম্মোহিত হিন্দুর সন্তান যে বীতশ্রদ্ধ ও

হৃতবিশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে তাহা প্রত্যেক নব্যশিক্ষিত হিন্দুসন্তানের আচারে ব্যবহারে, বেশে ভূষায়, আলাপে পরিচয়ে সর্ব্বত্রই প্রকটিত। ব্যক্তির সমষ্টি লইয়াই যখন সমাজ, তখন ব্যক্তি যদি ধর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে, তবে সমষ্টি ও যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিরহিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? বিন্দুর সংঘাতেই ত সিন্ধুর সৃষ্টি হয়—একের সন্নিপাতেই ত বহুর উৎপত্তি হয়। এই ব্যক্তিত্ব আজ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বেষ্টিত্বও লুপ্ত-প্রায়।

হিন্দুজাতি চিরকাল অন্তর্মুখী। বহির্জগতের সহিত হিন্দুজাতির সম্বন্ধ কোনদিন ছিল না এবং সে সম্বন্ধ আনিতে হিন্দু কোনদিন চেষ্টাও করে নাই। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে"—ইহাই ছিল হিন্দু-জাতির আদর্শ। হিন্দু নিজের দেহ ভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে, কাজেই সে অন্তররাজ্য ছাড়িয়া বহির্জগতের দিকে কোন দিন দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে চায় না। সামান্য একখণ্ড শিলাখণ্ড লইয়া হিন্দু তাহাতে "সহস্রশীর্ষ-পুরুষাঃ সহস্রাক্ষঃ" দর্শন করে—এমন অন্তর্মুখীন জাতি ত আর নাই। হিন্দুর গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ চিরদিন উদাত্তস্বরে ভোগ ছাড়িয়া ত্যাগের দিকে—ভোগায়তন দেহকে ছাড়িয়া আত্মাকে জানিবার ও চিনিবার কথা প্রচার করিয়াছে। হিন্দুতে ও পাশ্চাত্য জাতিতে এইখানেই প্রভেদ। হিন্দু ইহলোকের দিকে না তাকাইয়া পরলোককেই আদর্শ করিয়া কাজ করে, আর পাশ্চাত্য জাতি পরলোকের ধার মোটেই ধারে না—তাহারা চার্ব্বাক-পন্থী "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। ভোগী প্রতীচ্য ইহলোকের ভোগৈশ্বর্য্য লইয়াই ব্যস্ত, আর ত্যাগী হিন্দু মিথিলা-ধ্বংস হ'লেও হাসিতে থাকে। এই কারণেই জড়রাজ্যে আজ পাশ্চাত্য হিন্দুজাতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, জড়-রাজ্যে তাই হিন্দু প্রতীচ্যের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতীচ্য বীরের জাতি—এই সসাগরা বসুন্ধরা তাহাদের মত বীরের ভোগ্যা—তাহারা রাজসিক ও তামসিক গুণের মূর্ত্তিমান উদাহরণ। আর প্রাচ্য এই জড়জগতের মধ্যে গুটিপোকার মত আবদ্ধ থাকিতে না চাহিয়া বারংবার সংসারের আধি-ব্যাধি-দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল সংসারে আসিয়া জীবনসংগ্রাম করিতে চাহে না—তাহারা চায় নির্ব্বাণ, মোক্ষ বা মুক্তি। এইখানেই প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রভেদ এবং এইটুকুই প্রাচ্যের বিশেষত্ব।

আজ প্রতীচ্য সভ্যতা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে প্রাচ্যের এই চির-অব্যাহত স্রোতোধারাকে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মত আসিয়া বাধা দিতেছে বলিয়া

এক মহাতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে; পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানরূপ প্রবল ঝ্যাত্যাভিহত হইয়া প্রাচ্যের অধ্যাত্মসমুদ্রে এক মহাউর্ম্মির উদয় হইয়াছে। জড়ের সহিত চৈতন্যের আজ এক মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে।

ভারতবাসী চিরকাল কিছু কূপ-মণ্ডূকের মত আপন দেশের সীমার মধ্যে আপনি আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। এদেশ হইতেও ফেনিল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বড় বড় অর্ণবপোত প্রতীচ্যখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে এবং চীন, যাবা, সুমাত্রা, বোর্ণিও তেও এজাতির বাণিজ্যসম্ভার প্রেরিত হইয়াছে। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেও এদেশে ফরাসী, গ্রীক্ প্রভৃতি নানাজাতি আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের জড়বিজ্ঞান কখনও ভারতের চিন্তাধারাকে ও সভ্যতাকে এতটা উন্মথিত করিতে পারে নাই। তাহাতে ভারতের ক্ষাত্র ও বৈশ্যশক্তির দেহে অল্প বিস্তর আঘাত লাগিয়াছে বটে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে তাহা আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে বিশ্বমধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে, এজন্য স্বয়ং ভগবান্ ভারতবর্ষকে উত্তরে অম্বরচুম্বী সহ্যাদ্রি হিমাচল, দক্ষিণে গুরু-গম্ভীরনাদী বীচি-মালা-বিক্ষোভিত ভারতমহাসাগর, পশ্চিমে দুর্লংঘ্য খাইবার উপত্যকা ও পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত "মগের মুলুক" দিয়া ইহাকে চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কাজেই ভারতবর্ষে কখনও অন্য দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। যাহা কিছু অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা এই দেশেরই মধ্যে থাকিয়া হইয়াছে। কিন্তু অধুনা জড়-বিজ্ঞানের উৎকর্ষে পাশ্চাত্য একেবারে শীর্ষস্থান অধিকার করায় এবং রেল, ষ্টীমার, ব্যবসায় বাণিজ্য, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র, পুস্তক, রঙ্গালয় প্রভৃতির দ্বারা পাশ্চাত্যের নূতন নূতন সহজ-সাধ্য নিয়ম ও প্রণালী এবং রীতি-নীতি ভারতে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হওয়ায়, নবীন ভারত পুরাতনের স্মৃতি ঝাড়িয়া ফেলিয়া জড় বিজ্ঞানকেই আকড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রদীপের মিটি মিটি আলো অতি স্নিগ্ধ হইলেও বৈদ্যুতিক আলোর চক্ষু ঝলসান জ্যোতি আজ ভারতবাসীর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। এ উদ্দাম গতির বিরুদ্ধে যত কেন বাঁধ দেও না কেন, তাহা ত থাকিবে না। বিশেষতঃ জগতের সমগ্র জাতির সহিত এখন ভারত এরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে যে সে বন্ধন আর ভাঙ্গিবার বা টুটিবার উপায় নাই—ভারত আজ বিশ্ব জগতের অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির পাড়াপ্রতিবেশীর অঙ্গ হইয়াছে। বিজেতা জাতির যাহা কিছু সভ্যতা তাহা ভারতের নব্য সম্প্রদায়ের

মধ্যে শিকড় গাঁড়িয়া বসিয়াছে, এ অবস্থায় বদ্ধমূল মূলকে উৎপাটিত কর যে কত শক্তি ও সাধনার আবশ্যক, তাহা কল্পনারও অতীত।

(ক্রমশঃ)



সংবাদ ও মন্তব্য।

হিন্দুপত্রিকা-সম্পাদক রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী বিগত ২৬শে আশ্বিন তারিখে ৮৫ বৎসর বয়সে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল। এই মহীয়সী মহিলা ধর্ম্মজ্ঞানে অতি উন্নত ছিলেন। দুইটী পুত্র, দুইটী কন্যা এবং বহু পৌত্র পৌত্রী এবং দৌহিত্র দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মার সদ্গতিবিধান করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বঙ্গের কৃতী সন্তান মতিলাল ঘোষ ৺দুর্গা-পূজার পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি তেজস্বী ও নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ কয়িতেছি।

লর্ড সিংহ অতিশয় অসুস্থ, এই সংবাদে আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছি; ভগবান্ তাঁহাকে সত্বর নিরাময় করুন।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জ্জিলিঙ্গে অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কেমাল পাশা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গ্রীকগণ এসিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুরস্কের নব অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৯ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড
৮ম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ।

১৩২৯ সাল।
১৮৪৪ শকাব্দাঃ

ব্যাকুলতা।

লেখক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাঞ্জিলাল।

(১)

প্রভাতে উঠিয়া আজি তোমার মুরতি গো
পড়ে গেল মনে।
যেন কি অজানা দেশে তোমার ওরূপ গো
হেরেছি নয়নে।
যেন কত দিন পরে, মন চিনি চিনি করে;
ভাবি যেন তুমি মোর আপনার জন গো
একান্ত আপন।
কেন যে চিনিতে নারি বুঝিনা কারণ।

(২)

বর্ত্তমানে তুমি আমি কত দূরে আছি গো,
এ যেন স্বপন।

কোন এক দিন যেন অভিন্ন-হৃদয় গো
ছিলাম দু'জন।
কূপ-জলে সিন্ধু-জলে একসঙ্গে মিশাইলে,
প্রথমের সত্ত্বা হয় অবিশ্লিষ্ট ভাবে গো
দ্বিতীয়ে মগন,
ঠিক সেইরূপ যেন ছিলাম দু'জন।

(৩)

তোমারে হেরিলে চোখে, নিজের অস্তিত্ব গো
যেন ভুলে যাই,
আমার বাসনা হয় মম স্বতন্ত্রতা গো
তোমাতে মিশাই;
হেন যেন মনে হয় দুঃখ কষ্ট সমুদয়
তোমারে জানিলে মম হয় দূরীভূত গো
শান্তি পাই মনে!
কেন যে এরূপ হয়, কহিব কেমনে?

(৪)

ক্ষুদ্র আমি বারি বিন্দু, তোমা' সনে মিশি গো,
শক্তি কোথা পাই?
মাঝে যে কঠিন বাঁধ, ভাঙ্গিয়া যে যাই গো
হেন সাধ্য নাই।
আমি ক্ষুদ্র, হে মহান্, করিয়া করুণা-দান
তুমি যদি মোরে লও করি আকর্ষণ গো
তব দেহ পানে,
তবে আমি ধন্য হই মিশি তোমা' সনে।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ভক্তি সকল ধর্ম্মেই আছে, কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথায়ও বা মহাপুরুষে অর্পিত। সর্ব্বত্রই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি-লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দৃঢ় অভ্যাস, অনুকূল অবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগ-শূন্য না হইলে এবং মন সম্পূর্ণরূপে বিষয়ানুরাগ-বিরহিত না হইলে যোগ অভ্যাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু, সকল অবস্থার লোক অতি সহজেই ভক্তি সাধন করিতে পারে। ভক্তিমার্গের ঋষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন ঈশ্বরে পরমানুরাগই ভক্তি। ঈশ্বর বিভিন্ন সাধক কর্ত্তৃক বিভিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই ভেদ আপাত-দৃষ্টি মাত্র, বাস্তব ভেদ নাই। ভক্তি-লাভ করিতে হইলে দ্বেষ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে জগতে সমস্ত লোকই যে এক মত হইবে, আশা করা যায় না। সুতরাং জগৎ কখনও এক ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে না। ঈশ্বর করুন, জগৎ যেন কখনও এক ধর্ম্মাবলম্বী না হয়। তাহা হইলে জগতে এই সামঞ্জস্যের পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সুতরাং মানুষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে। এই জীবন একটা গুরুতর ব্যাপার, ইহাকে নিজ ভাবানুযায়ী পরিচালিত করিতে হইবে। যে দেশে সকলকেই এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সেদেশ ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনও এরূপ চেষ্টা হয় নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কখনও বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধর্ম্মই স্বাধীন-ভাবে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছে। সেইজন্যই এখনও এখানে প্রকৃত ধর্ম্মভাব জাগ্রত রহিয়াছে। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মে বিরোধ নিম্নলিখিত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একজন মনে করিতেছে সত্যের চাবি আমার নিকট। আর যে আমায় বিশ্বাস না করে, সে মূর্খ। অপর আবার মনে করিতেছে, ও ব্যক্তি কপটী, কারণ, তাহা না হইলে সে আমার কথায় বিশ্বাস করিত। সকল

ব্যক্তিই এক ধর্ম্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, তবে এত বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল কিরূপে? কে, সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারে? সকলকে এক ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য অনেক উদ্‌যোগ ও চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এমন কি তরবারির বলে যেখানে এক ধর্ম্মাবলম্বী করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইতিহাস বলেন, সেখানেও এক বাড়ীতে দশটী ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র জগতে কখনও একটী ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শক্তি মানব-মনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিলে মানব চিন্তায় সমর্থ হয়। এই বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া না থাকিলে মানুষ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না; এমন কি, সে মনুষ্য পদবাচ্যই হইত না। মন্ ধাতু হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য শব্দের তাৎপর্য্যার্থ মননশীল, অর্থাৎ চিন্তাশীল। মনের পরি-চালনা না থাকিলে চিন্তা-শক্তিরও লোপ হয়। তখন সেই ব্যক্তিতে আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। ঈশ্বর করুন যেন ভারতের এরূপ অবস্থা কখনও না হয়। অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে থাকে, সেইজন্যই একত্বের মধ্যে বহুত্বের প্রয়োজন। আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে ধর্ম্মে অন্যায় কার্য্যের পোষকতা করে; সেই ধর্ম্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাইতে হইবে? অবশ্য, ইহার উত্তর "না" ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তাদৃশ ধর্ম্ম যত শীঘ্র দূরীভূত হয়, ততই মঙ্গল। কারণ, উহাতে লোকের অকল্যাণই হইয়া থাকে। নীতির উপরই যেন সকল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কোন রূপে সত্বগুণের পরি-বর্দ্ধন করা আবশ্যক। নচেৎ জ্ঞান, ভক্তি কিছুই আয়ত্ত করা যায় না। তবে ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, ভক্তি মনকে অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। যে কোন ধর্ম্মের বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাউক না কেন, তাহাতেই ভক্তির প্রাধান্য দৃষ্ট হইবে। সকল ধর্ম্মেই বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের আব-শ্যকতা স্বীকার করে। যদিও ইহুদী মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ানগণ বাহ্যশৌচের বাড়াবাড়ির বিরোধী, তথাপি তাহারা কোন না কোনরূপে কিছু কিছু বাহ্য শৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের একটী মন্দির ছিল। ঐ মন্দিরে আর্ক নামক একটী সিন্দুক রাখা হইত। ঐ সিন্দুকের উপর বিস্তারিত-পক্ষ-যুক্ত একটী স্বর্গীয় দূতের মূর্ত্তি থাকিত। সিন্দুকের ভিতর মুশার দশ ঈশ্বরাদেশ রক্ষিত হইত। উহার ঠিক্ মধ্যস্থলে তাহারা ঈশ্বরাবির্ভাব দর্শন করিত।

খ্রীষ্টয়ানদের মধ্যে এখন ঐ সিন্ধুকে ধর্ম্মপুস্তক রাখা হয়। রোমান ক্যাথালিক ও গ্রীক্ খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে প্রতিমাপূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উহারা যীশুর মূর্ত্তি এবং তাঁহার পিতা মাতার মূর্ত্তি পূজা করে। প্রোটেষ্টান্টদিগের মধ্যে প্রতিমা পূজা নাই। কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষরূপে পূজা করিয়া থাকে। উহাও প্রতিমা পূজার রূপান্তর মাত্র। পারসি ও ইরানিদিগের মধ্যে অগ্নি-পূজা খুব প্রচলিত। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় ধর্ম্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আইসে, সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়ে ক্রমশঃ মন দেওয়া যাইতে পারে। পরা ভক্তি লাভ হইলে আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া যান। যখন মানুষ সর্ব্ববস্তুতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরে সর্ব্ববস্তু দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণভক্তি লাভ করে। তখন আর বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি থাকে না। যে কোন ভাবে ঈশ্বরেই ভক্তি করা যাইতে পারে। আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাকেই ভালবাসি। পুত্র-কলত্রাদিতে যে আমাদের প্রবল আকর্ষণ হয়, সেও ঈশ্বরের সত্বা তথায় বিদ্যমান বলিয়া। নতুবা মৃতদেহকে কে ভালবাসে? সকল প্রকার ভয়, সঙ্কোচ, প্রত্যাশা চিত্ত হইতে দূর হইলে প্রেমের উদয় হয়। উহাই মনুষ্য-জীবনের চরম চরিতার্থতা। এজন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে সমস্ত ভাব হইতে মধুর ভাবকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এবং উহা কত শ্রেষ্ঠ ভাব, তাহা মানবের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন। সা পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়, তাঁহাকে হৃদয়ের ভিতর দর্শন করা যায়। এই পরিবর্ত্তনশীল, অশাশ্বৎ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু দুঃখ শোকপূর্ণ এ জগতের বিদ্যা, খুব বড় হইতে পারে, কিন্তু যিনি, আনন্দময়, একমাত্র যেখানে শান্তির অবস্থান, একমাত্র যেখানে অনন্তজীবন ও পূর্ণত্ব, একমাত্র যাঁহার নিকট গেলে সকল দুঃখের অবসান হয়, তাঁহাকে জানাই আমাদের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহাতে অন্নবস্ত্র হয়, ইচ্ছা করিলে আর্য্যঋষিরা তাহা অনায়াসে আবিষ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু, ঈশ্বরানুগ্রহে, তাঁহারা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া একবারে অন্য পথ ধরিলেন। ঐ পথ ধরিয়া তাঁহারা এরূপ একনিষ্ঠ-ভাবে অগ্রসর হইলেন যে, এক্ষণে উহা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া পিতা হইতে পুত্রে উত্তরাধিকার-সূত্রে আসিয়া আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ধমনীর প্রত্যেক শোণিত-

বিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এখন ধর্ম্ম ও হিন্দু একার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে ঘা দেবার যো নাই। বর্ব্বরজাতি-সমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্ব্বর ধর্ম্ম-সমূহের আমদানি করিয়া—একজনও এই সাপের মাথার মণি ছুঁইতে পারে নাই। একজনও এই জাতির প্রাণ-পাখী মারিতে পারে নাই। অতএব ইহাই আমাদের জাতির জীবনী শক্তি, আর যতদিন ইহা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতে এমন কোন জাতি নাই, এমন কোন শক্তি নাই যে, এই জাতির বিনাশ সাধনে সক্ষম। যতদিন আমরা আমাদের উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত মহত্তম রত্নের স্বরূপ ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন জগতের সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন, ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতে প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত-শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্ম্মিক না হয়, তবে আমি তাহাকে হিন্দু বলি না। অন্যান্য দেশে রাজনীতি-চর্চ্চা লোকের মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে, এবং তাহার সহিত সে একটু আধটু ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে, কিন্তু এই ভারতে ধর্ম্মাচরণই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তারপর যদি সময় থাকে, তবে, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয় অনুষ্ঠিত হয়, হানি নাই। এই বিষয়টী মনে রাখিলে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন বর্ত্তমান কালেও তেমনি, চিরকালই আমাদিগকে প্রথমেই আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলির একত্রী-করণই ভারতীয় জাতীয় একত্ব-সাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একবিধ সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতে জাতি গঠিত হইবে। এদেশে বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান। এখনই বহু রহিয়াছে আর ভবিষ্যতেও বহু হইবে। কারণ আমাদের ধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, মূলতত্ত্বগুলি এত উদার যে, যদিও উহা হইতেই অনেক বিস্তারিত ও অনেক খুঁটীনাটি ব্যাপার বাহির হইয়াছে, কিন্তু উহারা এমন তত্ত্ব-সমূহেরই কার্য্যের পরিণতি-স্বরূপ, যে গুলি আমাদের মস্তকোপরি বিদ্যমান আকাশের ন্যায় উদার ও প্রকৃতির তুল্য নিত্য ও সনাতন। অতএব সম্প্রদায় যে, স্বভাবতই চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক কোন বিবাদের প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায় থাক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতায় জগতের কোন উপকার হইবে না। কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিবে না। একজন লোক কিছু সব কায করিতে পারে না। অনন্তপ্রায় শক্তিরাশি স্বল্প-

সংখ্যক কয়েকটী লোক দ্বারা চালিত হইতে পারে না। এই বিষয় বুঝিলেই আমরা বুঝিব, কি প্রয়োজনে আমাদের ভিতর সম্প্রদায়-ভেদ-রূপ এই শ্রমবিভাগ অবশ্যম্ভাবিরূপে আসিয়াছে। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তি-সমূহের সুপরিচালনের জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পর বিবাদের কি প্রয়োজন আছে? যখন আমাদের অতি প্রাচীন শাস্ত্র সকল ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই ভেদ আপাত-প্রতীয়মান, মাত্র এই সকল আপাতদৃষ্ট। বিভিন্নতাসত্ত্বেও ঐ সকলের মধ্যে সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র রহিয়াছে। ঐ সকল গুলির মধ্যেই সেই পরম মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন,—

"একং সৎ বিপ্রাবহুধা বদন্তি"

জগতে একমাত্র বস্তুই বিদ্যমান, ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণনা করেন। কতকগুলি প্রধান প্রধান মতে আমাদের সকলেরই সম্মতি আছে। বৈষ্ণব হই বা শৈব হই, শাক্ত বা গাণপত্য হই, প্রাচীন বৈদান্তিকগণের বা আধুনিকগণের, যাঁহাদেরই হউক পদানুসরণ করি, প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায়ের হই, অথবা আধুনিক সংস্কৃত সম্প্রদায়েরই হই, যে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, আমার ধারণা সেই কতকগুলি বিষয় বিশ্বাস করে। অবশ্য ঐ ব্যাখ্যা প্রণালীতে ভেদ থাকিতে পারে, আর থাকাও উচিত। কারণ, আমরা সকলকেই আপনার ভাবে আনিতে পারিনা, ঐরূপ চেষ্টাই পাপ। জোর করিয়া সকলকে একমতে আনা চলে না এবং উহা পাপ। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্ম্মরহস্য-সমূহের সনাতন উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি এই পবিত্র শব্দরাশি অনাদি অনন্ত। প্রকৃতির যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, ইহারও তদ্রূপ। আর যখনই আমরা এই পবিত্র গ্রন্থের পাদপদ্ম স্পর্শ করি, তখনই আমাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। আমরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শক্তি, যাহাতে কালে সমগ্র জগৎ লয়-প্রাপ্ত হইয়া আবার কালে জগৎব্রহ্মাণ্ডরূপ এই অদ্ভুত প্রপঞ্চরূপে বহির্গত হয়, তাঁহাকে আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। কেহবা সগুণ ঈশ্বর, কেহবা নির্গুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের সত্তা সবাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই ঈশ্বরের নাম দরিদ্রতম ও নীচতম ব্যক্তির গৃহ হইতে ধনি-শ্রেষ্ঠ উচ্চতম সকলের গৃহে প্রবিষ্ট হউক আর। আমরা

জগতে অন্যান্য জাতির মত বিশ্বাস করি না যে, জগৎ কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর আমরা ইহা বিশ্বাস করি না যে, জীবাত্মাও এই জগতের সঙ্গে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে বা রাসায়নিক মিশ্রণজনিত শক্তি তুল্য শক্তি-বিশেষ। এ বিষয়েও সকল হিন্দু একমত হইতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃতি অনাদি অনন্ত। তবে, কল্পান্তে এ স্থূল বাহ্যজগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়। কিছু কালের জন্য ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার বাহির হইয়া প্রকৃতি নামধেয় এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে। আর এই তরঙ্গাকার গতি অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে। আর সকল হিন্দুই বিশ্বাস করে এই স্থূল জড় দেহটা, এমন কি ইহার অভ্যন্তরস্থ মন নামধেয় সূক্ষ্ম শরীরও প্রকৃত মানুষ নহে। কিন্তু, প্রকৃত মানব এইগুলি হইতে শ্রেষ্ঠতর। কারণ স্থূলদেহ পরিণামী, মনও তদ্রূপ। কিন্তু, এতদুভয়ের অতীত আত্মা নামধেয় অনির্ব্বচনীয় বস্তুর আদি অন্ত নাই; মৃত্যু নামক অবস্থাটীর সহিত উহা পরিচিত নহে। আর একটী বিশেষ বিষয়ে অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে। তাহা এই যে, আত্মা এক দেহ-অবসানে অন্য দেহ ধারণ করে। এইরূপ করিতে করিতে তাহার এমত অবস্থা আসে, যখন তাহার কোনরূপ শরীর ধারণের ইচ্ছা থাকে না, তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, আর তাহার জন্ম হয় না। আমি আমাদের শাস্ত্রের পুনর্জ্জন্মবাদ এবং নিত্য আত্মাসম্বন্ধীয় মতবাদের কথা বলিতেছি। আমরা যে সম্প্রদায়-ভুক্তই হইনা কেন, এই আর একটী বিষয়ে সকলেই একমত। এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। এক সম্প্রদায়ের মতে এই আত্মা পরমাত্মা নিত্য-ভেদ-সম্পন্ন। আবার কাহারও মতে উহা সেই অনন্তবহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র। অন্যের মতে হয়ত উহা অনন্তের সহিত অভেদ। আমরা আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া যেমত ব্যাখ্যা করি না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মূলতত্ত্ব বিশ্বাস করি যে আত্মা অনন্ত, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং কখনও উহার নাশ হইবে না; উহাকে বিভিন্ন শরীর ধরিয়া উন্নতি লাভ করিতে হইবে; অবশেষে মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইবে, ততক্ষণ আমরা সকলেই একমত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য তত্ত্বরাশির আলোচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন,

যে—একটী মৌলিক প্রভেদ—যাহা কিছু প্রাচ্য, তাহা হইতে যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহাকে যেন এক কুঠারাঘাতে পৃথক করিয়া দিতেছে। তাহা এই যে, আমরা ধর্ম্মাবলম্বী হই না কেন, আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, আত্মা স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ ও পূর্ণস্বভাব, অনন্তশক্তি ও আনন্দময়। কেবল দ্বৈতবাদীর মতে আত্মার, এই স্বাভাবিক আনন্দ স্বভাবভূত অসৎ কর্ম্ম জন্য সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে, ঈশ্বরানুগ্রহে উহা আবার খুলিয়া যাইবে এবং আত্মা নিজ পূর্ণ স্বভার পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। অদ্বৈতবাদীর মতে এ ধারণাটীও আংশিক ভ্রমাত্মক। মায়ার আবারণ জন্য আমরা ভাবি যে, আত্মা তাঁহার সমুদয় শক্তি হারাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সমুদয় শক্তিই তখনও পূর্ণ প্রকাশ থাকে। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ থাকিলেও মূলতত্ত্বে অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বাসী। আর এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ব্যবধান। প্রাচ্যেরা অন্তর হইতে বাহিরে, পাশ্চাত্যেরা বাহির হইতে অন্তরে ঈশ্বরের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মবিশ্বয়ে অবিশ্বাসী হইয়া নিজকে হীন মনে করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি আপনাকে দিবারাত্র হীন ভাবে, তাহা দ্বারা ভাল কিছু হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে দিবারাত্র দীনদুঃখী হীন ভাবে, সে হীন হইয়া যায়। যদি তুমি বল; আমার ভিতর শক্তি আছে, তবে তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে। আর যদি তুমি বল আমি কিছুই নই, ভাব যে, তুমি কিছুই নয়, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে, তুমি কিছুই-নয়, তবে তুমি কিছুই না" হইয়া দাঁড়াইবে। এই মহান্ তত্ত্বটী সবাইকে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। আমরা কিছু না-কিরূপে হইতে পারি? আমরা সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব করিতে হইবে। যে দিন আমাদের দেশের লোক আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছে, সেই দিন হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। আত্মবিশ্বাসহীনতা অর্থে ঈশ্বরে অবিশ্বাস। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, সেই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন, আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, সেই সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী ঈশ্বর প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে, তোমার দেহ, মন আত্মায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন তাহা হইলে কি নিরুৎসাহ আসিতে পারে?

(ক্রমশঃ)

পল্লী ও সহর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

(লেখক—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত কবিরত্ন।)

অনেকে এখনকার প্রথার সমর্থন করিয়া পূর্ব্ব প্রথার প্রতি এই দোষারোপ করেন যে—তখন পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশ বাসে অনেকে চরিত্র-ধন রক্ষা করিতে পারেন নাই। এবং উপার্জ্জনের অর্থ, রক্ষিতা প্রতিপালনে ব্যয় হইত, পরিবারেরা চির-দুঃখে কাটাইত। আমরা সত্যের অনুরোধ স্বীকার করি একথা সম্পূর্ণই মিথ্যা নয়। ইহার উত্তরে আমরা বলি তখন যেমন চরিত্রহীন লোক ছিলেন; তেমন চরিত্রবান্-সংযত বহুব্যক্তিও ছিলেন। আবার এখনকার সময়ে যাঁহারা সপরিবারে বিদেশে বাস করেন তাঁহাদের মধ্যেও অসংযত চরিত্রহীন নাই, একথা কেহ বলিতে পারেন না। চরিত্র-বান্ ও চরিত্রহীন উভয় প্রকার পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন এখনও তেমন আছেন। উহা ব্যক্তিগত মাত্র। উহা দ্বারা কোন প্রথার দোষগুণ সমর্থন করা যায় না। পূর্ব্বে যাঁহারা একাকী বা সপরিবারে কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে বাস করিতেন—তখন সহরে পাকাপাকী বাসের বন্দবস্ত ছিল না, তাঁহারা অন্য সময় না হউক দুর্গোৎসবের বন্দোপলক্ষে উৎসাহ ও আয়োজনের সহিত পল্লীভবনে আসিয়া প্রতিবাসী, স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া বন্দের সময়টী আনন্দে অতিবাহিত করিয়া, পল্লীবাসী প্রতিবেশীদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। সে পল্লীর এক আনন্দের দিন ছিল। যে গ্রামে ৩।৪ জন বড় চাকুরে থাকিতেন, সে গ্রামের লোক তাঁহাদের প্রতীক্ষায় কতই আশা আনন্দ অনুভব করিতেন। পূজার সময় প্রধানদিগের বাড়ী যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রত্যাশায় কতলোক পথ চাহিয়া থাকিত, যতদিন তাঁহারা বাড়ী থাকিতেন, কত দরিদ্র নিঃসহায় অন্ন বস্ত্র পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিত। কাহার বাড়ীতে দুর্গোৎসব না থাকিলেও দশ জন প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের আসা যাওয়া, পরস্পরের ভোজন আয়োজন, গ্রামের হিতকর আলোচনা, আপন আপন মধ্যে বিবাদ মীমাংসা নানা হিতকর অনুষ্ঠানে দ্বারা পল্লীর সঞ্জীবতা রক্ষা হইত।

এখন প্রধান দিগের অধিকাংশেরই সহরে বাসের পাকা বন্দবস্ত হইয়াছে, যেমন পাকা বন্দোবস্ত হইয়াছে তেমন স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে থাকায় বাড়ীতে আসার

ানও কমিয়া গিয়াছে। বধূমাতারাও উৎকল-বিপ্র-পুত্রগণের শ্রদ্ধা-ভক্তি কৃপা পাত্রী হইয়া মাতা শ্বশ্রূমাতাদিগের অন্নপূর্ণামূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়াছেন। পূর্ব্বে পূজা পার্ব্বণে বহুলোক নিমন্ত্রণে গৃহিণীরা স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া কি আনন্দ অনুভব করিতেন। কাঙ্গাল দরিদ্রেরা উদর পুরিয়া আহার পাইয়া—"মা ধন-পুত্র বৃদ্ধি হউক আমরা প্রতিবৎসর আসিয়া যেন প্রসাদ পাই" প্রাণের সহিত এই আশীর্ব্বাদ করিত। বিদেশে থাকিলেও পূজাপার্ব্বণ বিবাহ-চূড়া উপলক্ষে বাড়ী আসা তাদের একটা প্রাণের টান ছিল। আমরা কোন কোন প্রাচীনা গৃহিণীকে কোন কারণে কোন বৎসর পূজা উপলক্ষে বাড়ী আসার প্রতিবন্ধকে কাঁদিয়া আকুল হইতে দেখিয়াছি। এখন আর সে দিন নাই। বন্দের পূর্ব্ব হইতেই বৈদ্যনাথ, পুরী, কাশী বিন্ধ্যাচল কে কোথায় যাইবেন তাহার বন্দোবস্ত হয়। দেশে যাঁহাদের পূজা আছে, তাঁহারা পুরোহিত ঠাকুর বা জ্ঞাতিখুড়ার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরণ করিয়া লিখিয়া দেন "এবার হাত বড় টানাটানি, আমার শরীর ভাল না খোকাখুকী পরিবারদের সকলেরই শরীর খারাপ, ডাক্তারেরা চেঞ্জে যাইতে বলিতেছেন। যাহা পাঠাইলাম ইহা দ্বারা কোনমতে বার্ষিক রক্ষা করিবেন। খাওয়ান দাওয়ান এবার হবে না চেঞ্জে যাইয়া স্বাস্থ্যোন্নতি যাহা ভগবানের ইচ্ছা তাহাই হয়, অনেকে পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য লইয়াই ফিরিয়া আসেন। কেহবা কিছু হারাইয়াও আসেন। কেহ অস্থায়ী কিছু উপকার প্রাপ্ত হন। লাভের মধ্যে রেলওয়ে কোম্পানিরে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য, গৃহিণীগণের বহুদর্শন, স্বাধীন-বিচরণ, এবং অর্থধ্বংস হয় মাত্র। আমরা অবসর ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য উদ্দেশ্যে এরূপ অর্থব্যয় কর্ত্তব্য মনে করি; কিন্তু এখন আর ইহা ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন জন্য নয়, ইহা এখন সাধারণ প্রথা বা হুজুগ বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। চাকুরেগণ বন্দোপলক্ষে দেশে আসিয়া দেশের লোকের সহিত মেশা অপেক্ষা বিভিন্ন দেশবাসী সম্পদস্থ পরিচিত লোকের সহিত ২।৪ দিনের আলাপ আপ্যায়িতে অধিক সুখানুভব করেন। যে অর্থ ও যে সময় ব্যয় করিয়া বিদেশ গমনের সুখ অনুভব করেন, ইহারা যদি জন্মভূমি-পল্লীভূমির জন্য ইহার আংশিক সময় ও অর্থ ব্যয় করেন, তাহা হইলে পল্লীর দুরবস্থা এত হয় না সমবেত চেষ্টায় উন্নতি হইতে পারে।

অনেকে বলেন পাঁড়াগা এখন বাসের যোগ্য নয়, বন-জঙ্গলে পূর্ণ, ভাল জলের ব্যবস্থা নাই, আলাপ করিবার লোক নাই, ডাক্তার কবিরাজ নাই, ইত্যাদি। বধূমাতারাও সহরে বাস করিয়া এমনি অভ্যস্তা হইয়াছেন,—যাঁহারা

নিকৃষ্ট পল্লীতে জাত আবাল্য-যৌবন প্রতিপালিত সেই সকল বনজ কুসুমেরা আজ কয়েক দিন মাত্র সহরোদ্যানে আশ্রয় পাইয়া পল্লীতে জন্মস্থান ইহা মনে করিতেও যেন লজ্জা বোধ করেন। জন্মভূমির দোষ বর্ণনে তাঁহারা গর্ব্বিত বা কুণ্ঠিতা নহেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই; পল্লীগ্রামের এত দুর্দ্দশা কেন হইল? কে করিল? তোমাদের সহরের পর যে টান, বাড়ীর উপর যদি ইহার কিছু অংশ থাকিত তাহা হইলে ত পল্লীর এত দুর্দ্দশা হইত না। পল্লীতে তোমার পাকাবাড়ী কাঁচাবাড়ী যাহাই থাকুক; তুমি বৎসরের একবার বাড়ী আসিবে না বা কোটাটী অথবা কাঁচাঘরগুলি সংস্কারের জন্য যত্ন বা অর্থ ব্যয় করিবে না,—অযত্নে কিছুই রক্ষা হয় না, সুতরাং তোমার কোটাটীর জল নিঃসরণের নলটীর মুখ বন্দ হইয়া জলের ভারে ছাদটী নষ্ট হইল, দুই চারিটী বটের চারা গজাইল, উই ইন্দুরে কাঁচা ঘরগুলি নষ্ট হইল, লোকের গতিবিধি অভাবে বাড়ীটী জঙ্গলাকীর্ণ হইল, পুকুরটী অযত্ন ব্যবহারে পাঁক শেওলায় পূর্ণ হইল, সুতরাং ম্যালেরিয়ার বীজ সকল আসিয়া তোমার বাড়ী খানি অধিকার করিল। এই প্রকারে গ্রামের প্রধানদিগের ভাল বাড়ীগুলি যদি নষ্ট হইয়া ম্যালেরিয়ার জন্মভূমি হইল—দরিদ্রেরা সাধারণ স্বাস্থ্যের কি উন্নতি করিতে পারে। তোমারা আয়শীল-উপার্জ্জক, রুচিসম্পন্ন তোমরা দেশে যাতায়াত করিলেই অসুবিধা অনুভব করিয়া রাস্তা ঘাট সংস্কার জল নিকাশের বন্দোবস্ত সবই করিতে পার। লোকালবোর্ড ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড তোমাদেরই জানে চেনে, তোমাদের চেষ্টায় গ্রামের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, জলকষ্ট নিবারণ, স্কুলের সাহায্য গ্রামের উন্নতিকর সকল কাজই হইতে পারে। যেখানে ধনীর বাস সেইখানেই চিকিৎসকেরা উপার্জ্জন আশায় আশ্রয় লন। তোমাদের গতিবিধি অভাবেই পল্লীর উন্নতি সাধন হয় না এখন ভাবিয়া দেখ পল্লীগ্রাম বাসের অযোগ্য হওয়ার মুল কারণ—সেই পল্লীবাসী কি তোমরা। তুমি সহর মিউনিসিপালিটীর আলোকে গমনাগমন করিয়া নিরাপদ ও আনন্দ অনুভব কর। তোমার পৈতৃকগৃহে সকল ঘরে হয়ত তৈলের প্রদীপ জ্বালিবার সুবন্দোবস্ত নাই পল্লীত্যক্ত প্রথম পুরুষে হয়ত পৈতৃক পল্লীভবনের একটা ধারণা থাকে। পল্লীভবনে যাতায়াত না থাকিলে পরবর্ত্তী পুত্র কন্যাগণের পল্লীগ্রামের দৃশ্য কি রকমের সে ধারণাও থাকে না। আমার মনে আছে—আমার একটী ঘনিষ্ট আত্মীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পশ্চিমাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতার সহিত তথায় বাস করিতেছেন। পল্লীগ্রামের ভাব, দৃশ্য তাঁহাদের ধারণাই নাই।

আমার সেই বালক ভ্রাতুষ্পুত্র একদা আমারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জেঠা-মহাশয় আমাদের দেশে রাস্তায় আলো দেয় ত ? সকালবেলা ফেরিওয়ালারা 'খাবার' আনেত" সেই বালকের পিতা বাল্যকালে পিতৃভবনে চিড়া, মুড়ি, গুড় অথবা ফেণাভাত দিয়া প্রাতর্ভোজন সমাপন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। আজ তস্য পুত্রের পল্লীদৃশ্য ধারণা জন্মান দুষ্কর। একদিন সেই বালককে সঙ্গে লইয়া এলাহবাদে 'খসরুবাগ' দেখিতে যাই, একস্থানে সজ্জিত ক্রোটনোর'গাছ দেখাইয়া বালক বলিল "জেঠামহাশয় দেখুন কেমন সুন্দর গাছ, খুব দামি গাছ" আমি বলিলাম বাপুহে আমাদের দেশে জঙ্গলে এমন গাছ আছে—তখন বালক বিস্মিত হইয়া বলিল "তবে আমাদের দেশেও এসব পাওয়া যায় ?" বালক জানে না যে শরতকালে বঙ্গদেশের শস্যশ্যামলা কৃষিক্ষেত্র কত সুন্দর। দেশত্যাগী হইয়া বিদেশের প্রতি মমতা এবং বর্দ্ধিষ্ণুদিগের পল্লীত্যাগই যে পল্লীর অবনতি প্রধান হেতু, ইহা বোধহয় অধিক দৃষ্টান্তে বুঝাইতে হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত কারণ সকল দর্শাইয়া এখনকার প্রধান লোক অনেকে কর্ম্মস্থল জেলার উপর অধিক সম্পন্ন ব্যক্তিরা কলিকাতায় একটী বাড়ী করিতে পারিলেই আপনারে কৃতার্থ মনে করেন। এবং সম পদস্থ ব্যক্তির মধ্যে সম্মান ভাজন হইয়া থাকেন। এই প্রকারে পল্লীর সু-সন্তানদের পল্লীভূমির প্রতি অনাদর এবং সহরের প্রতি আদরেই পল্লীগ্রামের অবনতি ও সহরের উন্নতি হইতেছে। পল্লীগ্রামে চতুঃশালা অর্থাৎ চারিটী পোতা এবং একখানি বৈঠকখানার সংলগ্ন যে স্থানটুক প্রয়োজন, কলিকাতায় ততটুক স্থানের উপর একখানি বাড়ী আজ কাল ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে পাওয়া যায় না। যদি কোন ব্যক্তি ৫০০০০৲ হাজার টাকা লইয়া জন্মস্থান পল্লীগ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন ; তাহা হইলে তিনি এই টাকায় নিজ ভদ্রাসনে বাসোপযোগী পাকা কোঠা, একটী পুকুর, বার্ষিক সংসারের খরচের পরিমাণ ধানের জমি, ২।৪টী গাভী এবং দশঘর প্রজা করিয়া পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতে পারেন। কোন গ্রামে এ রকম ৪।৫ জন লোকের বসবাস থাকিলে সেই পল্লীর উন্নতি হয়। ইহাদের যত্ন চেষ্টায় রাস্তা ঘাট স্কুল চিকিৎসালয় সবই হইতে পারে। ইতর ভদ্র শিক্ষালাভ করিতে পারে, বিপদে সাহায্য পায়, গ্রাম্য বিসম্বাদের এত বাহুল্য থাকে না, পল্লী-ভবন আবার সুখের স্থান হয়। পূর্ব্বে কাহার অবস্থা ভাল হইলে তিনি কিসে পাঁচজন নিরন্নকে অন্ন দিবেন, কিসে গ্রামে পুষ্করিণী খনন, পথ ঘাট নির্ম্মান করিবেন, তাহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইত। এখন কাহার হাতে

দুপয়সার সংস্থান হইলে তিনি কিরূপে কলিকাতায় কি কোন সহরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া ব্যক্তিগত সুখানুভব করিবেন তাহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হয়। এ কারণে এক দিকে শুধু কলিকাতা নয় সর্ব্বত্র সহরের আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, অন্য দিকে প্রাচীন প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রাম সকল ম্যালেরিয়ার রঙ্গভূমি হইয়া মহাবনে পরিণত হইতেছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা স্থানান্তরে চলিয়া গেলে গ্রাম রক্ষা কে করিবে, কাজেই তাঁহাদের স্থান ম্যালেরিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কলিকাতার লোকেরা সহরের অবিশ্রান্ত কোলাহল, ঘোড়া গাড়ীর ঘর্ঘরশব্দ, রাস্তার ধূলা, কয়লার ধূম নির্ম্মল-আবাস বায়ুর অভাব অনুভব করিয়া উপনগর বা পল্লীগ্রামে বাগান বাড়ীর অনুসন্ধান করেন; আর আমরা তাদৃশ ধনবান্ না হইয়াও, মিউনিসিপাল মার্কেটের কপি, সালগম, কড়াই শুঠী, বরফ, কুল্পির লোভে, থিয়েটার সার্কাস দর্শন লালসায় শান্তি-নিকেতন পল্লীভূমিকে পদদলিত করিয়া সহরের অধিবাসী হইতে উৎসাহী হইয়াছি।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" আমরা এই মহাবাক্য উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত করিয়া, নারিজাতির উন্নতি, সাধন এবং ভারতমাতার উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। সত্যই উভয়টী জননী জন্মভূমির সন্তানের কর্ত্তব্য। নারী-জাতি আমাদের জননী, ইহা জননী শব্দের ব্যাপক অর্থ। যিনি দশমাস আমাদের গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করিয়াছেন, শত ক্লেশ সহ্য করিয়া, দয়া-ময়ী রূপে স্নেহ মমতায় প্রতিপালন করিয়াছেন সেই গর্ভধারিণী জননীই আমাদের অগ্রে প্রতিপাল্য, তাঁহার ক্লেশ নিবারণ সুখবর্দ্ধন করিয়া পরে সমস্ত নারিজাতির উন্নতির চেষ্টাই যেমন কর্ত্তব্য, তেমন আমরা যে গ্রামে যে পল্লীতে যে পৈতৃক বাটীতে ভূমিষ্ট হইয়াছি সেই গ্রাম সেই পল্লীই আমাদের প্রকৃত জন্মভূমি। সেই বাটী সেই পল্লী সেই গ্রামই সংসার জন্মভূমির কেন্দ্রস্বরূপ। আমরা আগে সেই কেন্দ্রস্থান অবলম্বন করিয়া জন্মভূমির বঙ্গজননীর—ভারত মাতার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইব। যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাবান্ হইয়া পিতা মাতার ক্লেশ নিবারণ করিতে উপেক্ষা করে তাঁহাকে যেমন অকৃতজ্ঞ বলা যায়, তেমন যিনি অগ্রে জন্মভূমির হিত চেষ্টা না করিয়া পরদেশের জন্য ব্যাকুল হন তিনি পরোপকারী হইলেও তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ বলা দোষের হইবে কি? জন্মমাটী মা—টী মাতৃতুল্য। আমরা কামস্কাটকার দুর্ভিক্ষে শত মুদ্রা দান করিয়া গেজেটে নামটী দেখাতে, উৎসুক থাকি। কিন্তু আমার পল্লীবাটীর প্রতিবেশী গরিবউল্লা, দুখীমামুদ, কাঙ্গালি মণ্ডলের পরিবারবর্গ যে

অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া আছে সে সন্ধান পাইয়া আমরা তার কতটুক্ প্রতিকারে সচেষ্ট হই। আমরা সহরের টাউনহলের চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর সময় আপন পদ সম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য রাখি—কিন্তু নিজ গ্রামের স্কুল ঘরখানি সংস্কারের জন্য কয়জন মুক্তহস্ত হই। সহরের চেরিটেবেল ডিস্পেন্সরির জন্য চাঁদা দিয়া দয়ার পরিচয় দেই—কিন্তু নিজ গ্রামে আমি একজন চিকিৎসককে অন্ন ও আশ্রয় দিলে তাঁহার দ্বারা নিজ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকের কত উপকার হয়। তখন মনে হয় আমার ছেলে পেলেও সহরে আছে; দেশের লোকের জন্য এত মাথা ব্যাথা করিলে আমার কুলাইবে কেন। সহরবাসী পল্লীসন্তান অনেকে আমাদের একশত সভ্যতা প্রমাণ করিবেন। তবে আমরা একথা বলি না যে পল্লীজননীর প্রতি সকলেরই এই প্রকার ব্যবহার। যাঁহারা পল্লীর দুরবস্থার জন্য দুঃখিত ও পল্লীর উন্নতির জন্য চেষ্টিত তাঁদের চেষ্টায় কুলাইতেছে না। আধুনিক রুচি অনুসারে পল্লীবিস্মৃত সহর ঘোষার সংখ্যাই অধিক। সুতরাং সমবেত চেষ্টা ভিন্ন ২।৪ জনের চেষ্টায় পল্লীর অবনতি নিবারণ অসম্ভব।

অনেকে মনে করেন কালের স্রোতে যাহা হইতেছে তাহার প্রতিকূল চেষ্টা বৃথা। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, ভাঙ্গা গড়া ভগবানের খেলা তাহা সত্য; সহরের উন্নতি পল্লীর অবনতি ইহা যে ভগবানের ইচ্ছায় হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। আবার ইহাও সত্য যে রোগও ভগবানের ইচ্ছায় হয়, আরোগ্যও ভগবানের ইচ্ছায় হয়, ভগবানই চিকিৎসক রূপ পরিগ্রহ করিয়া অভিনয় করেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে সুখ দুঃখ সৃষ্টিরও হ্রাসবৃদ্ধির জন্য কতকগুলি ক্ষমতা দিয়াছেন, যদিও তাহার ফলদাতা ঈশ্বর—তথাপি মনুষ্যকে বিবেক বুদ্ধি দিয়া তদনুসারে কর্ম্মকরা শক্তি দিয়াছেন তদ্দারা পরিচালিত হইয়া মানুষ আপন আপন দুঃখ নিবৃত্তিও সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারেন। যদিও ইহার মূলে ঈশ্বর কর্ত্তা তথাপি মানুষের চেষ্টা ভিন্ন ইহা সম্পন্ন হয় না।

অনতিবিলম্বে এমন দিন আসিবে যখন সহরবাসী পল্লীসন্তানগণ আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পল্লীগ্রাম প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমরা এখন কুত্রাপি কাহার মুখে এমন আভাস জানিতে পাই। তাহাহইলে পল্লী আবার সুখ শান্তির বাসস্থান হইবে। ব্যষ্টি পল্লীদ্বারাই সহরেরও অনিষ্ট আছে সন্দেহ নাই।

কোন কবি বলিয়াছে-
কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে,
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর।
তেমন সুন্দর এই অবনী মাঝারে,
আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর।
সেই আমার পল্লী জন্মভূমি।



মানবধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে আচার্য্যাদি শব্দের অর্থ এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা।

লেখক—সম্পাদক।

প্রশ্ন। আচার্য্য কাহাকে বলে ?

উত্তর। উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যপয়েৎ দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করিয়া তাহাকে সকল্প সরহস্য বেদ অধ্যাপনা করান তাহাকে আচার্য্য বলা যায়। কল্প শব্দের অর্থ যজ্ঞ বিদ্যা, রহস্য শব্দের অর্থ উপনিষৎ। উপনিষৎও বেদের অন্তর্গত, কিন্তু উপনিষদের প্রাধান্য ঘোষণা করার জন্য, উহার কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। আচার্য্য শিষ্যের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন না, কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে তাহাকে বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই শব্দটির কিরূপ অধোগতি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। আচার্য্য ব্রাহ্মণ বলিলে আমরা কি শাস্ত্রের আচার্য্য বুঝি ?

প্রশ্ন। উপাধ্যায় কাহাকে বলে ?

উত্তর। একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥

যিনি বেদের একাংশ কিম্বা ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন তাহাকে উপাধ্যায় বলা যায়।

প্রশ্ন। গুরু কাহাকে বলে ?

উত্তর । নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথা বিধি ।

সংভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে ॥

যিনি পিতার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া যথাশাস্ত্র গর্ভাধানাদি সংস্কার করান এবং অন্নের দ্বারা পরিবর্দ্ধন করেন, সেই বিপ্রকে গুরু বলা যায় ।

প্রশ্ন । ঋত্বিক্ কাহাকে বলে ?

উত্তর । অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্মখান্ ।

যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে ॥

যিনি আহবনীয়াদি অগ্নি উৎপাদক কর্ম্ম (যাহাকে অগ্ন্যাধেয় বলা যায়) এবং অষ্টকাদি পাকযজ্ঞ এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বৃত হইয়া সম্পাদন করান তাঁহাকে ঋত্বিক্ বলা যায় ।

য আবৃণোত্যবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণাবুভৌ ।

স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তং ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন ॥

বর্ণস্বরের বিশুদ্ধতা সহ যিনি বেদমন্ত্রদ্বারা কর্ণযুগল পবিত্র করেন, তিনিই মাতা, তিনিই পিতা ; কদাচ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না ।

উপাধ্যায়ান্দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা ।

সহস্রং তু পিতৃর্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥

দশজন উপাধ্যায়ের সমান একজন আচার্য্যের ; শত আচার্য্যের সমান পিতার ; এবং সহস্র পিতার সমান মাতার গৌরব অধিক হইয়া থাকে ।

উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা ।

ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥

উৎপাদক অর্থাৎ জনক এবং আচার্য্য উভয়েই পিতা, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বেদমন্ত্র দাতা আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ, কারণ বেদমন্ত্র গ্রহণের দ্বারা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই নিত্যপদার্থ প্রাপ্তির অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয় ।

অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ ।

তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপ ক্রিয়য়া তয়া ॥

যিনি শিষ্যকে শ্রুতির অল্পাংশ বা অধিকাংশ পাঠ করাইয়া শিষ্যের উপকার করেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিবে ।

ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা ।

বালোপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ ॥

যিনি ব্রাহ্মজন্ম দান করেন, অর্থাৎ ব্রাহ্ম উপনয়ন সম্পাদন করেন এবং

স্বধর্ম্মের শাসন করেন তিনি বয়সে বালক হইলেও ধর্ম্মতঃ বৃদ্ধেরও পিতৃতুল্য।

অধ্যাপয়ামাস পিতৄন্ শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ।
পুত্রকাইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্যতান্॥

বিদ্বান্ শিশু আঙ্গিরস তাঁহার অধিক বয়স্ক পিতৃব্য পুত্রদিগকে বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন, এবং জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া হে "পুত্রক" এইরূপ সম্বোধন করিয়াছিলেন।

তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবানাগতমন্যবঃ।
দেবাশ্চৈতান্ সমেত্যোচুর্ণ্যার্য্যং বঃ শিশুরুক্তবান্॥

তাঁহার পিতৃব্য পুত্রেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা আঙ্গিরসের পিতৃতুল্য, তথাপি কেন সে আমাদিগকে "পুত্রক" বলিয়া সম্বোধন করে? তাহাতে দেবতারা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন "যে হেতু তোমরা অজ্ঞ বলিয়া শিশুতুল্য, অতএব তোমাদিগকে "পুত্রক" সম্বোধন করা ন্যায্য হইয়াছে।"

অজ্ঞো ভবতি বৈবালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্॥

অজ্ঞই বালক এবং মন্ত্রদ ব্যক্তি পিতা এই জন্যই অজ্ঞদিগকে বালক বলা হইয়া থাকে এবং মন্ত্রদদিগকে পিতা বলা হইয়া থাকে।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥

বয়স কেশাদির শুক্লতা, ধনবত্তা, সম্বন্ধ, গুরুত্ব দ্বারা মহত্ব হয় না। ঋষি-দিগের এই ধর্ম্ম উপদেশ যে যিনি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই আমা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাং তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥

জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব, বীর্য্য দ্বারা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব, ধনধান্যাদি দ্বারা বৈশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বয়সের অধিক্য দ্বারা শূদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্নীত হইয়া থাকে।

(জ্ঞান, শৌর্য্যবীর্য্য এবং ধনধান্য, বিরহিত শূদ্রের পক্ষে বয়সের আধিক্য দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব স্থিরীকৃত হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই)।

নতেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

শুক্ল কেশের দ্বারা বৃদ্ধত্ব হয় না, যুবা হইয়াও কোন ব্যক্তি পণ্ডিত হইলে, দেবতারা তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলিয়াছেন। (লোকে বয়সের দ্বারা বৃদ্ধ হয় না, বৃদ্ধ হয় জ্ঞান দ্বারা)।

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ এবং অবিদ্বান্ বিপ্র এই তিনই নামমাত্র, কোন কার্য্যে আসে না।

যথাষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥

যেমন নপুংসক স্ত্রীতে নিষ্ফল, যেমন গবী গবীতে নিষ্ফলা, যেমন অজ্ঞে দান নিষ্ফল, তদ্রূপ অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও নিষ্ফল।

বিশ্ব-যজ্ঞে হিন্দুর স্থান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভারতে অনেক সময় অনেক ধর্ম্ম-চিলের মত ছোঁ মারিয়া এ জাতির বৈশিষ্ট্য টুকুকে কাড়িয়া লইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্মের উপর দিয়া যত "কালাপাহাড়ী" অত্যাচার হইয়াছে; পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মের উপর দিয়া ততটা হয় নাই। তবুও যে এই ধর্ম্ম এতদিন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বিদ্যমান ছিল তাহা এ জাতির অকাট্য ধর্ম্মবিশ্বাস সন্দেহ নাই।

ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি পাঠে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনের পূর্ব্বে হিন্দু জাতির জীবন সত্য, সরলতা, ধর্ম্মের দিকে ধাবমান ছিল। তখন জ্ঞান ও কর্ম্মে এবং ভোগ ও মোক্ষে সামঞ্জস্য ছিল। তাই রাজার রাজ-সিংহাসনের দক্ষিণে রাজার উপরও রাজা মহাত্যাগী সন্ন্যাসী বামুনিকে দেখিতে পাই। রামচন্দ্রের পার্শ্বে বিশ্বামিত্র, যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে বশিষ্ট প্রভৃতি কৌপীন সর্ব্বস্বকে রাজের সর্ব্বেসর্ব্বা দেখিতে পাই। আর্য্য-ঋষিরা ত্যাগের মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজের ভোগ-জীবনকে গঠিত করিয়াছিলেন। তাই বেদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ

চতুর্ব্বর্ণ সাধনেরই বিধান আছে এবং ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের ব্যবস্থা আছে। যতদিন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রলয় ঝঞ্ঝাবাত ভারতে অবতীর্ণ না হইয়াছিল, ততদিন বর্ণাশ্রম বিধি হিন্দু জাতির মধ্যে অব্যাহতই ছিল। কিন্তু রাজকীয় সহায়তায় বলীয়ান্ হইয়া হঠাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া যে মোক্ষ লাভ হয়-এই বাণী প্রচার করায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু নির্ব্বাণ, মুক্তির জন্য মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার ফলও হাতে হাতে ফলিল। কর্ম্মমার্গ একেবারে অনাদৃত হওয়ায় হিন্দু সমাজে কেবল মোক্ষ মার্গই ফলিতে লাগিল। মোক্ষ মার্গের অনধিকারীরা কর্ম্মত্যাগী হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান জড় স্বভাবে পরিণত হইল। প্রকৃত বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে দেশে এক অবসাদ, এক দারুণ কর্ম্ম হীনতার সৃষ্টি হইল। সেই জড়তাই ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্ম-রাজ্য হইতে আমাদিগকে জড় রাজ্যে আনিয়া উপস্থিত করিল। তারপর ঘোর জড়বাদী পাশ্চাত্য যখন বিজেতা যখন প্রবল ক্ষমতা লইয়া এ দেশে উপস্থিত, তখন আরও অনুকূল বাতাস পাইয়া হিন্দুজাতির জড়প্রীতি আরও পূরা মাত্রায় ফুটিয়া উঠিল—ত্যাগের পথ ছাড়িয়া হিন্দু ভোগের পথকেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বলিয়া আকড়াইয়া ধরিল। পূর্ব্বে কর্ম্মের সহিত মোক্ষের ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল—তখন কর্ম্মই মোক্ষ লাভের পথ ছিল। জনকাদি রাজর্ষিগণ, পরীক্ষিতা রাজন্যগণ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের প্রবর্ত্তনের পর হইতে এই কর্ম্মকাণ্ড শিথিল হইয়া পড়ায়; হিন্দুজাতি না হইয়াছে প্রতীচ্যের ন্যায় রাজসিকগুণ সম্পন্ন বীর্য্যশালী ও শক্তিশালী, আবার না হইয়াছে বিষয়ভোগ চিন্তা-বিরহিত মোক্ষমার্গের অধিকারী—এ জাতি এক মহা তমঃগুণসম্পন্ন, দারুণ অবসাদগ্রস্ত, শক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, আসল, জড়ভাবাপন্ন এক মৃতজাতিতে পরিণত হইয়াছে।

বিশ্বজগতে আজ কর্ম্মের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের এই কর্ম্মযজ্ঞে কোন জাতিই নিশ্চেস্ট নহে। প্রত্যেক জাতিই তাহার আপনাপন হবিরাশি লইয়া এই মহাযজ্ঞে আহুতি দিতেছে। ভারত কি পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে? যতদিন বিশ্বের কোলাহল হইতে দূরে—অতি দূরে নিভৃত তপোবনের মত তারও স্নিগ্ধ ও শান্তভাবে ভারত পড়িয়াছিল তখন অবশ্য বিশ্বের ভেরী তাহার কর্ণে পৌঁছায় নাই, বিশ্বের যজ্ঞে তাহাকে পৌরহিত্য করিতেও কেহ ডাকে নাই। কিন্তু আজ ত আর তাহা নাই। আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জড়বিজ্ঞানের এমন লৌহতারে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, যে তাহাকে আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার উপায় নাই। জগতের এই বিশ্বযজ্ঞে সকল জাতিই তাহাদের দেশ

মাতৃকাকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়া—হীরা-রত্ন-মণি-মাণিক্যখচিত নীলাম্বর পরাইয়া কেমনভাবে উপস্থিত করিয়াছে, আমাদের দেশজননী কি ছিন্নকন্থা জীর্ণবাস পরিধান করিয়া বিষাদমুখে এই মহাযজ্ঞের এক প্রান্তে দীনা-হীনা-কাঙ্গালিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবেন? এই কি ত্রিশ কোটি সন্তানের মাতৃ-ভক্তির পরিচয়? দেবী আজ দাসীর মত জগতের কাছে লাঞ্ছিতা, দলিতা হইবেন?

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাসাৎ অগ্রজন্মনঃ
স্বং স্বং চরিত্রন্ শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ।"

এ দেশেরই ব্রাহ্মণই না জগতে প্রথম সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিল? চীন, জাপান, মেক্সিকো, মার্কিণে কাহাদের সভ্যতা আজিও বিদ্যমান? সে কি এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির নহে? যদি তাই-ই হয় তবে যে নিষ্কাম কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা হিন্দুজাতি জগতের মুকুটমণি হইয়াছিল, সেই নিষ্কাম, নিস্পৃহ কর্ম্মকাণ্ডকেই আশ্রয় করিতে হইবে। গীতায় ভগবান পাঞ্চজন্য নিনাদে বলিয়াছেন—

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যু পপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

আজ এই বিশ্বযজ্ঞে আসন পাইতে গেলে ক্লীবত্ব ত্যাগ করিয়া—হৃদয় দৌর্ব্বল্য ছাড়িয়া অন্য জাতিরই মত "মানুষ" হইতে হইবে। কর্ম্মহীন অবসাদ-গ্রস্ত কখনও কর্ম্মীর পার্শ্বে স্থান পাইতে পারে না! আজ সমগ্র বসুন্ধরা এক মহা কর্ম্মযজ্ঞে সমাসীন—দিন নাই, রাত নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল কর্ম্মের তুমুল কোলাহল বিশ্বের চতুর্দ্দিক হইতে ভৈরব গর্জ্জন করিতেছে, আর এ সময় আমরা কি কর্ম্মহীন জড়ের মত কেবল পর্ব্বতগুহায় বসিয়া মোক্ষলাভের জন্য অঙ্গে বিভূতি লেপন করিব?

ন কর্ম্মণা মনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমাধি গচ্ছতি।

ইহা ভগবদ্বাণী। কর্ম্ম না করিলে সমাধি হয় না—কর্ম্ম না করিলে মোক্ষ হয় না—কর্ম্মী না হইলে সেই "বিশ্বকর্ম্মী"কেও পাওয়া যায় না।

জগতের সমুদয় জাতি আজ কর্ম্ম করিয়াই জড়বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছেন। তফাৎ এই; তাহারা যে কর্ম্ম করে, তাহা সকাম সে কর্ম্মের লক্ষ্য—ভোগ; আর হিন্দুজাতি পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিত তাহার লক্ষ্য ছিল নিষ্কা-

মতা ও ত্যাগ। সকামভাব হইতেই নিষ্কামতা আসে। ধ্রুব রাজ্য প্রাপ্তির জন্য সকামভাবে সাধনা করিয়াই শেষে যখন জগন্মোহিনী মা তাঁহাকে দর্শন দিলেন তখন তিনি রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট সেই শ্রীপাদপদ্মই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সকামই হউক আর নিষ্কামই হউক—কর্ম্মই মানুষের জীবনের লক্ষণ। কর্ম্মহীন মানুষ অস্থি, মজ্জা, মাংসপিণ্ডের একটা পুঞ্জীভূত পিণ্ড মাত্র। আজ বিশ্বে যে কর্ম্মের যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে—যে কর্ম্ম করিয়া প্রতীচ্য আজ হৈম কিরীটবিমণ্ডিত হইয়াছে, সেই কর্ম্মের মধ্যে প্রাচ্যকে ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে। এই বাণীই আজ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া ঘন ঘন আঘাত করিতেছে। বিশ্বের এই সাদর আহ্বানকে কি আমরা অবহেলায় ফিরিয়া যাইতে দিব? বিশ্বের যজ্ঞে হিন্দু কি আবার হোতার আসন গ্রহণ করিবে না? হাঁ করিবে বৈ কি! বিশ্ব যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়া গৌরবের কনক-কীরিট পরিয়াছে, সেইভাবে হিন্দুও আজ তাহাদের জীবন ও সমাজকে গঠন করিয়া তুলিবে। হিন্দু আজ অবসাদের সমস্ত শৃঙ্খল বীরের মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া সমাজের বেড়ী ভাঙ্গিয়া বিশ্বের যজ্ঞস্থলে উপনীত হইবে। ভারতের বীরত্ব, ভারতের শূরত্ব, ভারতের ধন, ঐশ্বর্য্য, বৈভব দেখিয়া সব স্তম্ভিত হইবে। এক একটা মূর্ত্তি পুরুষাকাররূপে আজ ভারত—আজ জগতকে দেখাইবে যে ভারত এখনও মরে নাই এখনও ভারতীয় হিন্দুর প্রাণ আছে এখনও হিন্দুর ধমনীতে কর্ম্মের স্রোত তির তির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। জগত দেখুক, জগতের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু শিক্ষিতব্য তাহা ভারতই গ্রহণ করিতেছে। হিন্দু আজ জড়বিজ্ঞানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবার জন্য বংশীর বীণাধ্বনি ছাড়িয়া দামামার ভৈরব গর্জ্জনকে আলিঙ্গন করিতে শিখিয়াছে—হিন্দু আজ সঙ্কীর্ণতার কুটিল বক্র পথ ছাড়িয়া উদারতার ঋজু-প্রসারিত বিশাল পথকে অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে। জগত দেখুক, হিন্দুর সন্তান আজ ঊর্ম্মিময় তরঙ্গকে উপহাস করিয়া বিশ্বের জ্ঞান আহরনের জন্য ছুটিতে শিখিয়াছে হিন্দুর সন্তান আজ শঙ্খ ঘণ্টার আরাব ছাড়িয়া কল কারখানার শ্রবণ-নিনাদী-নাদ শুনিতে, শিখিয়াছে। হিন্দুর ললনা আজ বিশ্বযজ্ঞে স্থান গ্রহণের জন্য অন্তঃপুরের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শক্তি-স্বরূপিণী স্বরূপে দ্যুতিময়ী মূর্ত্তিরূপে বিদ্যুৎ বিকাশ করিতে করিতে অন্ধ হিন্দুনরকে পথ দেখাইয়া লইতে শিখিয়াছে। আজ লাঞ্ছিতা, অবহেলিতা দেশ মাতৃকা বিশ্বযজ্ঞে রাণীর মত বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া সগৌরবে দাঁড়াইতে চান,

তুমি আমি তাঁর সন্তান থাকিতে তিনি কি দীনা হীনা কাঙ্গালিনী বেশে বিশ্ব-যজ্ঞের একপ্রান্তে—আস্তাকুড়ে দণ্ডায়মান হইবেন ? সে যে ভাই আমাদের ঘোর কলঙ্কের কথা। তার চেয়ে মরণ ভাল। সেই জন্যই বলিতেছি বিশ্বের যাবতীয় জাতি আজ যে পথ ধরিয়া মহতো মহীয়ান্ হইয়াছে সেই পথকেই আমাদের আজ অবলম্বন করিতে হইবে—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।



স্বর্গ-সিংহাসন।

লেখক—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্রষ্টা—একি হেরি অপরূপ
শুভ্র-জ্যোতি প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রতিকৃতি।
কে তোমরা
বারেক বলিয়া দেহ মোরে ?
দিলে একি বুকে এনে
উল্লাসের দিব্য শিহরণ ?
বলে দাও বারেক আমার
কিসের এ পুলক কম্পন ?
কাহার হিল্লোলে বল মোর
উঠিছে ফুলিয়া বুক আবেগ-রভসে।

[পুনঃ—সঙ্গীত]

হে গুণজ্ঞ কর গুণের সম্মান।
যে গুণী সে জানে গুণের সন্ধান।
হৃদয়ের স্নেহ ভাঁড়ার উজারি
আসিয়াছি সকল নিঙ্গারি
করো না করো না তার অপমান।

স্রষ্টা—বল—বল—হে সুন্দরী।
স্বরূপ কি তব ?

বল তব কোন মূর্ত্তি ধ্যানে রত
মন্ত্রমুগ্ধ নিখিল ভুবন।
তুমি কি প্রেয়সী ওগো বিশ্ব-জগতের ?
কবি কি আঁকিতে ব্যস্ত স্বরূপ তোমার ?]
তুমি কি ফুটিয়া ওঠ
চিত্রকর রেখা বর্ণময় কত্র
তুলিকা সম্পাতে ?
ভাস্করের যত্নে রচা খোদিত ছবিতে ?
বল হে সুন্দরী মম,
তুমি কি লোকের বুকে
জ্বালাইয়া তোল
লালসার তীব্র কালানল ?
কে তুমি—
তপস্যা বিরুদ্ধ ভাব
উদ্দীপিত করে দিলে বুকেতে আমার।

কাম—দেব সদাগতি,
চঞ্চল গমনে চল উড়িয়ে অঞ্চল উর্ব্বশীর।
ভয় হয় মনে ;
একি তীব্র চিত্তজয়ী মুনি।
দু'দণ্ডের পেলে অবসর—
ত্যাগ ভস্মে ফেলিবে ঢাকিয়া।
কার্য্যে হব অপারক মোরা।

[পুনঃ সঙ্গীত]

কারোত প্রেয়সী নই
কাহারও দইনিক' প্রাণ ;
সকলে তাদের সব
আমারে করিতে চাহে দান।
আমি সকলের প্রিয়
আমারে সকল দিও
দেওয়ার সুখেতে মেতে

চেও না চেও না প্রতিদান।

স্রষ্টা—তুমি কি প্রেয়সী নহ ?
তবে কি জননী তুমি জগৎ জনের ?
বিশ্ব বুঝি মাতৃবেশে চাহিছে তোমায় ?
তাই এই অপরূপ রূপ লীলা তব ?
তাই কি আনিয়া দেহ বক্ষ মাঝে মোর
পুলকের দিব্য-শিহরণ ?
তাই কি তোমারে দেখে
কেঁপে ওঠে হৃদয় আমার ?
কোলে যেতে ব্যাকুলিত ভূতদেহ মোর ?
তুমি বুঝি জননীর বাহু আবরণ
মাতৃস্নেহে ঢেকে আছ সমগ্র জগৎ ?

[পুনঃ গীত]

তারে কেন নিতে চাও পুণ্যের সরসে ?
পাপের শয়নে ও-যে শুয়ে আছে হরষে।

স্রষ্টা—গেওনা গেওনা গান
চটুল ছলনাময়ী নারী।
মাতৃবেশে লালসার উলঙ্গ সঙ্গীত
ঢালে বিষ শ্রবণ বিবরে।

[পুনঃ গীত]

মা নই মা নই আমি, মা মা বলে ডেক না,
আমারে পাওয়ার তরে মিছে আর কেঁদ না।
আমি ত কাহারো নই আমারো ত নাইরে।
কার দেহ কার তরে মিছে শুধু বহিরে
আমি ওগো দেহ শুধু ভোগাবিল মানসে।

স্রষ্টা—তাও কি সম্ভব হবে নারী ?
কেহ নও—কিছু নও
শুধু মাত্র ভোগের আধার।

পবন—তাইত ?
একি হল অকস্মাৎ ভোজবাজি মত

থেমে গেল রমণীর বিলাস বিভ্রম।
কোন কুহকের জালে
উড়ে গেল চিত্তের বিকার।
ও উর্ব্বশী ও মেনকা
ভুলে গেলে দেবেন্দ্র নিদেশ ?
এস এস ফিরে
গাহ পুনঃ লালসার গান।
ও কি! কণ্ঠ তবু নীরব নিঝুম।
তোলে নাক কামনার সুর।

স্রষ্টা—না—না ;
এবার বুঝেছি আমি দেবী।
কমনীয়া কন্যারূপে তুমি নারী।
জনক জননী হৃদে
বহাইয়া দেছ তীব্র স্নেহ প্রস্রবণ
হে কুমারী,
লাস্য-লীলা মধুর সঙ্গীত
এই বুঝি বালক্রীড়া তব ?
হে অনন্তের সরহস্য মুর্ত্ত্য যবনিকা
বল—বল কোন ছবি
নিত্য বিরাজিত অন্তরে তোমার ?
সংশয়ের তীব্র জ্বালা
সহিতে পারিনে আর।

[পুনঃ গীত]

মোরা—কুমারী নামের প্রভু অনধিকারী
তাই—সরল সহজ কথা বলিতে নারি।
ধূলাতে করিয়া আছি মাথাটি নত,
মোদের ব্যথার গাথা গাহিব কত ?
মোরা—নিজেরো ভরসা নাহি করিতে পারি।
তুমি ত' জগতগুরু কামনাজয়ী ;
আমরা পাপের খেলা ছলনাময়ী।

ভালো ত' লাগে না বুক পাষাণে বেঁধে
হাসিয়া আলাপ করি আমরা সেধে।
যার—রজত কণক হিরা আমরা তারি।
ভেসনা মোদের তরে আঁখির জলে
ব্যথিতা পতিতা দুখে যেও না গলে।
আমরা সাকার ভবে পাপের কণা
কাল বিষধর আছে লুকিয়ে ফণা
ওগো!—এবার গেলাম চলে কেবলি হারি।

ত্বষ্টা—বুঝেছি—বুঝেছি আমি
অনন্ত-রহস্যময়ী দেবী।
চাহি না স্বরূপ তব করিতে নির্ণয়।
যে হও-সে হও-তুমি তবু নারী।
আদ্যাশক্তি মহামায়া অংশভূতা
মাতা তুমি—তুমি কন্যা
হে প্রেয়সী,
একাধারে ত্রিশক্তি-রূপিণী।
তোমারে স্থাপনা করি'
মাতৃ-মন্ত্রে হইব সাধক।
এস ত্বরা তনয়ের সাথে
প্রতিষ্ঠিত হবে মাতঃ!
কুটীরে আমার।

[উর্ব্বশী মেনকার সহিত ত্বষ্টার প্রস্থান]

[মদন ও পবনের বিহ্বলভাবে অবস্থান]

[নারদের প্রবেশ]

নারদ—বলিহারি ব্রাহ্মণ। যার এতদূর চিত্তজয়ের ক্ষমতা কার সাধ্য তার সমাধি ভাঙ্গে। চিরস্মরণীয় দিন আজ তোমার, উর্ব্বশী মেনকা পরাজিত মন্মথকে মথন করেছ। ধিক শতধিক আমাকে। আমি এই বুদ্ধি, এই ধারণা নিয়ে বিধাতার বিচার করতে বসেছিলাম। করুণাময়! তুমি কোন পথে কাকে কোথায় ওঠাও-কোথায় নামাও যেন এ বুদ্ধি নিয়ে আমরা তার বিচার করতে না যাই—সেই রকম মনের বল দেও প্রভু! নারায়ণ! হরি নারায়ণ।

[প্রস্থান]

৫ম দৃশ্য।

স্থান—ত[illegible] অপর অংশ।

যোগাসনে

স্রষ্টা—যে ভাবে হোক্ না কেন—
পার্শ্বে যদি ডাক রমণীরে ;
রমণী আপন মোহ করিবে বিস্তার।
মাতা হোক্-কন্যা হোক্
পত্নী হোক্ কিবা
তবু তার প্রভাবের দিব্য মায়াজাল
কাটান' দুষ্কর।
মায়ার অপূর্ব্ব জালে
বিশ্বেরে কি নারী তুমি করেছ বন্ধন।
তুমিও হয়েছ বদ্ধ
উর্ণনাভ জড়িত যেমন নিজ তন্তু জালে।
হে অনন্ত মায়াময়ী রহস্যের সাকার প্রতিমা
একি লীলা তব ?

[কিঞ্চিৎ চিন্তানন্তর]

হে রমণী, কেন বল
অন্তরে জাগিয়ে তোল অতৃপ্ত কামনা।
সৃজনের সাত্ত্বিকতায়
নাহি কোনো প্রয়োজন।
এস তুমি সংহারের অবিকারি তমঃ।
কেন এই অপরূপ চিন্তারাশি
তুলে দিলে অন্তরে আমার।
কাজ নাই-কাজ নাই-মিথ্যা ভাবনায়।
আত্মতত্ত্ব সমাধিতে হই নিমগন।
চরমে সফল হবে সাধনা নিশ্চয়।

[যোগে নিমগন]

[গাহিতে গাহিতে সূত্রধর ও সূত্রধরপত্নীর প্রবেশ]

সূ—কাট কেটে আমি চালাই সংসার।

সূ-প—ওগো। আমি করি কাটের কারবার।
সূ—কাট কেটে আমি চালাই সংসার।
সূ-প—কাটে ভাত আপনি রাঁধি
কাটের তাড়ায় আঁটি বাঁধি
সূ—কাটে আমি দুয়ার গড়ি জানালা গড়ি আর।
সূ-প—কাট কেটে তুমি চালাও সংসার।
সূ—কৌশলে আর যত্ন করে আমি গড়ি খাট
সূ-প—তাইতে আমি শুয়ে পড়ি হোয়ে চিৎ পাট
সূ—আমার শিল্পে আছে জগৎ ভরি'
আমি, কানুন কেটে নগর গড়ি
সূ-প—আমি, সেই কাটেতে পরখ করি
(ও তোর) পিঠের চামড়ার ভার।
সূ—কাট কেটে আমি চালাই সংসার॥

[ইন্দ্রের প্রবেশ।]

ইন্দ্র—মহাজ্যোতিষ্মান স্বষ্টা সাধক প্রবর।
অসম্ভব এর হতে সৃষ্টি-বিফলতা।
নিশ্চয় এমন ইন্দ্র করিবে সৃজন,
যার হতে মোর নাম
লুপ্ত হবে জগৎ ভিতরে।
ঋণ, অগ্নি আর শত্রু
শেষ নাহি রাখিবে জগতে,
অল্প হলেও অবসানে থাকে যদি কিছু
তাহা হতে মহাবীজ হইবে উদ্ভূত।
যে বীজের ফলে—
ভরে যাবে নিখিল ভুবন।
উর্ব্বশী, মেনকা
হেরে গেল ছলনায়।
পবন মদন পরাজিত এর কাছে।
কিন্তু—
কিন্তু আজও বাকি আছে বাসব আপনি।

উন্মুক্ত কৃপাণে
তোর মুণ্ড আজি ফেলিব কাটিয়া।
ভাসাইয়া দিব দেহ ভোগবতী জলে।
[খড়্গস্তম্ভন অনুভব করিয়া]
একি—একি হল ;
খড়্গ হল স্তম্ভিত আমার ?
আমি-আমি ইন্দ্র দানব-বিজয়ী,
পরাজিত ক্ষুদ্র তাপসের কাছে।
দেখিব—দেখিব স্বষ্টা তোরে
কেমনে বাঁচিবি ইন্দ্র হাতে।
শৃগাল কুকুরে
সানন্দে করিবে খেলা মুণ্ড লয়ে তোর।
[সূত্রধরের প্রতি] বৎস,
হে তরুণ, আমি ইন্দ্র অমর ঈশ্বর।
করো কিছু মোর উপকার।

[সূত্রধরের কম্পান—সূত্রধর পত্নী দূরে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল]

সূত্র—[করজোড়ে] আ-আমি-আমি তা, এখুনি এখেন থেকে চ-লে যা-যাচ্চি

ইন্দ্র—[সহর্ষে-আত্মগত]
কার্য্য হবে সুসিদ্ধ নিশ্চয়।
ভীত হোয়ে গিয়েছে বেচারা
সুতরাং মোর অন্যায় আদেশ
পালনেও দ্বিধাবোধ করিবে না আর।
[প্রকাশ্যে] আমি ইন্দ্র স্বর্গ অধিপতি।
ত্রিদিব ভূতল রসাতলে
কেহ কভু আজ্ঞা মোর
করিতে পারে না অবহেলা :
জানো ত নিশ্চয়।
অতএব আমার আজ্ঞায়—
দ্বিধাবোধ করিও না করিতে ছেদন
ওই কণ্ঠ তাপসের

সূত্র—[স্বগত] বামুন। তাইত—শ্যাষ্‌টায় কি বামন-হত্যি পাপই বরাতে ছাকা আছে। না মেরেও ত' আর পারুচি কই? ইন্দ্রো দিব্‌তা মাথার উপরে বাজ উঁচিয়ে রয়েচেন। কি করি?

[সূত্রধর পত্নী নিকটে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বসিল]

ইন্দ্র—ভয় পাওয়ার নাহি কোন প্রয়োজন?
আমি একছত্র অধিপতি
স্বর্গ-প্রদেশের।
শীঘ্র কর মোর অনুজ্ঞা পালন।

সু-প—[সভয়ে বা-বা-বামুন!

ইন্দ্র—ব্রাহ্মণ?
গলায় থাকিলে সুত হয় না ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হ'তে হ'লে
সদ্‌গুণের চাহে প্রয়োজন।
ভয় নাই।
কেটে ফেল মুণ্ড ব্রাহ্মণের।

সু-প—দিব্‌তা হোয়ে অমন কথা বল্‌চ কেন? হীন শুদ্দুর হোয়েও কি করে বামুনের মাথা কাটবে। ও হুকুম আর করো না। ওই ছাখ্‌ছো—ও কেমন ঝিম মেরে রইছেন।

ইন্দ্র—চুপ করে থাক নারী।
অধিকার ছেড়ে
সব তা'তে বলোনাক কথা
হে ভদ্র, দেবেন্দ্র আমি
শুনিবে না আদেশ আমার?

সূত্র—পিরভু! দিব্‌তা আমি যে কুভুল ভুলতে পারুচি নে'। কি করে ঠাকুরকে মারবো; বলে দিন।

সু-প—মদ্দ মিন্‌সে! মারবি কি র‍্যা! সরে আয়—সরে আয় দিব্‌তাকে ভালোতে পেয়েছে। সরে আয় মিনসে সরে আয়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সুযোগ্য খ্যাতনামা সভ্য রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। মৃত্যুকালে দুই পুত্র, চারি কন্যা, পত্নী ও বিমাতা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্রদ্বয় ও অন্যান্য আত্মীয়-বর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ পরোগত আত্মার সদগতি বিধান করুন— ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

লাভের পরিবর্ত্তে লোকসান :—

ভারতীয় ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগে ১৯২১-২২ সনে প্রায় ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে। ১৯২০ সনের খরচ বাদে জমা ৩৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল। টিকিটের দাম বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু লাভ বাদে লোকসান হইল কেন? বিবেচ্য বিষয়।

আগুন জ্বালা ঘড়ি—

দিন দিন বিজ্ঞানের প্রভাবে কতই আবিষ্কৃত হইতেছে, সম্প্রতি ফরাসীতে একপ্রকার ঘড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার দ্বারা সময় নির্ণয়, ঘুম ভাঙ্গান ও আগুন জ্বালা যাইতে পারে। আর যে কত আবিষ্কৃত হইবে তাহা কে জানে এই সকল আবিষ্কারের ফলে দেশ যে উন্নতিমার্গে আরূঢ় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যবসায় বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি :—

আমেরিকার কতিপয় ব্যবসাদার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার জন্য গত বৎসর ৩৮০০০০০০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিল। এই টাকা ৭২ খানা সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার খরচ। ওখানকার একটা সাপ্তাহিক কাগজের আয় হইয়াছিল ১০ কোটী টাকা, সমস্তই বিজ্ঞাপন হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দেখুন আমাদের কাগজের অবস্থা।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৯ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড ১০ম সংখ্যা।	মাঘ।	১৩২৯ সাল। ১৮৪৪ শকাব্দাঃ

শ্রীশ্রীসরস্বতী-প্রশস্তি।

(লেখক—শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল।)

যে শুভ মুহূর্ত্তে হরি-দেহ হ'তে জনমিলে তুমি দেবি,
দিব্য আলোকে ত্রিলোক-নয়নে ভাসিল অদ্ভুত ছবি।
পুণ্য পবনে তোমার অঙ্গের বহিল মধুর বাস,
স্বরগ মরত উঠিল উছলি অপূর্ব্ব উজ্জল ভাস।
সেই সে আলোকে অন্ধ মানবের খুলিল চক্ষুর দ্বার,
দেখিল চাহিয়া কি অদ্ভুত সৃষ্টি বিশ্বরাজ্য বিধাতার
বুঝিল মানব জ্ঞানের নির্ঝর কি উদার বিশ্বধাতা,
কি চারু কৌশলে বস্তু জাগতিক পরস্পরে আছে গাঁথা।
জ্ঞানের প্রদীপ মানব-মানসে বরষিল আলো-ধারা,
বুঝিল মানব কিরূপে কি হেতু জনমিল বসুন্ধরা।
অনন্ত আকাশে গ্রহ তারা আদি কিরূপ নিয়মে ঘূরে,
শৃঙ্খল-আবদ্ধ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি কি প্রকারে!

কেবা সে অনন্ত শক্তির আধার জ্ঞানের অতল খনি,
কোটি কোটি জীব করিয়া সৃজন খেলা দেখিছেন যিনি।
বুঝিয়া মানব বিস্ময়ে পুলকে তোমার চরণ পানে,
কোটি কোটি নতি করি কুতূহলে, মোহিল তোমায় ধ্যানে।
জগতে মহান্ আদি কবি যিনি তোমার মাধুরী হেরে,
মুগ্ধ-পরাণে হৃদয়-মন্দিরে বসাইলা সমাদরে।
অমনি তাঁহার শ্রীমুখে বহিল শ্রুতির পিযূষ-ধারা,
অনন্ত জ্ঞানের আদিম আকর, জগতের মনোহরা।
সুর-দেশ ছাড়ি নরলোকে দেবি, কৈলে যবে পদার্পণ,
অমর বাল্মীকি পূজিয়া তোমারে রচিলেন রামায়ণ।
সে মধু-প্রবাহ, নিরমল ধারা, যে ভবে করিল পান,
দিব্য পুলকে উল্লাস-আবেশে ভরিল তাহার প্রাণ।
"রাম রাম" বলি প্রাণারাম কবি কি সুধা ছড়া'য়ে গেছে,
বিশ্বের মানব সে সুধাপ্রবাহে প্রেমানন্দে ভাসিতেছে।
তোমার চরণ শরণ করিয়া কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
নশ্বর জগতে করিলা অর্জ্জন চির-অমরতা-ধন।
কবি কালিদাস (বরপুত্র তব), কি তাঁর কণ্ঠের তান,
শ্রোতার হৃদয়ে বহায় নিয়ত পুলক-মদিরা বান।
তোমার প্রসাদে বুঝিল মানব বিজ্ঞানের মধুরিমা,
জড় জগতের ভূত পদার্থের শকতির নাহি সীমা।
জ্ঞানালোকে নর পাইল দেখিতে বিজ্ঞানের গুপ্ত খনি,
বিরাজিত তাহে বিমল উজ্জ্বল কত কত তথ্য-মণি।
বুঝিল মানব কেবা সে প্রকৃতি শক্তি-স্বরূপিণী যিনি,
অনল-অনিল- সলিল-দামিনী- মাঝে বিরাজিতা তিনি।
তোমার করুণা প্রলাভ-কারণ আজি এ মরত-পুরে,
মধুর বসন্তে পঞ্চমী তিথিতে পূজিছে তোমায় নরে।
তব আগমনে আনন্দ-প্রকাশে আজি এ জগৎ রত,
তোমার মহিমা সুমধুর তানে ঘোষে পিক অবিরত।
অমল সুন্দর কুসুম-নিচয় হাসিছে পুলক-ভরে,
মধুর মলয় বহিছে জননি, তোমার বীজন-তরে।

তব আগমনে কিংশুক-কানন কি শোভা ধরিল আজি,
বরণের ডালা সাজায় সুন্দর চূতের মুকুল-রাজি।
নিরমল জল, নির্ম্মল গগনে নিরমল চাঁদ হাসে,
নির্ম্মল আমোদ- সলিল প্রবাহে বালক-বালিকা ভাসে।
গানবাদ্য-রত তব সেবকেরা, স্বয়ং বীণাপাণি তুমি,
অমল ধবল উজল বরণে এস মা এ মর-ভূমি।
কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তোমার চরণে অঞ্জলি করিয়া দান,
যাচি মা কাতরে হ'ক আমাদের অজ্ঞতার অবসান।
জ্ঞানের আলোকে তিমির-বিনাশ কর, মা, করুণাময়ি,
ভারতের বাসী প্রসাদে তোমার হউক শমন-জয়ী।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

যাহার সত্তায় আমাদের পরিবর্ত্তনশীল মনোরাজ্যে একটী অখণ্ড জ্ঞান জন্মে, ঐ জ্ঞানের আশ্রয় অণু বা পরিবর্ত্তনশীল হইলে, জ্ঞানের অববোধ হইত না। সুতরাং তাহা পরিবর্ত্তনশীল বা অণু-স্বরূপ নহে। উহা বিভু ও ব্যাপক এবং অবিনাশী ও জন্মরহিত। উহা মন ও জড়ের তুলনায় অপরিণামী। উহাই আত্মা পদবাচ্য। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা এখানে আত্মা না বলিয়া ক্ষণিক বিজ্ঞান ধারার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাহা হইলে জন্মান্তরের অপ্রসঙ্গাপত্তি ঘটে। কারণ, বিজ্ঞানধারার ক্ষণিকত্ব বিধায়, পরদেহে ফলজনকের অভাব নিবন্ধন জন্মান্তরের অপ্রসঙ্গাপত্তি ঘটে। তাহা হইলে অভুক্ত কর্ম্মফলের ভোগাভাব আপত্তি ঘটে। অতএব সংস্কারাশ্রয় আত্মা অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেই দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র এক একটী অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা আছেন। তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই সকল আত্মার মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহানুভূতির ঐক্য বিদ্যমান; নতুবা কি করিয়া আমার আত্মা তোমার আত্মার উপর কার্য্য করিবে? সে মধ্যবর্ত্তী

বস্তু কি, যাহার মধ্য দিয়া এক আত্মা অপর আত্মার উপর কার্য্য করিবে? এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমার ও আমার উভয়ের আত্মাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটী আত্মার স্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। কারণ, ঐ আত্মা সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড়ের মধ্য দিয়া কার্য্য করিবে।

উহা জগতের অসংখ্য আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিবে। উহার সহায়তাতেই অপর আত্মাসমূহ জীবনী-শক্তিসম্পন্ন হইবে। পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিবে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইবে। এই সর্ব্ব-ব্যাপী আত্মাই পরমাত্মা নামে অভিহিত। তিনি সমগ্র জগতের প্রভু ঈশ্বর। আবার যখন আত্মা জড়পদার্থ-নির্ম্মিত নহে, যখন উহা চৈতন্য-স্বরূপ, তখন উহা জড়ের নিয়মাবলীর অনুসরণ করিতে পারে না, অতএব উহা অবিনাশী ও অপরিণামী। ভারতে আমাদের সকল সম্প্রদায়কেই আত্মা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মহান্ তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে হয়; কেবল দ্বৈতবাদীরা বলেন আত্মা অসৎ কর্ম্মদ্বারা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়; আবার সৎ কর্ম্মদ্বারা সেই স্বভাবের বিকাশ হয়। আত্মাতে সকল শক্তিই নিহিত আছে, বাহির হইতে উহাতে কিছু আইসে না। ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সেই একই শক্তি বিদ্যমান। তবে, একস্থলে অবিকাশ ভাব, অপর স্থলে বিকাশ ভাব। ইহাই হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব। কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধদের সহিত মহাবিরোধ আরম্ভ। তাঁহারা দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন দেহ একটী জড়স্রোত মাত্র। এইরূপ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও এতদ্রূপ একটী জড়প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, উহার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। একটী দ্রব্য ও সেই দ্রব্যে সংলগ্ন কতকগুলি গুণরাশি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? আমরা শুধু গুণই স্বীকার করিয়া থাকি।

যেখানে একটী স্বীকার করিলেই সমুদায়ের ব্যাখ্যা হয়, সেখানে দুইটী কারণ স্বীকার করা ন্যায়-বিরুদ্ধ। আর যে সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিত, বৌদ্ধেরা সে সকল মত খণ্ডন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে তোমার একটী আত্মা আমার একটী আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক একটী আত্মা আছে, প্রত্যেকরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাদের মতে বরাবরই একটু গলদ ছিল। কথা এই যে, কেহই কখন বস্তু দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তা

করিতেও পারে না। অতএব এই বস্তু স্বীকারের প্রয়োজন কি? ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী হইয়া বলনা কেন যে, মানসিক তরঙ্গরাজি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই? উহারা কেহই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নহে। সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় একটী আর একটীর পশ্চাতে চলিয়াছে, উহারা কখনই সম্পূর্ণ নহে, একটী অখণ্ড একত্ব গঠন করে না; আর একটীর জন্ম দিয়া একটী চলিয়া যায়। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গ-পরম্পরা মাত্র। আর এই সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই নির্ব্বাণ কহে। দেখা যায়, দ্বৈতবাদ ইহার সমক্ষে নীরব। দ্বৈত-বাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তিতর্ক অসম্ভব। দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারে না। সর্ব্বব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ,-হস্তবিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণবিনা যিনি গমন করেন, বৌদ্ধেরা বলেন, যদি ঈশ্বর এইরূপ হন, তবে তিনি সেই ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিতে প্রস্তুত, তিনি তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ, যদি ইহা ঈশ্বরের কার্য্য হয়, তবে এরূপ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিব।

আর দ্বিতীয়তঃ এরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক ও অসম্ভব। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিল না। তোমরা বলিয়া থাক সত্য, কেবল মাত্র সত্যই তোমাদের লক্ষ্য। মিথ্যা কখনও জয়লাভ করে না, সত্যের বলেই দেবযান-মার্গ লাভ হয়। কিন্তু উহা কেবল দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্য। তোমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমা-পূজক গরীব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছ, ভাবিতেছ তোমরা ভারী যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পার, আর সে যদি ঘুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে একবারে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও কোথায়? তখন তুমি বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক, অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাস্তিক বলিয়া চীৎকার করিতে থাক। এ ত দুর্ব্বললোকে চিরকালই করিয়া থাকে, যে আমাকে পরাস্ত করিবে সেই নাস্তিক। যদি যুক্তিবাদী হইতে চাও তবে আগাগোড়া যুক্তিবাদী হও, আর যদি না পার তবে তুমি নিজের জন্য যেটুকু স্বাধীনতা চাও, অপরকেও তাহা দাও না কেন? তুমি এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণ করিবে? অপরদিকে উহা একরূপ অপ্রমাণ করা যাইতে পারে। তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই বরং নাস্তিত্ব বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ আছে। তোমার ঈশ্বর, তাঁহার গুণ দ্রব্য স্বরূপ অসংখ্য জীবাত্মা, আবার প্রত্যেক জীবাত্মাই

ব্যক্তি, এই সকল লইয়া তুমি কিরূপে তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পার? তুমি ব্যক্তি কিসে? দেহ হিসাবে তুমি ব্যক্তি নহ, কারণ, তোমরা প্রাচীন বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও ভালরূপ জান যে, এক সময় যে জড়রাশি সূর্য্যে অবস্থিত ছিল, আজ তাহা তোমাতে আসিয়া থাকিতে পারে।

আর এখনই বাহির হইয়া গিয়া হয় ত বৃক্ষ লতাদিতে মিশিতে পারে। অতএব ব্যক্তিত্ব কোথায় রহিল? মনের সম্বন্ধেও এইরূপ। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া তাহার নিকট কুক্কুরবৎ হীন হইয়া থাকিবার আবশ্যকতা কি? বরং উহাতে অবনতি ঘটে। আর চিরদিন আপনাকে হীন ও পাপী ভাবিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়া যাইতেছ। বৌদ্ধ বলেন, তুমি সারা জীবন যাঁহার নিকট চীৎকার করিয়াছ, তাঁহার নিকট কি সাহায্য পাইয়াছ? যদি কোনও সাহায্য না পাইয়া থাক, তবে বৃথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোনই প্রয়োজন ছিল না। তুমি বেদের প্রমাণ দেখাইবে, বৌদ্ধ বেদ মানে না, সে তাহা স্বীকার করিবে না। দ্বৈতবাদী এখানে নিরুত্তর। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তর দিতেছেন। দ্রব্য ও গুণ বিভিন্ন, এইটীর উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধদের প্রথম আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেন, না, উহারা বিভিন্ন নহে। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা নাই। দ্রব্য যদি গুণ-রহিত হয় তবে একটা দ্রব্য মাত্রেরই অস্তিত্ব থাকে। গুণরাশি প্রকৃতপক্ষে মনে, প্রকৃতপক্ষে আত্মায় আরোপিত। তাহা হইলেও দুইটী আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ গুণই এক আত্মা হইতে অপর আত্মাকে পৃথক করে এবং বিশিষ্টতা সম্পাদন করে। কতকগুলি প্রভেদকারী লিঙ্গ, কতকগুলি গুণের দ্বারাই এক আত্মা অপর আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানা যায়। আর যেখানে গুণের সত্তা নাই, সেখানে পার্থক্য কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব দ্বিবিধ আত্মা নাই, একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান। আর তোমার পরমাত্মা-স্বীকার অনাবশ্যক, তোমার আত্মাই সেই।

সর্ব্বব্যাপী বিভু অনন্ত-কখনও দুইটী হইতে পারে না, সুতরাং বহু আত্মা কল্পনা করা অনুচিত। বৌদ্ধ এ উত্তরে নীরব। আর দ্বিতীয় কথা, বৌদ্ধ বলিয়াছেন এই জগৎ একটী অবিরাম-গতি প্রবাহ মাত্র। ভাল, ব্যষ্টিতে সবই গতিশীল বটে, এই জন্যই ইহার নাম সংসার বা জগৎ। কিন্তু তাহা হইলে জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। কারণ, ব্যক্তিত্ব বলিলেই অপরিণামী কিছু বুঝায়। পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব কখনও হইতে পারে না। এই বাক্যটী

স্ববিরোধী। সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই। চিন্তা, ভাব, মন, শরীর, জীবজন্তু সকলেরই অহরহঃ পরিণাম হইতেছে। যাহা হউক্ এখন সমগ্র জগৎকে একটী সমষ্টি স্বরূপে ধরা যাক্। সমষ্টি স্বরূপে কি এই জগতের পরিণাম বা গতি হইতে পারে? কখনই নহে। অল্প গতিশীল বা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্তুর তুলনাতেই বস্তুর গতির ধারণা সম্ভবপর। অতএব সমষ্টি-রূপে জগৎ গতিহীন পরিণামহীন। তখনই প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্ভব যখন আপনাকে জগৎ হইতে অভিন্নরূপে জানা যায়, যখন আপনাকে সমগ্র জগৎ-স্বরূপ জ্ঞান করিতে পারা যায়, তখন ভয় দূরে যায়, অমৃতত্ব লাভ হয়। আমরা কি এই ব্রহ্মকে জানিতে পারি? যিনি নিজে বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কিরূপে জানিব? চক্ষু সকল বস্তু দেখিয়া থাকে, চক্ষু কি নিজেকে দেখিতে পারে? পারে না, কারণ, জ্ঞান-ক্রিয়াটাই একটী নিম্নাবস্থা। বেদ বলেন, এই বস্তুজ্ঞান বস্তুটী হইতে নিম্নস্থানীয়। কারণ, জ্ঞান অর্থে সর্ব্বদাই একটা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে হইবে। যখনই আমরা কোন বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখনই মনের দ্বারা উহা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। সান্ত জ্ঞানদ্বারা কিরূপে অনন্তকে জানা যাইতে পারে?

এখন কথা এই, যদি এই আত্মা, এই অনন্ত সর্ব্বব্যাপী পুরুষ সাক্ষীমাত্র হইলেন তাহা হইলে আর কি হইল? ইহা ত আমাদের মত চলিতে ফিরিতে, জীবনধারণ করিতে ও জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারে না! সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দ-সম্ভোগ করিতে পারে, লোকে সে কথা বুঝে না। বস্তুতঃ যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দসম্ভোগ করিয়া থাকেন। কোন স্থানে যদি কুস্তি হয়, তাহা হইলে ঐ কুস্তির আনন্দভোগ বেশী করে কারা? দর্শকেরা। যে সাক্ষিস্বরূপ, সেই বেশী আনন্দ উপভোগ করিতে পারে; অপর কেহ নহে। দেশ, কাল, নিমিত্তের মধ্য দিয়া অনন্ত সান্তে পরিণত হইয়াছেন। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ উহার নামরূপ আছে, সুতরাং সান্ত, নামরূপ বিলুপ্ত হইলেই অনন্ত সমুদ্রে মিশিয়া অনন্তের সহিত একীভূত হইয়া যাইবে। আর যদি নামরূপ চিরকালের নিমিত্ত চলিয়া যায়, তথাপি সেই একই পরিমাণ জল থাকিবে। পার্থক্যের হেতু মায়া, মায়াই তোমার আমার মধ্যে, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। আর এই মায়া নামরূপ ব্যতীত আর কিছু নহে। ঐ গুলিকে দূর করিলে যাহা প্রকৃত, তাহাই থাকিবে। আমাদের বস্তু-জ্ঞানের তিনটী সোপান আছে। প্রথম, প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র,

পরস্পার পরস্পার হইতে পৃথক; দ্বিতীয় সোপান, সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পার সম্বন্ধ বিদ্যমান। আর শেষ সোপান এই যে, একটী মাত্র বস্তু আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি। অজ্ঞ ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রাথমিক ধারণা এই যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন। অর্থাৎ তখন ঈশ্বর-ধারণা খুব মানবীয় ভাবাপন্ন। মানুষ যাহা করে, তিনি তাহাই করেন।

তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী রকমে করেন। এরূপ ঈশ্বরকে কিরূপে অযৌক্তিক ও অপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা এই যে, একটী শক্তি রহিয়াছে, সর্ব্বত্র তাহার প্রকাশ। ইনি প্রকৃত সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইহার কথাই লিখিত আছে। তৃতীয় ধারণা এই যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর, প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ এগুলি এক-পর্য্যায় শব্দ। দুটী বস্তু প্রকৃতপক্ষে নাই। এইটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আর পরস্পর বিদ্বেষ-বুদ্ধি থাকিবে না, এবং প্রেম বিশ্বব্যাপী হইবে। অজ্ঞানই মানুষকে দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন করিয়াছে। সে যদি তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিত, তাহা হইলে বাদ বিসংবাদ বিসর্জ্জন দিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিত। মানুষ সন্দেহাকুল হইয়া বহিঃ-প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিল, আত্মা কি তাহা কি তুমি জান? উত্তর আসিল, না। ঈশ্বর আছেন কি? প্রকৃতি উত্তর দিল, জানি না। তখন সে প্রকৃতির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল। তখন সে বুঝিল যে প্রকৃতি যতই মহতী হউক, উহা দেশ কালে সীমাবদ্ধ। তখন আর একটী বাণী উত্থিত হইল, সেই বাণী বলিল—"নেতি নেতি" ইহা নহে, ইহা নহে। তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মের এই নূতন আদর্শের উপর উহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন আর বাহিরে অন্বেষণ রহিল না, ভিতরে অন্বেষণ আরম্ভ হইল। ইহাই ধর্ম্মের প্রথম ভিত্তি। দৃঢ় নিশ্চয় অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন এ বিষয়ে যে কোনরূপে দৃঢ়নিশ্চয় স্থাপন করিতে হইবে, আঁধারে হাতড়াইয়া বেড়াইলে চলিবে না।

আজকাল একদল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী। ইঁহারা পৌত্তলিকতা বলিয়া একটী কথা রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয়, কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ তাহা কেহ অনুসন্ধান করে না। কেবল ঐ শব্দের প্রভাবেই তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ভুল বলিতে সাহস করেন। আর একদল আছেন তাঁহারা হাঁচি টিক্‌টিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা

কোন্ দিন হয়ত ভগবানকে তড়িতের পরিণাম বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। যাহা হউক মা ইঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইঁহাদের অতিরিক্ত দল, প্রাচীন সম্প্রদায়, তাঁহারা বলেন আমরা অত শত বুঝি না, বুঝিতেও চাহি না, আমরা চাই ভগবানকে। ইহাই খাঁটি বিশ্বাস। ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভই ধর্ম্মের প্রয়োজন। নচেৎ ধর্ম্মাচরণ পণ্ডশ্রম মাত্র। ভাগবতকার এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"শ্রম এবহি কেবলং"। ভগবানের প্রতি অনুরাগ যাহা হইতে না জন্মে, সে ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইলেও পরিশ্রম মাত্র সার। ভগবানকে পাইতে হইলে কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না পারিলে, স্বীকার করিতে হইবে আমি দুর্ব্বল। কিন্তু তা বলিয়া আদর্শকে নিম্ন করিও না। মড়াকে সোণার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে ভাবের ঘরে চুরিপ্রথা ছাড়িতে হইবে।

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ-সংশ্রয়ঃ।

প্রথম চাই মনুষ্যত্ব, মানুষজন্ম, ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা। তারপর চাই মুমুক্ষুতা, মুক্তির ইচ্ছা, উহা ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার প্রবল আগ্রহ, উহাকেই মুমুক্ষুতা কহে। যখন ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জন্মিবে, তখনই ঈশ্বরলাভের অধিকারিত্ব লাভ হইবে। তারপর চাই মহাপুরুষ-সংশ্রয়, গুরুলাভ। তারপর চাই অভ্যাস, অভ্যাস না করিলে উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কয়টী যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে। মন্দকে ত্যাগ করিতে ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে। এই জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে, স্বর্গও ত্যাগ করিতে হইবে। এই সকলের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে। যেরূপেই হউক ইহাই আবশ্যক। নিরাকার, সাকার, প্রতিমা-পূজা, যে রূপেই হউক না কেন, আত্ম-চরিতার্থতাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা না হইলে সবই বৃথা। জীবন প্রবাহ বহিয়া কালসিন্ধু পানে চলিতেছে, প্রবাহ বৃথা প্রবাহিত না হয় ইহাই প্রার্থনীয়। কারণ, ধর্ম্মময় জীবন গঠিত হওয়াই ভারতবাসীর প্রধান লক্ষ্য। অন্যান্য দেশে উহা অবান্তর কার্য্যের মধ্যে গণ্য। সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য কোন একটী ব্রত পালন করা আবশ্যক। অন্যান্য দেশে রাজনীতি বা সমরনীতি জীবনের উদ্দেশ্য হইলেও ভারতের আবহাওয়ার গুণে ভারতীয় লোকের ধর্ম্মই

জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হয় এইটী ভারতের পক্ষে মঙ্গলময়ের অমোঘ আশীর্ব্বাদ।

সমগ্র জাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুজাতির কিছু দিবার আছে; যাহা অন্য কোন জাতির নাই, আধ্যাত্মিক আলোক ভারতের দান। এক ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশে ধর্ম্মের অপরোক্ষানুভূতি হয় নাই। জড়ের মধ্যে সূক্ষ্ম হিসাবে চৈতন্যের অনুসন্ধান এমতভাবে আর কোথাও হয় নাই। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া চৈতন্যের অনুসন্ধান এদেশের মত আর কোন দেশে হয় নাই। ধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য এদেশের মত আর কোন দেশেই দৃষ্ট হয় না। আর ভারতের হিন্দুধর্ম্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত ধর্ম্ম নহে, ইহা সনাতন ধর্ম্ম। আর একটী বৈচিত্র্য এই যে, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন রুচির বাধা জন্মাইয়া এখানে কখনও সবাইকে একধর্ম্মে জোর করিয়া বাধ্য করিবার চেষ্টা হয় নাই। প্রবল-প্রতাপ বৌদ্ধ নরপতিদিগের সময়েও হিন্দুধর্ম্ম সগৌরবে বিদ্যমান ছিল। ভারতীয় ঋষিগণই প্রকৃত সত্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া পরে জগতে প্রচার করিয়াছেন। আস্তিকের কথা দূরে থাক, এমন কি পরকাল বা ঈশ্বর না স্বীকার করিয়াও নাস্তিকেরা এই ধর্ম্মের আচার ব্যবহার পালন করিলে চরিত্রবান আদর্শ মনুষ্য হইতে পারেন। অনন্তযুগ ধরিয়া তর্ক করিলেও তর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং দৃঢ়নিশ্চয় হওয়াই ফললাভের অনুকূল। ক্ষণভঙ্গুর জীবন জনমের চরিতার্থতা কোন্ ব্যক্তি কামনা না করে? যে না করে সে আত্মঘাতী। সহস্র বাধা-বিপত্তি সরাইয়া দিয়া অদম্য-বলে আমাদিগকে সেই শান্তিময় ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

পিতৃ-মাতৃ-পূজা।

লেখক—শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

ভগবান বাসুদেব দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে এইভাবে পিতৃভক্ত পুণ্ডরীককে কৃতার্থ করিতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তদবধি এই কটি-ন্যস্ত-বাহু বিঠ্ঠলদেব বা বিঠোবা বাবা মহারাষ্ট্রের গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন। ভক্ত

হইতেই পণ্ডরপুর বা পাণ্ডবপুর মহারাষ্ট্রের—তথা সমগ্র ভারতের—একটী পবিত্র তীর্থ। মহারাষ্ট্রভাষায় ইষ্টককে "বিট" বলে। "বা" শব্দ গৌরবসূচক—পিতা বা গুরুক্রম। "ইষ্টকোপরি দণ্ডায়মান পিতা পরমেশ" এই অর্থে বিঠোবা শব্দ ব্যবহৃত হয়। বিঠোবা মূর্ত্তির এখনও পূজা হয়।

আমরা অধুনাতন কালের খ্যাতনামা বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় অনেক মহাত্মার নাম করিতে পারি, যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতৃ-মাতৃভক্তের উচ্চ আসনও লাভ করিয়াছেন। ৺পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺জজ সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইঁহারা সকলেই ইংরাজী শিক্ষিত হইয়াও অন্যান্য সদ্গুণে যেমন আদরণীয়, মাতৃভক্ত বলিয়াও তেমনি খ্যাত। ভূদেব বাবু পিতামাতার জীবনকালে তাঁহাদের যেমন সেবা যত্ন করিতেন, তাঁহাদের দেহাবসানেও তাদৃশ বিশ্বাসের সহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আমরা নিম্নে তাহার একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

ভূদেব বাবু এক বৎসর তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে তাঁর এক সহপাঠীকে নিমন্ত্রণ করেন; নিমন্ত্রিত সহপাঠী ভূদেব বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "কি হে ভূদেব! তুমিও যে দেখি এখনও এ সব বিষয়ে বিশ্বাস কর। মরা গরুতে যদি ঘাস খাইত, তবে আর ভাবনা কি ছিল?

ভূদেব বাবু তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া নিজের পাঠগৃহে গমন করিয়া টেবিলের উপর "নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরি" নামক একখানি ইংরাজী মাসিকপত্র রাখিয়া তাহাতে "হিন্দুদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ" নামক যে প্রবন্ধটি লেখা ছিল তাহা খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহার নিকটেই একখানি চৌকী রাখিয়া নিমন্ত্রিত বন্ধুটিকে তথায় বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন "ভাই, তুমি কিছুকাল এখানে উপবেশন কর, আমি একবার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত অভ্যর্থনা হইতেছে কিনা দেখিয়া আসি।" সহপাঠী তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া চৌকিতে উপবেশন করিলেন; ভূদেব বাবু তাঁহাকে একাকী রাখিয়া স্বকর্ম্মে প্রস্থান করিলেন। সহপাঠী বাবুটি একাকী বসিয়া, টেবিলের উপর খোলা সেই মাসিকপত্র পুস্তকখানি, তাহা দেখিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা হইল। এবং সম্মুখেই সেই "হিন্দুদিগের পিতৃ-শ্রাদ্ধ প্রবন্ধটি খোলা পাইয়া হিন্দুর শ্রাদ্ধকথা সাহেবের লেখা কৌতূহলবশতঃ তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। লেখকের লিখন-প্রণালী তাঁহার নিকট বেশ ভাব-যুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতে লাগিল; তিনি তন্ময় হইয়া প্রবন্ধটী পাঠ করিতে

লাগিলেন। এমন সময় ভূদেব বাবু আনন্দিতভাবে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঔষধ ধরিয়াছে। সহপাঠীর যতক্ষণ পাঠ সমাপন না হইল ততক্ষণ তিনি প্রকাশ্য-ভাবে নিকটে আসিলেন না। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে নিমন্ত্রিত সহপাঠী মহাশয়ের পূর্ব্ব মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। তখন ভূদেব বাবু প্রকাশ্যভাবে সহপাঠীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, বাপ মায়ের ঋণ কেহই পরিশোধ করিতে পারে না বটে কিন্তু শ্রাদ্ধাদি করিয়া তাঁহাদের প্রতি কথঞ্চিৎ পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলে মনে বড় একটা তৃপ্তি হয়। সহপাঠী বলিলেন "পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ বড়ই ভাল, ইহা ভিন্ন তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের অন্য উপায় নাই।"

ভূদেব বাবু বলিলেন "শ্রাদ্ধাদিতে যে পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ জন্য একটা তৃপ্তি হয়, তাহা যতক্ষণ সাহেবেরা না বলেন, ততক্ষণ আমরা স্বীকার করি না। বস্তুতঃ সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কোন কার্য্যই আমাদের নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

সচরাচর দেখা যায়, যে সন্তান পিতামাতার মনে আঘাত দেয় না, অধিকন্তু তাঁহাদের সুখী করিতে চেষ্টা করে, পিতামাতার প্রসন্নতা তাহাদিগকে নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করে। তাঁহাদের মঙ্গল যেন ভগবান হাতে করিয়া বিতরণ করেন।

পিতামাতা নিরক্ষর মূর্খ বা নীচস্বভাব হইলেও সন্তানের নিকট তাঁহারা দেবতা। সন্তানের প্রতি তাঁহাদের সমস্ত আচরণ দেবাজ্ঞাবৎ প্রতিভাত হয়। সন্তানের জন্য তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দেখা যায়।

প্রত্যক্ষ কথা—চব্বিশ পরগণা নিবাসী এক কায়স্থ বালক একদিন কলিকাতায় এক মহাবিপদে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পায়। তখন একব্যক্তি বলিলেন "আজ তোমার পুনর্জ্জন্ম হইল"। বালক জোরে বলিল "সাধ্য কি বিপদ আমারে নষ্ট করিতে পারে, আমি যাত্রাকালে মায়ের চরণধূলি মস্তকে লইয়া পরে বাহির হইয়াছি।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরনভ্যনুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥
ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥

পিতা বৈ গার্হপত্যো ঽগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃস্মৃতঃ ॥
গুরু রাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমম্।
গুরু-শুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥

প্রতিদিন পিতামাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, আচার্য্যেরও সর্ব্বদা প্রীতি-উৎপাদন করিবে। ইঁহারা তিনজনে তুষ্ট থাকিলে সমুদয় তপস্যা সম্পন্ন হয়। ইঁহাদের তিন জনের শুশ্রূষাকেই পণ্ডিতেরা পরম তপস্যা বলিয়াছেন। ইঁহাদের অনুমোদিত না হইলে অপর কোন ধর্ম্মের আচরণ করিতে নাই। ইঁহারা তিন জনেই ত্রিলোক-প্রাপ্তির হেতু, ইঁহারা তিনজনেই গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমত্রয় লাভের কারণ, ইঁহারা তিন জনই বেদত্রয়, এবং ইহারা তিনজনই তিন অগ্নি; পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং আচার্য্যই আহবনীয় অগ্নি; এই তিন অগ্নিই পৃথিবীর মধ্যে গরীয়ান্। এই তিন জনের উপর প্রমাদ প্রকাশ না করিয়া যে দেহী ইঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা অবহিত থাকেন তিনি তদ্দ্বারা ত্রিলোক জয় করেন, তিনি স্বশরীরে দীপ্যমান হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে বিমলানন্দ ভোগ করেন।"

দৈত্যকুলতিলক ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ পিতার দুর্ব্ব্যবহারে কি ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা প্রহ্লাদচরিত্রপাঠকমাত্রে অবগত আছেন। প্রহ্লাদের প্রতি পিতার অত্যাচার গল্পস্থলেও কথিত হইয়া থাকে। প্রহ্লাদ পিতা কর্ত্তৃক তাদৃশ অত্যাচারিত হইয়াও পিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং তাঁহার উপকারে বিরত হইয়াছিলেন না। প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর যখন ভগবানের স্তব করেন, তখন ভগবান প্রহ্লাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া প্রহ্লাদকে বর-গ্রহণের অনুমতি করিলে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন ভগবন্! আমি আমার জন্য কোন বর প্রার্থনা করি না—আমি আমার পিতার জন্য এই বর প্রার্থনা করি—আপনি যে জগদীশ্বর ও সর্ব্বলোকের গুরু তাহা আমার পিতা বুঝিতে পারেন নাই। দোষ-পরবশ হইয়া নানা প্রকার ভ্রমে চালিত হইয়াছিলেন। আপনাকে ভ্রাতৃহন্তা বলিয়া কত নিন্দা করিতেন এবং আমাকে আপনার ভক্ত দেখিয়া আমার প্রতি নানাপ্রকার হিংসাচরণ করিয়াছিলেন। হে দীন-বৎসল, এই সকল দুস্তর পাপ হইতে যাহাতে তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আপনি তাহা করুন।

আধুনিক কোন নৈতিক উপদেষ্টা লিখিয়াছেন—

নিরাশ্রয় বাল্যকালে করিলা পালন,
বিদ্যা শিখাইতে কত করিলা যতন,
কায়মনোবাক্যে শুভ করিয়া কামনা,
সতত ঈশ্বরস্থানে করেন প্রার্থনা,
এমন জননী আর জনক স্থবির,
পরুষ আচারে যার ফেলে অশ্রু-নীর
বলুক সুকৃতী তারে লোক সমুদয়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার।)

ঋষিগণ সত্য সাক্ষাৎকার ক'রে সোঽহং তত্ত্বে পৌঁছিয়ে তথা হইতে প্রত্যাগমন ক'রে তার স্মৃতি হ'তে সত্যপ্রচার করেছেন; শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে দণ্ডায়মান থেকে নিজের অস্তিত্ব না লয় ক'রে বজ্রকণ্ঠে জগতবাসীকে আহ্বান করেছেন। তাঁহার বিচিত্র চরিত্র সর্ব্বতঃ সম্যক্ পরিস্ফুট। তৎপ্রচারিত রাধাতত্ত্বও পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ প্রচারিত নাদ তত্ত্বাপেক্ষা অভিনব ও অতীব গভীরতর। সাধারণে যে সমস্যার মীমাংসা দিতে অক্ষম, যিনি তথায় সক্ষম, তিনি অবশ্য নমস্য। কালের পরিবর্ত্তনে সমাজে উপস্থিত জটিলতর প্রশ্নের সমাধান তিনি দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ শুধু উপস্থিত সমস্যার পূরণ করেন না, অধিকন্তু সমাজ-যন্ত্রকে এমন গতি দান করেন যে নব নব প্রশ্নের উদ্ভব হয় ও বহুদিন তৎসমুদায়ের মীমাংসার উপায় থাকে এবং তাহা মঙ্গলের পথে ধাবিত হয়। পশুজীবনে সামান্য সমস্যা, অসভ্য-মনুষ্য-সমাজে তদপেক্ষা অধিক সমস্যা; সমাজ যত উন্নত, সমস্যা তত অধিক ও জটিল। সমাজকে উন্নত করিতে গেলে উপস্থিত সমস্যার পূরণ এবং নব নব সমস্যার উদ্ভাবন ও মীমাংসার পথ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। জীবন্ত সমাজে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইলে বা সমাজ-জীবনের কোনও স্থানে গ্লানি

উপস্থিত হইলে সমাজস্থ চিন্তাশীল মঙ্গলেচ্ছুগণের আকুল প্রার্থনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমস্যার মীমাংসা-শক্তি যেন মূর্ত্তিমান হ'য়ে মানবরূপে অবতীর্ণ হন। যেখানে এ শক্তি নাই, সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। বৈদিক সমাজের উপ-যোগী সমস্যার মীমাংসা বৈদিক সমাজের ঋষি দ্বারা সম্পাদিত। বৈদিক সমাজ যখন তার সরল সহজগতির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ জটিলতর অবস্থার মধ্যে উপনীত, তখন আর সে বৈদিক সমাজ নাই, তাই নূতন সমস্যার পূরণ ক'রতে হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রকে। শ্রীরামের সমাজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সমাজ অধিকতর জটিল, কৃষ্ণের সম্মুখে গভীরতর প্রশ্ন উপস্থিত, তাঁহাকে তৎসমুদায়ের মীমাংসা দিতে হয়েছিল; তাই বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব কৃষ্ণকে অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন। সেমিটীক সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে Old Testament, প্রাচীন নিয়ম New Testament নূতন নিয়ম ও কোরাণ অধ্যয়নে একই নিয়ম দৃষ্ট হয়।

আমরা অনেকদূর এসে পড়েছি, এখন সে অতি-মানবের শেষ জীবনের কথা কিছু আলোচনা করা যাক্। এই সময়ে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ও তাহাতে তিনি সারথী, ও একমাত্র ভগিনীর একমাত্র পুত্রের নৃশংস মৃত্যু। যুধিষ্ঠির যুদ্ধান্তে সম্রাটপদে অভিষিক্ত। স্ববংশীয় যাদবগণের উচ্ছৃঙ্খলতা হেতু তাদের নিধন এবং তাহাতে তিনি নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ স্থির, ধীর। সর্ব্বত্রই কি অনাসক্তি ও গভীর প্রেমপূত কার্য্যাবলি! লক্ষ্য লোকসংগ্রহ মানবহিত। আর এক দিকে দেখি মানবের সর্ব্বতোমুখ মনুষ্যত্ব উন্মেষের জন্য তিনি যে মহাসত্য প্রচার ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে স্বার্থনাশে ভীত ও ক্রুদ্ধ ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ তাঁহার জীবননাশ-চেষ্টায় নিযুক্ত, কেহ প্রকাশ্যে কেহ অপ্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে চেষ্টা অকৃতকার্য্য হইলে গুপ্ত জঘন্য চেষ্টা চলিতেছিল। অবশেষে আততায়ীর কূট পৈশাচিক ষড়্‌যন্ত্রে বিষাক্ত বাণাঘাতে হত্যা। ভারতাকাশ হইতে এক মহাসূর্য্যের শোচনীয় অস্তগমন। আসুন পাঠকগণ, তাঁহার উদ্দেশে ভক্তি-অশ্রুধারে প্রণাম করি। পাঠকগণ এ শোচনীয় দৃশ্য মনঃপটে অঙ্কন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করুন। 'এ অশ্রুতে আমাদের পাপ তাপ দুর্ব্বলতা দূর হোক। যত পারি কাঁদিয়া লই। কিন্তু পাপের সাময়িক আপাত-দৃষ্ট বিজয়ে ম্রিয়মাণ হইবার কারণ নাই। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি যেন আমরা তাঁহার নির্দ্দেশিত পথে যাইবার শক্তি পাই। ঐ দেখুন তাঁহার দেহের অবসান হয়েছে বটে—কিন্তু তাঁহার অভয়বাণী গীতায় দুন্দুভি-নাদ ভারতগগনে

হইতে প্রতিধ্বনিত হয়ে সকল আকাশ দিক্ প্রপূরিত। গীতা সমুদ্রোত্থ কত ধারা অচিরকাল মধ্যে ভারতকে পবিত্র ক'রেছে দেখিতে পাই।

এক্ষণে গীতা ও ভাগবত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। গীতায় তৎকাল-প্রবর্ত্তিত অধ্যাত্ম-শাস্ত্র উপনিষদাদির সমন্বয়। জ্ঞান কর্ম্ম প্রেমের অপূর্ব্ব মনোহর মিশ্রণ, ভাগবতে ভক্ত তাঁর আদর্শের কার্য্য যে চক্ষে দেখেছেন তারই বর্ণনা। গীতা কৃষ্ণের হৃদয়, গীতা তাঁর পরম জ্ঞান এবং পরম আশ্রয়। যে নীতি জগৎ-চক্রকে চালিত করছে তারই কীর্ত্তন গীতায়। গীতা মহাসমুদ্র, ভাগবত কূপ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :—

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমংপদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতা-জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।"

গীতা সম্বন্ধে সূত বলেছেন :—

"কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥"

গীতা সম্বন্ধে কৃষ্ণই সম্যক্ জানেন, ব্যাসাদি কিঞ্চিৎ জানেন। ভাগবত ব্যাসের উক্তি, গীতা কৃষ্ণের যোগযুক্ত বা আত্মস্থ অবস্থার বাণী যাহাতে অর্জ্জুনকে সমাজের (Representative) প্রতিনিধিরূপে লক্ষ্য করিয়া তৎকালের উপস্থিত সমস্ত সমস্যার মীমাংসা প্রদত্ত। ভাগবতের গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে নানা সন্দেহ বর্ত্তমান, অনেকের ধারণা ও মীমাংসা, ভাগবত কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ব্যাস কৃত নহে, আধুনিক গ্রন্থ। ব্যাসকে ভাগবতের গ্রন্থকর্ত্তা ধরিয়া লইলেও গীতা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এ হেন গীতা যাহাকে কৃষ্ণ পরম গুরু বলিয়াছেন, যার আশ্রয়ে ত্রিলোক পালিতে বলিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, তার উপরে অন্য শাস্ত্রকে স্থান দিয়া কৃষ্ণভক্তের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণদ্বেষিতাই সম্পাদন করেছে।

গীতা ভারতজ্ঞানবৃক্ষের অমৃত ফল। মানব-জীবন গঠনের মনোহর আদর্শ। ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানের সমন্বয়কারী গীতার ত্যাগে মানুষের সর্ব্বতোমুখী উন্নতিপথ রোধ করা হয়েছে। গীতা ত্যাগ করে ভাগবতাদি গ্রহণ করে শুধু আত্ম

ক্ষণস্থায়ী ভাবুকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, এ যেন কাঞ্চন ত্যাগে কাচ-গ্রহণ। অগভীর ক্ষণস্থায়ী ভাবুকতা জাতিকে দুর্ব্বল করে; বিশেষতঃ শরীর ও মনের দুর্ব্বলতা উৎপাদক জলবায়ু বিশিষ্ট বঙ্গদেশের পক্ষে ভয়ানক অনিষ্টকারী। দুর্ব্বল-চিত্ত অগভীর-চরিত্র শিশ্নোদর-সর্ব্বস্ব জনগণের মধ্যে প্রেমের নামে ইন্দ্রিয়-সুখকর ভাব সহজেই বিস্তারলাভ করে। কাম অনেক সময় প্রেমের খোলস ধারণ করে। কারণ দুটী Extremes বিপরীত ভাব অনেক সময় সমান দেখায়। সংযমাপুত ব্যক্তিগণের পক্ষে, সাধনপূত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের পক্ষে, শুদ্ধ প্রেম লইয়া খেলা বিপজ্জনক। ভাবপ্রবণ বঙ্গবাসীর পক্ষে গীতা ত্যাগ করে ভাগবত গ্রহণে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নাশ করা হয়েছে। চরিত্রের অগভীরতা উৎপাদন ক'রে জাতীয় জীবনে শিথিলতা, দুর্ব্বলতা, কপটতা এনে ধ্বংসের দিকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে। কর্ম্ম জ্ঞান প্রেম কোন একটাকে বাদ দিলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে পঙ্গুত্ব আনয়ন করে। কর্ম্ম শক্তি দেয়, চালায়, জ্ঞান দেখায়, বুঝায়, প্রেম মধুরতা ও নিষ্ঠা আনে। ভক্তি বা প্রেম জীবন-বৃক্ষের অমৃত ফল; কিন্তু সে ফল পেতে হলে বৃক্ষকে সম্পূর্ণ ও পুষ্ট রাখিতে হইবে, বৃক্ষকে নাশ করে সুপক্ক ফলের আশা বাতুলতা। গীতা ত্যাগে হিন্দু আজ রাজ্য সমাজ জাতীয়তাতে ও ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানে হীন, পঙ্গু। স্বদেশে পদদলিত, বিদেশে ঘৃণিত ও পদে পদে লাঞ্ছিত। জগতের এক সময়ে যারা গুরু ছিল আজ স্বকৃত কর্ম্মে তাদের কি শোচনীয় অবস্থা।

যিনি আর্য্য ও অনার্য্যকে প্রেমে একত্র করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে এখন ব্রাহ্মণজাতি ব্যতীত অপরে স্পর্শের অনধিকারী, এমন কি ব্রাহ্মণকন্যাগণও নহেন। কি উপহসনীয় ব্যাপার। যিনি ক্ষত্রিয়ের পুত্র, বৈশ্যগৃহে পালিত, অনার্য্যকন্যাসহ বিবাহিত, তাঁহাকে যেন বিশুদ্ধ রাখিবার বা করিবার জন্য অপর গৃহ হইতে তাড়িত করে ব্রাহ্মণবর্ণের গৃহে বন্দী করিবার চেষ্টা করা হ'য়েছে, তদ্ বিগ্রহ তথায় বন্দী বটে, কিন্তু তিনি বোধহয় ঐ স্থান হইতে অপমানিত ও দূরীকৃত মানুষ কি ভ্রান্ত। হে প্রভো! তোমার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত ক'রে নিজগৃহে স্থাপন দ্বারা তোমাকে বন্দী করিতে চাহে। তুমি কি জড় যে বন্দী হইবে? আমরা এখন কৃষ্ণের জড়মূর্ত্তির পূজার ভাণ করি মাত্র। কিন্তু তাঁহার মানস এবং আধ্যাত্মিক বিগ্রহকে কোন দূরদেশে বিতাড়িত ক'রেছি। তাই আমরা জড়োপাসক পৌত্তলিক হ'য়ে পড়েছি। তার ফলে দেশের সর্ব্বত্রই সর্ব্বভাবে ঘোর তামসভাব এবং আমাদের দেশে বা বিদেশে লাঞ্ছনা ও পদাঘাত। আমরা অন্নাভাব

ক্লিষ্ট, রোগে রুগ্ন, ধর্ম্মচ্যুতিতে পাশব ভাবাক্রান্ত। আমরা কর্ম্ম ছেড়েছি—জ্ঞান ছেড়েছি—ধর্ম্মও গিয়েছে।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তিযেঽবিদ্যামুপা সতে।
ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা॥

যাহারা ধর্ম্মবিহীন কর্ম্মাদির লৌকিক বিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যাহারা জ্ঞান কর্ম্ম ত্যাগ করে শুধু মাত্র ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম বিদ্যায় রত তাহারা অধিকতর অন্ধকারে পতিত হয়। কৃষ্ণের কর্ম্মযোগ বুদ্ধে জ্ঞান শঙ্করে ভক্তি রামানুজে প্রেম চৈতন্যে সম্যক্ বিকশিত। অবশ্য এদের মধ্যে অন্য ভাবাদিও বর্ত্তমান, তবে এগুলি অধিকতর পুষ্ট। আমাদের কর্ম্মদোষে সব হারিয়েছি।

ভারত সমাজের আধ্যাত্মিক ও মানস জগতের উৎকট ভাব পরিবর্ত্তনানুসারে যুগ-ভেদ কল্পিত হয়েছে। এইরূপে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। চারিযুগে এক মহাযুগ। সম্মুখে মহাসত্য। আজ আমরা সর্ব্বাপেক্ষা জটিলতম সমস্যার সম্মুখীন। ভারত আজ ধ্বংসের দিকে দ্রুতধাবিত; শুধু ভারত নহে, জগতের অবস্থা শোচনীয়। অন্যপক্ষে ভারতে আজ বিশ্বমানবের মিলন। শুধু উপনিষদ্ নহে; সত্য বা বেদদ্রষ্টা বুদ্ধ যিশু মহম্মদ্ মুশা জোরষ্ট্রর প্রভৃতি সকলের প্রচারিত মতসমূহ একক্ষেত্রে উপস্থিত। আধ্যাত্ম জ্ঞান দ্বারা তাদের সমন্বয় ও স্থান নির্ণয় করিতে হইবে এবং এক All embracing সর্ব্বগ্রাহী মতবাদ চাহি যাহা সবকে বক্ষে ধারণ করিবে এবং যার গভীরতা অভূতপুর্ব্ব হইবে। এমন দিনের জন্য আসুন সকলে প্রস্তুত থাকি। হে দুষ্কৃতিহারী ধর্ম্মসংস্থাপক! তোমার জোতিঃতে প্রকাশিত হও। তোমার আশায় যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান মুসলমান, ইহুদী, প্রভৃতি সকলেই সোৎকণ্ঠে অপেক্ষা করছে। আবার কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি সমন্বয় করে ধর্ম্মের গ্লানি ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সর্ব্বপ্রকার গ্লানি দূর করে দাও। এক মহাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর যার মধ্যে বিশ্বমানবের স্থান হয়। অথবা তোমার কার্য্য তুমিই ভাল বুঝ। আমরা যেন তোমাকে হৃদয়ে বরণ ক'রে নিতে পারি। যেন তোমার লীলার সাথী হ'য়ে জীবন ধন্য করতে পারি। হে নাথ! আমাদিগকে অসৎ হইতে সতের দিকে, অন্ধকার হইতে আলোর দিকে, মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে নিয়ে যাও; আমরা যে মৃত্যুর মুখে। তোমার ইচ্ছা জয়যুক্ত হোক্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

স্বর্গ-সিংহাসন

লেখক—পণ্ডিতবর শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নৈমিষকাননের এক অংশ।

অদূরে অগস্ত্যের তপোবন।

অগস্ত্যের প্রবেশ।

অগস্ত্য—উত্তরাপথ ছেড়ে যখন দক্ষিণে আসি—তখন সব চেয়ে বেশী কষ্ট হয়েছিল—আর্য্যাবর্ত্তের বটচ্ছায়ামণ্ডিত স্নিগ্ধ বন্য পথটুকু ছেড়ে আসতে। মনের কোণে মমতা স্নিগ্ধ কটাক্ষে মুচ্‌কে হেসে বলেছিল—ব্রাহ্মণ, মিছে কোথায় জন্মগত অধিকার ছেড়ে চল্‌ছ? কি অধিকার আছে জগতের—তোমাকে এই মাটী হ'তে-এই বন্য পথ হ'তে বঞ্চিত করার? তুমি মাটী কামড়ে পড়ে থাক—বুভুক্ষু মনের ক্ষুধা—মিটবে-প্রাণে শান্তি আস্‌বে। কিন্তু তখনই বিশ্ব-হিতৈষণার প্রেরণা সমস্ত বুক জুড়ে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ব্রাহ্মণ, বেরিয়ে পড়। কিসের মায়া? কেন এ মমতা? যদি এই মায়া মমতার দাস হোয়ে থাক্‌বে—তবে নগর ছেড়ে তপোবনে এসেছ কেন?—ভোগ ছেড়ে ত্যাগের উপাসনা করছ কেন? ঐ দেখ আর্ত্ত জগৎ কাতরকণ্ঠে তোমায় ডাক্‌ছে—ত্রাতা ত্রাণ কর—অত্যাচারের বাঁধন হ'তে মুক্তি দাও। ঐ উচ্চশির বিন্ধ্যগিরি সব ছেয়ে ফেল্‌ল; বিশ্বে প্রলয়-হুঙ্কারে ধ্বংসের আরতি করছে। এস তুমি চিরন্তন পুরোহিত, বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়ে দেও, ও আরতির উল্লাসের অট্টহাসি থামিয়ে দেও।

[নারদের প্রবেশ]

নারদ—ব্রাহ্মণ! অগস্ত্য! তোমরা নীরবে চুপ করে বসে আছ। দেবরাজ অম্লানবদনে ব্রাহ্মণের সাধনা-ভঙ্গ করলেন, বিনা-আপত্তিতে ব্রহ্মহত্যা করলেন—আর তোমরা তা' নীরবে সহ্য করবে? স্বজাতির জন্যে প্রাণ একটু কেঁদে উঠ্‌ছে না? মনে একটুও ব্যথা লাগ্‌ছে না? তুমি না অগস্ত্য? তোমার অভি-সম্পাতকে নাকি ধ্বংসের দেবতাও ভয় করে চলেন—তুমিও একটা কথা বল্‌লে না?

অগস্ত্য—দেবর্ষি, আমি অগস্ত্য—আমি ধ্বংসবাদী ব্রাহ্মণ—সত্য! আমি বাতাপিভক্ষণ করেছি—আতাপি সংহার করেছি—এক গণ্ডূষে সপ্ত সাগর শোষণ করেছি—এ কথা সত্য! অত্যাচারী দম্ভী বিন্ধ্যগিরি আমার পায়ের তলায় মাথা

নত করেছে—আজও সে মাথা তুল্‌তে পারে নি'—এ সকলি সত্য! কিন্তু নারদ! আমিও ব্রাহ্মণ—আমিও মানুষ! কেবল ধ্বংস রাক্ষসকে জীবনে বরণ করেও ত' থাক্‌তে পারি নে'। জানো কি তুমি—আমারও বুকের একটা অংশ আছে—যে অংশ উত্তরাপথে ফিরে যাওয়ার জন্যে আজও চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। আমারও হৃদয়ের এমন একটা স্থান আছে—যেখানে গোপনে সুপ্ত কামনা ঘুমিয়ে আছে—সে মাঝে মাঝে আঁতকে উঠে ঘুমের ঘোরে আমাকে ডেকে বলে শুধু রুক্ষ তপস্যা—শুধু যৌগিক বিভূতি জীবনের সার নয়। একটু মায়া মমতা স্পর্শের লালসায় বুকের এক কোণায় তপ্ত রক্ত থেকে থেকে উষ্ণ প্রবাহের ছুটে বেড়ায়।

নারদ—অগস্ত্য, তোমার মুখে এই কথা!

অগস্ত্য—হাঁ নারদ, আমার জীবনের এ অংশটাও আছে—যেটা জগৎ জানে না।

নারদ—তা' হ'লে ত্বষ্টার হত্যাকারী কোন শাস্তি পাবে না? দেবরাজ ব'লে কি তিনি দণ্ডের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাবেন?

অগস্ত্য—সে সংবাদ আমি আর রাখ্‌ব না। এ দুর্ব্বল-হৃদয় ব্রাহ্মণ দণ্ড দেওয়ার ভার আর নিজের হাতে রাখ্‌তে চায় না। জানিনে এ, সঙ্কল্প আমি জীবনে জাগিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব কিনা? তবু চেষ্টা কর্‌ব ভাব্‌ছি।

নারদ—না অগস্ত্য, আর একবার ওঠ। ত্রিলোকের আধিপত্যে মদমত্ত ইন্দ্র আর আপনাকে সংযত রাখ্‌তে পার্‌ছেন না। দেখিয়ে দেও, নৃপতি দণ্ডধারী হ'য়ে মাত্রা ছাড়ালেও দণ্ড তার মাত্রা ছাড়ে না।

অগস্ত্য—না নারদ; যদি ত্বষ্টার হত্যাকারী দণ্ড পায়—তাকে দণ্ড ভগবানই দেবেন। তার জন্যে নিঃস্ব ব্রাহ্মণকে দণ্ড ধর্‌তে হ'বে না। আর আমাকে উত্তেজিত করো না। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা নারায়ণ যাকে যা করাবেন—সে তাই কর্‌বে।

[প্রস্থান]

নারদ—চলে গেল—অগস্ত্য চলে গেল। আচ্ছা আমিই বা ইন্দ্রের দণ্ডের জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছি কেন? একবার বিশ্বনিয়ন্তার দণ্ডদান—পদ্ধতির পরখ দেখি না কেন? প্রভু নারায়ণ! সকলি তোমার ইচ্ছা! হরি হে জগদীশ্বর!

[প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

বেদান্তের সৃষ্টির একপৃষ্ঠা।

প্রথম প্রস্তাব।

(লেখক—শ্রীরাম—সহায় বেদান্ত—শাস্ত্রী। কাঁটালপাড়া চতুষ্পাঠী।)

(কথোপকথনে)

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—

গুরো, বেদান্তের সৃষ্টি তত্ত্বটি সংক্ষেপে সরলভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিন। শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রমাণের সাহায্য না লইয়া সহজ যুক্তিযুক্ত ভাষায় বলিবেন। দেখিবেন সে যুক্তি যেন সাধারণে বেশ সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারে।

গুরু তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—বৎসগণ, প্রশ্নটি দার্শনিক, কাব্যের ঝঙ্কারময়ী ভাষায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। চিন্তার বিষয় চিন্তাশক্তির সাহায্য ব্যতীত বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ না দিয়া যুক্তির সাহায্যেই বুঝাইব। যতই সহজভাবে বুঝাই না কেন, নায়ক নায়িকার প্রেমালাপের মত মধুর হইবে না; গল্পের মত হৃদয়াকর্ষক হইবে না। চিন্তা চিন্তাই, তত্ত্ব তত্ত্বই, দর্শন দর্শনই।

শিষ্য। সকল শ্রোতা যাহাতে বুঝিতে পারে, তেমন করিয়াই বলিবেন।

গুরু। ভাল; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব, আবির্ভাব এবং প্রকাশই সৃষ্টি। কুম্ভকার যে মৃত্তিকা দিয়া ঘট, শরা ও কলসী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, তাহা সৃষ্টি। মাকড়সা যে নিজ দেহ হইতে তন্তু বাহির করিয়া জাল প্রস্তুত করে, তাহা সৃষ্টি। কবি যে কল্পনাশক্তি—সাহায্যে বিচিত্র কাব্য রচনা করেন তাহাও সৃষ্টি। আবার মায়াবী যে বিনা পার্থিব উপাদানে কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি ও মন্ত্র সাহায্যে অলৌকিক দৃশ্য দেখাইয়া থাকে তাহাও সৃষ্টি।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, ঐ মৃত্তিকা হইতে ঘট স্বতন্ত্র বস্তু, না—মৃত্তিকা ও ঘট একই বস্তু?

শিষ্য। যখন মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য্য, তখন এক বলিব কিরূপে? উভয়ের আকৃতি এক নহে। ঘটের দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, মৃত্তিকা দ্বারা যখন সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তখন স্বতন্ত্র না বলিব কেন?

গুরু। স্থূলদৃষ্টিতে মৃত্তিকা ও ঘট, তন্তু ও বস্ত্র পৃথক কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে স্বতন্ত্রই বা বল কিরূপে? মৃত্তিকার অস্তিত্ব ছাড়িয়া দিয়া ঘটের, তন্তুর অস্তিত্ব ত্যাগ করিয়া বস্ত্রের অস্তিত্ব যখন বোঝা যায় না; ঘট ও তাহার উপাদান, যখন একই, তখন দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু না বলিয়া একটিকে অপরটির অবস্থান্তর মাত্র বলিতে পার। সর্পের কুণ্ডলিত অবস্থা দেখিয়া কখন বলা যায় না যে,

সর্প আর কুণ্ডলিত সর্প পৃথক্‌। তবেই বোঝ, কুণ্ডলিত সর্পটি সর্পেরই অবস্থা-ভেদ মাত্র। বিভিন্ন অবস্থা কখন স্বতন্ত্রতার নিয়ামক হয় না। অতএব বলিতে হইবে, ঘট মৃত্তিকার অবস্থান্তর, বস্ত্র তন্তুর অবস্থাভেদ মাত্র। স্বরূপতঃ দুই এক। অতএব কার্য্য কারণেরই অবস্থান্তর।

শিষ্য। কথাটি বুঝিলাম না। অবস্থান্তর কি? অবস্থান্তর বলিতে ত আমরা বুঝি, পূর্ব্বাবস্থার ধ্বংস এবং নূতন অবস্থার উৎপত্তি। বীজের অবস্থা-ন্তর অঙ্কুর। বীজ হইতে অঙ্কুর অর্থাৎ বীজাবস্থার নাশ এবং বীজ হইতে স্বতন্ত্র অঙ্কুরাবস্থার উদ্ভব। ইহাই ত অবস্থান্তর? বীজই অঙ্কুর এ কথা প্রচলিত নহে। "বীজাৎ অঙ্কুরঃ" বীজ হইতেই অঙ্কুর—ইহাই ত প্রচলিত। অতএব কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি, "কারণাৎ কার্য্যং"। তবেই দেখুন, কারণই কার্য্য নহে। অবস্থান্তর বলিলেই বা মৃত্তিকা ও ঘট, বস্ত্র ও তন্তু এক হয় কিরূপে?

গুরু। অবস্থান্তর কথাটি ভাল করিয়া বুঝিলে কারণ কার্য্যের সমস্যা মীমাংসা হইয়া যাইবে। অবস্থার ভেদ অবস্থান্তর। অবস্থারই ভেদ, বস্তুর নহে। যৌবন বাল্যের অবস্থা—ভেদ। অবস্থান্তর বলিলে পূর্ব্বাবস্থার ধ্বংস আর পৃথক্‌ অবস্থার উৎপত্তি মানিতে হইবে কেন? বীজাবস্থার নাশ হইয়া অঙ্কুরাবস্থার ত উদ্ভব হয় না। বীজাবয়বের নাশ হইয়া কি অঙ্কুরাবয়বের উৎপত্তি হয়? বীজাবয়ব ত অঙ্কুরাবয়ব হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীজে যাহা থাকে, অঙ্কুরে তাহাই স্থূলাকার প্রাপ্ত হয় মাত্র। বীজে যাহা থাকে না, অঙ্কুরে তাহা নূতন করিয়া জন্মে না। তাহা যদি জন্মিত, তবে বটবীজ হইতে বটবৃক্ষ ব্যতীত অন্য বৃক্ষই বা জন্মে না কেন? তবেই বীজই অঙ্কুররূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত, পরে উহাই বৃক্ষাকারে বিপরিবর্ত্তিত হয়; ইহাই বলিতে হইবে। বীজই অঙ্কুর। বীজেরই অবস্থা ভেদ অঙ্কুর। দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে।

শিষ্য। আচ্ছা গুরুদেব, আপনি অবস্থান্তরটি যেভাবে আমাদের বুঝাইলেন, তাহাতে ইহাই কি বুঝিব যে, ইহাতে স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয়? আর স্বরূপের পরিবর্ত্তন বলিলে উহা ত বিকারের মধ্যেই পড়িল। দাঁড়াইল, কারণের বিকার কার্য্য। তাহা হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ পদার্থের অবস্থাভেদ মাত্র মানিতে হইবে। আর ইহাতে বিকারবাদই আসিয়া পড়িল। অথচ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরেও সেই একমাত্র সদ্রূপই অবিকৃত হইল—এই সনাতন তত্ত্বের অপলাপ হইয়া গেল।

গুরু। তোমার প্রশ্নে বড় সন্তুষ্ট হইলাম। সনাতন তত্ত্বের কখন

অপলাপ হয় না। অবস্থান্তর বলিলেই যে বিকার বুঝিতে হইবে, এমন নিয়ম নাই। সদ্রূপ পরমাত্মা হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব—বলিলেই যে, বুঝিতে হইবে মৃত্তিকা হইতে ঘট-কলসীর মত জগতের উদ্ভব, ইহার অর্থ কি ? সদ্রূপ পরম চৈতন্য নিত্য, একরূপও অবিকৃত ; তাঁহার অবস্থান্তর বলিলে বিকার অর্থে উহা ধরিয়া লইতেই পার না। তাহা হইলে নিত্য একরূপই বা মান কিরূপে ? সদ্রূপই একমাত্র নিত্য পদার্থ ; তাহা হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই যে, সদ্রূপ তাহার আকার ধরিবে। মৃত্তিকা ঘটাকার ধারণ করিলে যেমন মৃত্তিকা এই জ্ঞানের বিলোপ ঘটে না এবং মৃত্তিকার মৃত্তিকাতিরিক্ত কোন বস্তুতে পরিণতি দেখা যায় না, তদ্রূপ সদ্রূপই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আকারে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইলেও সদ্রূপের সত্ত্বা বিলুপ্ত হয় না, সদ্রূপাত্মক জ্ঞানেরও বিচ্যুতি জন্মে না বা সদ্রূপাতিরিক্ত কোন নূতন পদার্থেরও উদ্ভব হয় না। তখন বিকাররূপ অবস্থাভেদ না ঘটিয়া বিবর্ত্তরূপ অবস্থান্তর হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। যাহা স্বরূপের কোনরূপ বিচ্যুতি না ঘটাইয়া স্বতন্ত্র একটি বস্তুর প্রতিভাস করে, তাহাই বিবর্ত্ত। বিকারে বস্তুর অন্যথা প্রাপ্তি ঘটে না। দুগ্ধ হইতে দধি, এখানে দুগ্ধ বিকৃত হইয়াই দধিরূপে পরিণত হয়। সদ্রূপ পরম চৈতন্য তদ্রূপ অন্যথাকৃত হইয়া বিশ্বাকারে পরিণত হয় না। সদ্রূপ ঠিক থাকে অথচ বস্তুর প্রতিভাস হয়। যথা মরুভূমি হইতে মরীচিকা। এই সদ্রূপের অবস্থান্তর অন্তবস্থান্তরের আভাসমাত্র। প্রকৃত অবস্থান্তর নহে। বিশ্বের উৎপত্তি এখানে বিশ্বের প্রতিভাস মাত্র। অবস্থান্তরের আভাসই অবস্থান্তর।

আত্মা।

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান সরস্বতী তত্ত্বনিধি কাব্যভূষণ কাব্যতীর্থ।)

(১)

মোক্ষলাভে যত আছে অপর সাধন
আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কারণ।
অনল-বিহনে যথা হয় না রন্ধন,
আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না কখন॥

* যতিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধ গ্রন্থের পদ্যানুবাদ।

(২)

কর্ম্ম আর অবিদ্যায় নাহিক বিরোধ
কর্ম্ম তাই অবিদ্যায় নাহি করে রোধ,
আলোক তিমিরে যথা করে দূরীভূত
বিদ্যা তথা অবিদ্যায় করে স্থানচ্যুত ॥

(৩)

মেঘোদয়ে ভানুকর ছিন্নভিন্ন হয়
মেঘমুক্ত হ'লে তার অখণ্ড প্রকাশ,
সেইরূপ অজ্ঞানের হইলে বিলয়
স্বয়ং কেবল আত্মা হন সুপ্রকাশ।

(৪)

নির্ম্মলী ফলের রেণু সলিলের মল
বিনাশ করিয়া পায় স্বয়ং বিনাশ,
জ্ঞানাভ্যাসে তথা জীব হইলে নির্ম্মল
জ্ঞানরূপা বিদ্যা পায় আপনার নাশ।

(৫)

সংসার স্বপ্নের প্রায় রাগদ্বেষ ভরা
স্বপ্নকালে স্বপ্ন যথা সত্য মনে হয়
জাগরণে মিথ্যা বলে মনে পড়ে ধরা,
এ সংসার মিথ্যা তথা হলে জ্ঞানোদয়।

(৬)

ঝিনুকে রতন বলে হইলে বিভ্রম
যে পর্য্যন্ত ঝিনুকের জ্ঞান নাহি হয়
তাবৎ রহিয়া যায় রজতের ভ্রম
সেইরূপ যে পর্য্যন্ত না হয় উদয়
সর্ব্বাধার অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান
এ সংসার সত্য বলে হয় ভাসমান।

(৭)

একই কাঞ্চন হতে কেয়ুর কুণ্ডল
নানাবিধ অলঙ্কার যথা বিনির্ম্মিত

দৃশ্যমান জগতের সেরূপ সকল
সচ্চিৎ আত্মায় নিত্য হয় বিকল্পিত।

(৮)

সর্ব্বময় সুবিপুল অখণ্ড আকাশ
পাত্রভেদে হয় তার বিভিন্ন প্রকাশ,
সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিরুপাধি
পাত্রভেদে হয় তার বিবিধ উপাধি,
পাত্রনাশে ব্রহ্মবস্তু আকাশের প্রায়
একরূপে পুনর্ব্বার সুপ্রকাশ পায়।

(৯)

নানা বস্তু যোগে নানা রসবর্ণ যথা
একরূপ জলমধ্যে অনুভূত হয়,
একব্রহ্মে নানাবিধ উপাধিও তথা
আরোপিত করে নানা জাতি-নামাশ্রয়।

(১০)

পঞ্চভূতে পঞ্চীকৃত মহাভূত হয়,
মহাভূত হতে স্থূল শরীর উদয়;
সুখ দুঃখ ভোগায়ত্ত কর্ম্মের কারণ
স্থূলদেহে বলা হয় ভোগ-আয়তন।

(১১)

প্রাণ মন বুদ্ধীন্দ্রিয় যে করে ধারণ
সূক্ষ্মাঙ্গ অপঞ্চীকৃত ভোগের সাধন।

(১২)

আদি যার নাই আর নাই নির্ব্বাচন
তাহারে কারণ দেহ বলে সুধীজন;

১০। জীবদেহ পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত। পঞ্চভূত একত্র হইলে উহাকেই পঞ্চীকৃত বলে। পঞ্চভূতময় দেহই মহাভূত নামে অভিহিত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইহাদিগকে পঞ্চভূত বলে।

১১। প্রাণ পঞ্চবিধ—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত, পদ, মুখ, গুহ্য, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন আর বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত ভূত নির্ম্মিত সূক্ষ্মদেহ জীবের সুখ দুঃখ ভোগের হেতু হইয়া থাকে।

কিন্তু আত্মা স্থূলসূক্ষ্ম কারণ হইতে
ভিন্ন বস্তু, তাহা ভুল ক'র না বুঝিতে।

(১৩)

বিশুদ্ধস্ফটিক যথা নানা দ্রব্য-যোগে
নীল-পীত-লোহিতাদি হয় নানারূপ,
শুদ্ধ আত্মা পঞ্চবিধ কোষাদিসংযোগে
সেইরূপ হয়ে থাকে সেই সেই রূপ।

(১৪)

বিশুদ্ধ তণ্ডুলরাশি মুষলের ঘায়
তুষপুঞ্জ হতে যথা ভিন্ন করে লয়,
বিচার আঘাতে তথা বিমল আত্মায়
দেহকোষ হতে ভিন্ন করিবারে হয়।

(১৫)

স্বচ্ছ দ্রব্যে প্রতিবিম্ব যথা প্রকটিত,
সর্ব্বগত আত্মা তথা বুদ্ধিতে বিম্বিত।

(১৬)

কর্ম্মচারি-কৃতকার্য্যে যথা সাক্ষী ভূপ,
দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে
তাহাদের সর্ব্বকার্য্যে সাক্ষীর স্বরূপ
বিলক্ষণ আত্মতত্ত্ব বুঝে লও চিতে।

(১৭)

আকাশেতে ধাবমান হেরি নীরধর
মনে করে অজ্ঞ নর ধায় সুধাকর,
জীবেন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত হেরি কর্ম্ম-প্রেরণায়
কর্ম্মশীল ভাবে নর নিষ্ক্রিয় আত্মায়।

(১৮)

লোক যথা সূর্য্যালোক করিয়া আশ্রয়
নিজ নিজ কার্য্যে সবে বিনিবিষ্ট হয়,

১৩। পঞ্চকোষ—(১) অন্নময় (২) প্রাণময় (৩) মনোময় (৪) বিজ্ঞানময় (৫) আনন্দময়।

আত্মার চৈতন্যে তথা করিয়া আশ্রয়
কর্ম্মলিপ্ত দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধিচয়।

(১৯)

অজ্ঞ যথা মেঘশূন্য নির্ম্মল অম্বরে
নীলত্বাদি বর্ণরাশি নিরীক্ষণ করে,
দেহাদির গুণকর্ম্ম বিশুদ্ধ আত্মায়
মনে করে থাকে যত নর অজ্ঞতায়।

(২০)

প্রতিবিম্ব পড়ে যদি জলেতে চঞ্চল
শশাঙ্ক বিবিধরূপে হয় দৃশ্যমান,
সেইরূপ প্রকল্পিত আত্মায় নির্ম্মল
উপাধির কর্তৃত্বাদি হইতে অজ্ঞান।

(২১)

বুদ্ধিতে রাগেচ্ছা সুখ দুঃখ প্রবর্ত্তিত
সুপ্তিকালে বুদ্ধি-লয়ে থাকে না কিছুই,
বুঝ তাই উক্ত গুণ বুদ্ধির শুধুই
নয় তা আত্মার গুণ উপরি-কথিত।

(২২)

রবির প্রকাশ গুণ, শৈত্য সলিলের,
উষ্ণতা স্বভাব-সিদ্ধ গুণ অনলের,
সেরূপ আনন্দ নিত্য নির্ম্মলতা আর
সত্তা জ্ঞান গুণগ্রাম জানিবে আত্মার।

(২৩)

আত্মার সচ্চিৎ অংশ বুদ্ধিবৃত্তি আর
উভয়ে সংযুক্ত হয়ে, বুঝ সুধীজন,

২১। জাগ্রত স্বপ্ন এই উভয়ের অবস্থানুসারে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, সুষুপ্তি-কালে জীবের বুদ্ধি স্বীয় কারণে বিলয় পায়, প্রস্তাবিত সুখ দুঃখও থাকে না সুতরাং উহা বুদ্ধির গুণ। আত্মার গুণ নহে।

২২। জীব কেবল আত্মার সচ্চিৎ অংশ মাত্র। কারণ উহাই সত্তাত্মক জ্ঞানের অংশমাত্র।

'আমি জানি' ইত্যাকার যত অহঙ্কার
অবিবেক সহকারে করে প্রবর্ত্তন।

(২৪)

নাহিক বুদ্ধির বোধ, আত্মার বিকার,
উভয়ের অস্তিত্বের ব্যর্থ জ্ঞান দ্বারা
আপনারে জ্ঞাতা দ্রষ্টা ভাবি ইত্যাকার
জীব শুধু হয়ে থাকে মুগ্ধ দিশাহারা।

(২৫)

রজ্জুতে সর্পের ভ্রমে হয় যদি ভয়,
রজ্জুজ্ঞান হলে পুনঃ ভয় নাহি রয়,
আত্মার জীবত্বভ্রমে যায় জীব-ভয়
আপনাতে আত্মজ্ঞান হইলে নিশ্চয়।

(২৬)

প্রদীপ পদার্থচয় করে প্রকাশিত,
জড়বস্তু দীপে কবে করে আলোকিত?
সেরূপ জীবের বুদ্ধি ইন্দ্রিয় নিচয়
আত্মার আলোক বলে প্রকাশিত হয়।
জড়ের স্বভাব কিন্তু বুদ্ধীন্দ্রিয়গণ
প্রকাশিতে পরাত্মায় পারে না কখন।

(২৭)

প্রজ্বলিত প্রদীপের প্রকাশের তরে
অপর দীপের নাহি আবশ্যক করে;
স্বয়ং প্রকাশবলে আত্মার স্বরূপ
জানিতে না লাগে অন্য জ্ঞান কোন রূপ।

(২৮)

নেতি নেতি এ প্রকার করিয়া বিচার
নিখিল উপাধিরাশি হইলে নিষেধ,

২৮। ইহা নয় ইহা নয় এইরূপে দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধিকে নিষেধ করতঃ তত্ত্বমসি অর্থাৎ তুমি পরমাত্মা এই জ্ঞান হয়। এইরূপ বিচারকে অতদ্‌ব্যাবৃত্তি বলে।

তত্ত্বমসি মহাবাক্য লব্ধ হয় যার
জীবাত্মায় পরাত্মায় ঘুচে তার ভেদ

(২৯)

অবিদ্যা-সঞ্জাত দৃশ্য শরীর-নিকর
জলের বুদ্‌বুদ্‌বৎ ভাবি বিনশ্বর
তাহা হতে বিপরীত যাহার লক্ষণ
নিরমল ব্রহ্ম আমি করিবে চিন্তন ।

(ক্রমশঃ)

বৈদিক সাহিত্যের কাল নিরূপণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ।)

(লেখক—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ ।)

মন্তব্য :— "বৈদিক সাহিত্যে রবিমার্গের চারিটী প্রধান বিন্দুর স্থ (বিষুববিন্দুদ্বয় এবং অয়নান্ত বিন্দুদ্বয় অবস্থান নির্ণায়ক কোন প্রমাণ আছে কিনা তাহাই অনুসন্ধান করা হইতেছে, বৈদিক সাহিত্যে এমন কোন উল্লেখ নাই যাহাদ্বারা মৃগশিরাকে আদি নক্ষত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু অমর কোষে বলা হইয়াছে "মার্গশীর্ষ" সহামার্গ আগ্রহায়ণিক শ্চ সঃ" আগ্রহায়ণি অর্থে বৎসরের প্রারম্ভ বুঝায়। সেজন্য অভিধান-প্রণেতৃগণ অনুমান করিয়াছেন যে মার্গশীর্ষ মাসের পূর্ণিমার দিনেই ঐ সময়ে বৎসর আরম্ভ হইত, এজন্য ঐ মাসকে আগ্রহায়ণিক বলা হইয়াছে।"

কিন্তু যখন এই সকল অভিধান-প্রণেতৃগণ অমর সিংহের ন্যায় ঐ নক্ষত্রকে আগ্রহায়ণি নামে অভিহিত করিলেন এবং ঐ নক্ষত্রের সন্নিকটস্থ পূর্ণিমাতিথি হইতে পূর্ব্বকালে * বৎসর আরম্ভ হইত এই হেতু নির্দ্দেশ করিলেন তখন এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। নক্ষত্রের নাম অনুসারে সাধারণতঃ পূর্ণিমা বা অন্য তিথির নামকরণ হইয়া থাকে যথা—চৈত্রী, পৌষম্, পৌষী, (পাণিনি—৪—২—৩) কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পর্য্যায়-বৈপরীত্য সংঘটন করিয়া পূর্ণিমার নাম অনুসারে নক্ষত্রের

* ভানু দীক্ষিতের অমরকোষের টীকা ১—৩—২৩ "অগ্রে হায়ণমস্যাঃ। মার্গশীর্ষমারভ্য বর্ষ-প্রবৃত্তেঃ।"

নামকরণ হইল। অমরসিংহ কেন পূর্ণিমা-রাত্রি-জ্ঞাপক আগ্রহায়ণি শব্দটিকে মৃগশিরা নক্ষত্রের সহিত একার্থবোধক করিলেন ইহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া অভিধান-প্রণেতৃগণ পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, এক্ষণে দেখা যাক্ তাঁহাদের ব্যাখ্যা ও অমর সিংহের উক্তি প্রকৃতই নির্ভুল কিনা। পাণিনিতে ঐরূপ ক্রম-বিপর্য্যয়ের কোন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। পাণিনিতে (৪—২—২২) আগ্রহায়ণি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই নিয়ম পাওয়া যায় যে মাসের ধাতুগত সংজ্ঞা আগ্রহায়ণি ও অশ্বত্থ এই দুই শব্দের উত্তর থক্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয় * এবং সেজন্য মার্গশীর্ষ ও আশ্বিন মাসের জন্য আগ্রহায়ণিকা ও অশ্বত্থকা শব্দদ্বয় পাওয়া যায়। ঐ সূত্রে পাণিনি বলিয়াছেন যে মাসের নাম সেই মাসে সংঘটিত পূর্ণিমার নাম হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি আগ্রহায়ণি শব্দে পূর্ণচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, মৃগশিরা নক্ষত্র বুঝেন নাই। পাণিনিতে আগ্রহায়ণি শব্দটীর তিনবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৪—২—২২, ৪—৩—৫০, ৫—৪—১১০) এবং প্রত্যেক স্থলেই ইহাদ্বারা পূর্ণিমা তিথি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চৈত্রী প্রভৃতি শব্দ যেরূপভাবে উদ্ভূত হইয়াছে, এই শব্দটী পাণিনি সেইরূপভাবে ব্যবহার করিয়াছেন কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। স্বরূপ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিলে আগ্রহায়ণি শব্দটি কার্ত্তিকী ও ফাল্গুনী শব্দের ন্যায় অগ্রহায়ণ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মনে করা যায়, এবং মৃগশিরা নক্ষত্রের ঐ নাম পূর্ব্বে থাকিতে পারা অসম্ভব নয়। যদি অমর সিংহের ন্যায় আমরা আগ্রহায়ণি শব্দটিকে মৃগশিরা নক্ষত্রের সহিত তুল্যার্থবোধক মনে করি এবং দেশীয় বৈয়াকরণিকগণের ন্যায় পূর্ণিমা হইতে নক্ষত্রের নামকরণ করি তাহা হইলে আগ্রহায়ণি শব্দের আদ্য স্বরটী দীর্ঘ হওয়ার কারণ স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই ঘটনা পূর্ব্বোক্ত ধারণার অনুকূল কারণ জ্ঞাপক মনে করা যাইতে পারে। সমুদয় পণ্ডিতগণ "অগ্র" ও "হায়ণ" এই দুইটী শব্দ বহুব্রীহি সমাসযুক্ত করিয়া পরে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগে ঐ পদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীপ্রত্যয় করিতে গেলে পূর্ব্বে একটী অণ্ প্রত্যয় আবশ্যক এবং উহাদ্বারা আদ্যস্বর দীর্ঘ হইতে পারে। যে হেতু—"ই" সাধারণতঃ

* আগ্রহায়ণ, পৌর্ণমাসী। তদ্ভোগান্নক্ষত্রমপি তথা।

* নক্ষত্রেণ যুক্তঃকালঃ। ৪—২—৩+ + + + প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পাণিনি ৫—৪—৩৮—

স্ত্রীপ্রত্যয় নহে, কেবল বিশেষভাবে উহা ব্যবহৃত হয়। পাণিনি ৪—২—৩ হইতে আমরা এই অণ্ প্রত্যয় পাই না, যেহেতু অমরসিংহের মতে আগ্রহায়ণি শব্দটি নক্ষত্রের নাম নহে। সুতরাং আদ্যস্বর কেন দীর্ঘ হইল সেজন্য নানাপ্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভট্টজী বলেন যে আগ্রহায়ণি শব্দটীকে প্রজ্ঞাদি (৫—৪—৩৮) তালিকার অন্তর্ভূত করিলে আদ্যস্বর দীর্ঘ হইতে পারে। কিন্তু গণপাঠে উহাকে আকৃতি গণরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কিংবা অগ্রহায়ণ শব্দটী এস্থলে প্রদত্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত নহে। বোথলিং Boehtlingk এবং রথ (Roth) তাঁহাদের অভিধানে পাণিনির ৫—৪—৩৬ নিয়মে দীর্ঘ স্বর সিদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু উহা হয়ত ৫—৪—৩৬ না হইয়া ৫—৪—৩৮ হইতে পারে। তারানাথ তাঁহার বাচস্পত্যভিধানে পাণিনির ৫—২—১০২ নিয়মে দীর্ঘ স্বর সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু জ্যোৎস্নাদিকে স্পষ্টভাবে আকৃতিগণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ভট্টজী দীক্ষিতের পুত্র ভানু দীক্ষিত তাঁহার অমরকোষের টীকায় মুকুটের মত খণ্ডন করিয়া তাঁহার পিতার মত গ্রহণ করিয়াছেন। মুকুট, পাণিনি ৪—২—২২ এ ঐ শব্দটী এইরূপ দীর্ঘ আদ্যস্বর বিশিষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন, এই হেতু নির্দ্দেশে আদ্য স্বরটী দীর্ঘ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদ্বারা বোঝা যায় যে ঐ শব্দটী একেবারে দীর্ঘস্বর বিশিষ্ট পাওয়া গেলে পাণিনি কেন উহাকে গৌরাদি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিলেন তাহার আর একটা কারণ আবশ্যক। মুকুট বলেন যে ইহাদ্বারা পাণিনি দেখাইতে চান আগ্রহায়ণি শব্দটীর স্ত্রীপ্রত্যয়টী সমাস হইলেও লুপ্ত হয় না। ভানুদীক্ষিত বলেন যে গৌরাদি তালিকা ঐ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয় নাই এবং উচ্চারণ সম্বন্ধে অন্য নিয়মের প্রয়োগ দেখাইতে পারা যায়। ভানুদীক্ষিতের কিম্বা তাঁহার পিতার ব্যাখ্যা অনুসারে—গৌরাদি তালিকার অন্তর্ভুক্ত না করিলেও চলে, কেননা তাঁহারা বলেন পাণিনি ৪—১—১৫ অনুসারে স্ত্রী প্রত্যয় "ই" হইতে পারে না। সেজন্য মুকুটের ঐ কথার উত্তরে তিনি বলেন যে ঐ শব্দটি গৌরাদি তালিকার অন্তর্ভুক্ত কিনা ইহা সন্দেহ জনক। সুতরাং যদি অমর সিংহের মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং ঐ আগ্রহায়ণি শব্দটি ভট্টজী বা মুকুটের মত অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, তবে ইহা বুঝিতে হইবে যে হয় উহা ভুলক্রমে নতুবা পরে গৌরাদি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং পাণিনি ইহা জানিয়াও ইহাকে প্রজ্ঞাদি বা জ্যোৎস্নাদি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

এই উভয়বিধ ব্যাখ্যায় নক্ষত্রকে পূর্ণিমার নামে অভিহিত করিয়া পাণিনির ৪—২—৩ লিখিত ক্রম ভঙ্গ করা হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

তীর্থে নূতন জিজিয়াঃ— দিন দিন এ দেশের অধিবাসীর উপর নূতন নূতন করের বোঝা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যেখানে কর, সেখানেই পীড়ন, কারণ সকলে সময়মত কর দিতে পারে না; অথচ না দিলেও নিস্তার নাই। সুতরাং পীড়ন না করিলে আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই। এ'ত হইল অধিবাসীর পক্ষে, এখন তীর্থযাত্রীর পক্ষে দিন দিন নূতন কর ধার্য্য হইতেছে। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে বহু যাত্রী স্নান-মানসে সমবেত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে মাথা গণিয়া কর আদায় করা হইত না; কিন্তু জেলা বোর্ড প্রথমে /০ পরে ৵০ বর্ত্তমান বৎসর ।৵০ হিসাবে মাথা গণিয়া কর ধার্য্য করিয়াছেন। ইহাছাড়া এই ট্যাক্স দেওয়া হইল তাহার নিদর্শন স্বরূপ ৵০ দিয়া একটা ধ্বজা কিনিতে হয়। কর্তৃপক্ষ যদি ধর্ম্ম কার্য্যের উপর এরূপ ভার চাপান তবে ধর্ম্মকার্য্যের বাধা হয়। সৎকার্য্যে বাধা না জন্মে, তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

শোক সংবাদঃ— বিগত ১১ ই মাঘ সোমবার যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রামের বিখ্যাত সেন পরিবারের উজ্জ্বলতম রত্ন শ্রী যুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র সেন মহাশয় ৬৪ বৎসর বয়সে বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন দেশবাসী সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি জীবিতকালে লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। দরিদ্রের দুঃখমোচন, অসহায়কে সাহায্য দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান প্রভৃতি সর্ব্বজনাদৃত লোক-হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়বর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ এই মহানুভব মহাপুরুষের পরলোকগত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন ইহাই আমাদের কামনা।

নূতন চরকার আবিষ্কারঃ— কাশ্মীরের দৌলতরাম শর্ম্মা নামক জনৈক ভদ্রলোক বারমুখী চরকা নামক এক প্রকার নূতন চরকা আবিষ্কার করিয়াছেন। মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা দিন দিন কতই আবিষ্কৃত হইবে, কে বলিতে পারে? এরূপ আবিষ্কার মঙ্গলের কথা।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৯ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড
১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩২৯ সাল।
১৮৪৪ শকাব্দাঃ

বহুরূপী।

সম্পাদক।

হে বহুরূপিন্, তুমি নিত্য নববেশে
এসে থাক মম গৃহে, তবু কিন্তু আমি
তোমায় চিনিতে নারি ; তুমি নিজরূপ
ঢেকে রেখে ফাঁকি দেও অপূর্ব্ব কৌশলে।
তুমি যেইভাবে দেখা দেও, আমি ভাবি
তুমি সত্য সত্য তাই, নহ অন্য কেহ।
ফকিরের বেশে আসি, দ্বারে ভিক্ষা চাও,
ফকির ভাবিয়া দেই মুষ্টিভিক্ষা আমি।
আমির সাজিয়া কভু এস মম গৃহে,
করি সমাদর তোমা আমির ভাবিয়া।
এস সন্ন্যাসীর বেশে, মুখে বম্ বম্
শিরে শোভে জটাভার, অঙ্গ ভস্ম-মাখা।

অমনি সাষ্টাঙ্গে প্রণমি চরণে তব।
এইরূপ কত সাজে নিত্য সাজ তুমি।
দিবসে নিশি; নব নব ভাবে কত।
দেখা দেও তুমি আমি না পারি চিনিতে



কর্ম্মযোগ।

লেখক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মোক্ষের জন্য যে সকল সাধন-মার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে কর্ম্মযোগ অন্যতম। শুধু তাহাই নহে, সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, প্রভৃতি অপেক্ষা কর্ম্মযোগই সাধারণ মানবের পক্ষে অধিক উপযোগী বলিয়া গীতাতে এই কর্ম্মযোগের বিষয়ই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া ইহার উপর যেন অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ এই বলিয়াই মনে হয় যে সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতির সাধন করিতে হইলে তদনুরূপ উপযুক্ততার প্রয়োজন—যে ব্যক্তি একেবারে মূর্খ তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগের সাধন সম্ভবপর নহে—যে ব্যক্তি ভাব বা প্রেমবিহীন তাহার পক্ষে ভক্তিযোগ অসম্ভব—(এইরূপ জ্ঞান বা প্রেম অবশ্য ইহজন্মার্জ্জিত বা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত হইতে পারে)—কিন্তু কর্ম্মযোগ সাধনের পক্ষে কাহারও বাধা নাই ইহা সকলেরই পক্ষে প্রযোজ্য। কারণ জীব যতদিন না সাধনের চরম সীমায় উপনীত হয় ততদিন তাহাকে বাধ্য হইয়া, প্রকৃতির বশে, কর্ম্ম করিতেই হয়।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

"কেহ অল্পক্ষণ মাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, সকলকেই প্রকৃতির গুণের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হয়।"

বাস্তবিক একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে কর্ম্ম না করিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কেহ হয় ত বলপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে রোধ করিয়া নিষ্কর্ম্মতার ভাণ করিতে পারেন, কিন্তু এ অবস্থায় আসল যে কর্ম্ম তাহার মনে মনে হইয়া যাইতেছে—ইহাকে তাড়াইবার কোন উপায় নাই।

আর এইরূপ নিষ্কর্ম্মতার ভাণও অধিকক্ষণ করা যায় না। কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়া নির্জ্জন কারাবাস (Solitary imprisonment) কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাস অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন এই কর্ম্মকে যদি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যে তদ্দ্বারা বন্ধন কাটে ও মোক্ষের উপায় হয়, তাহা হইলে সেই পন্থা সকল লোকের পক্ষে অবলম্বনীয় হইল। এক্ষণে কি উপায়ে কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিলে, ইহাই মোক্ষের পথ হয়, তাহাই বিবেচ্য। গীতাতে এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(১) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

(২) যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

(৩) সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈব পাপমবাপ্স্যসি॥

(৪) যজ্ঞদান-তপঃ-কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥

(১) অতএব সর্ব্বদা আসক্তিহীন হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাও। আসক্তিহীন হইয়া কার্য্য করিলেই পুরুষ পরম পদ লাভ করে।

(২) যাঁহার সকল কার্য্য কামনা ও সঙ্কল্পরহিত, তাঁহারই কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এবং বুধগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন।

(৩) সুখ দুঃখ, লাভ ও অলাভকে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে (স্বকার্য্যে) নিযুক্ত হও—ইহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না।

(৪) যজ্ঞ দান ও তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে—এগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য—যেহেতু যজ্ঞ দান ও তপস্যাই মনীষিগণের পবিত্রতা সাধন করে। অতএব আমার নিশ্চিত মত এই যে এই সকল কর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করা উচিত। উপযুক্ত এবং গীতার অন্যান্য বহু শ্লোকেই এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম আসক্তিশূন্য ও ফলকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া করা উচিত—ইহাই কর্ম্মযোগ এবং ইহাই সাধন।

সাধারণের মধ্যে এই বিষয়ের একটী ভ্রমাত্মক ধারণা দেখা যায়—অনেকে বলিয়া থাকেন যে যদি আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিল, তবে কর্ম্মের প্রতি আগ্রহ থাকিবে কিরূপে এবং আগ্রহ না থাকিলে কর্ম্মই বা হইবে কি প্রকারে? কর্ম্মের উদ্দেশ্যের সম্যক্ জ্ঞান এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আগ্রহ না থাকিলে যে কর্ম্ম হয় না, ইহা খুব ঠিক কথা। এই উদ্দেশ্যের জ্ঞান ও ইহা সাধনের পক্ষে আগ্রহ না থাকিলে কর্ম্মের অভিনয় হয় মাত্র—প্রকৃত কর্ম্ম হয় না। এবং ভগবান্ কখনই কর্ম্মের অভিনয় মাত্র করিতে বলিতেছেন না। এস্থলে আমাদিগকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে আগ্রহ ও আসক্তি, উদ্দেশ্যের জ্ঞান ও ফলাকাঙ্ক্ষা এক বস্তু নহে। একটী কর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক—ধরুন কোন ব্যক্তির কর্ম্ম হইল অপর এক বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করা। এই কার্য্য করিতে হইলে তাহার প্রথমতঃ বিপদ্‌টা কি এবং কি করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার করা যায় তাহার জ্ঞান থাকা চাই দ্বিতীয়তঃ এই উদ্ধার সাধন করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট আবেগ থাকা এবং সেই জ্ঞান ও আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে অনুরূপ অঙ্গচালনা (আবশ্যকমত কথা বলা, অস্ত্রপ্রয়োগ করা) ইত্যাদি করা চাই! তাহা হইলে কর্ম্মের তিন অংশ—উদ্দেশ্য, আগ্রহ ও উপযুক্তরূপ ইন্দ্রিয়াদি পরিচালনা—এই তিনটীর কোন একটী না হইলে কর্ম্ম কখনও সম্পূর্ণ হয় না। যদি উদ্দেশ্যের জ্ঞান না থাকিল, তবে কর্ম্ম করা বাতুলতা মাত্র—যদি কর্ম্মের প্রতি আগ্রহ না থাকিল, তাহা হইলে সেই কর্ম্মের কর্ত্তা পশুর ন্যায় অনিচ্ছায় ভার বহন করেন কর্ম্মের অভিনয় করেন মাত্র—আবার উদ্দেশ্যের জ্ঞান ও ভাব বা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যদি উপযুক্ত বাহ্যেন্দ্রিয়-পরিচালনা (যাহাকেই স্থূলতঃ কর্ম্ম বলা যায়) না হইল, তাহা হইলে কর্ত্তার অলীক স্বপ্ন দেখা হইল মাত্র। এই তিনটীই চাই। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মে এই তিনের কোনটীও নিষিদ্ধ নহে। সাত্ত্বিক কর্ত্তার লক্ষণ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো র্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

"যে কর্ত্তা (কর্ম্মকারী) আসক্তিশূন্য, আমি করিতেছি এই দম্ভ যাঁহার নাই, যিনি ধৃতি এবং উৎসাহ (আগ্রহ)-যুক্ত, এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে বা বিকারশূন্য, তাঁহাকেই সাত্ত্বিককর্ত্তা বলা যায়।"

এখানে আগ্রহ বা উৎসাহকে সাত্ত্বিক কর্ম্মের লক্ষণ স্পষ্টতঃই বলা হইল। অতএব কোন ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্মে আগ্রহ বা উৎসাহ দেখাইতেছেন, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না যে তাঁহার কর্ম্ম নিষ্কাম নহে - পরন্তু উৎসাহ ও আগ্রহের অভাবই জড়ত্ব বা তামসিকতার লক্ষণ।

এখন প্রশ্ন এই যদি নিষ্কাম কর্ম্মে, উদ্দেশ্যের জ্ঞান, আগ্রহ, বাহ্যকর্ম্ম, সকলই রহিল, তবে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মে প্রভেদ কি? প্রভেদ "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো র্নির্ব্বিকারত্ব"—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকারশূন্যতা— পূর্ণ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত বিধিমত কর্ম্ম করিয়া যাইব—ফল যাহাই হউক, তাহাতে বিচলিত হইব না,—এই হইল নিষ্কাম কর্ম্ম।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে ফলাফলের প্রতি যাহার লক্ষ্য নাই, তাঁহার উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করা সম্ভবপর কিনা? গীতা বলিতেছেন ইহা নিশ্চয়ই সম্ভবপর। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে ব্যক্তির কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য, সে কর্ম্মে তাহার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না—ফল কি হইতেছে না হইতেছে বা হইবে না হইবে এই ভাবনাতেই তাহার শক্তি নষ্ট হয়—সে ভালরূপে কার্য্য করিবে কি প্রকারে? মনে করুন, কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন—তাঁহার যদি ধারণা এই হয় বক্তৃতার ফল লোকের চিত্ত-রঞ্জন ও লোকযশঃ, তাহা হইলে তাঁহার বক্তৃতা লোকে কিরূপ মনোযোগের সহিত শুনিতেছে, বাহবা দিতেছে কি না, এই সকলের উপরই অধিক লক্ষ্য থাকে—বক্তৃতাকার্য্যে তাঁহার সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিতে তাঁহার ক্ষমতা কোথায় রহিল? অপর দিকে যে ব্যক্তির মনের ভাব এই যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা লোক সমক্ষে বলাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, লোকে ভালই বলুক আর মন্দই বলুক তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না, তাহার শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিতে কিছুই নাই, সে সকল শক্তি দিয়া নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ সকল কর্ম্মে।

তাহা হইলে একণে প্রতিপাদিত হইল যে কর্ম্মফলের প্রতি উদাসীন হইয়া কর্ম্ম করা যায়—কেবল তাহাই নহে, কর্ম্মফলে উদাসীন হইলেই কর্ম্ম ভালরূপে করা হয়। কর্ম্মফলে উদাসীন হইলে যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য থাকিবে না এবং কর্ম্ম-সাধনার্থ আগ্রহ থাকিবে না তাহা নহে—উদ্দেশ্য স্থির থাকা এবং আগ্রহ থাকা একান্ত আবশ্যক—তবে এগুলি থাকা সত্ত্বেও কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য থাকিবে না অর্থাৎ সিদ্ধিতে

অসিদ্ধিতে সমভাব হইবে। ইহাই হইল কর্ম্মযোগ—এইরূপে কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইবে, এবং এই ভাবে কৃত কর্ম্ম আর বন্ধন না আনিয়া মুক্তিরই পথ করিয়া দিবে। কিছুদিন অভ্যাস করিয়া পরীক্ষা করিলে সকলেই ইহা নিজেই বুঝিতে পারেন—অধিক যুক্তি তর্কের আবশ্যকতা কি? পাশ্চাত্য নীতিবেত্তারাও এই কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে "কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য" *Duty for Duty's sake* ইহাই মানবের পক্ষে উচ্চতম নীতি। এই নীতি আরও অধিক উচ্চভাব ধারণ করে, যদি কর্ত্তব্য শুধু কর্ত্তব্যের জন্য না হইয়া শ্রীভগবানের জন্য হইয়া থাকে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এ কথার উল্লেখ আছে প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

লেখক—শ্রীআশুনাথ কাব্যতীর্থ।

নিবৃত্তর্ষৈরুপগীয় মানাৎ।
ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
কঃ উত্তম শ্লোক গুণানুবাদাৎ।
পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ। ২

একমাত্র আত্মঘাতী ব্যতীত উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন হইতে কে নিবৃত্ত হইতে পারে? বিষয়বাসনা-পরিশূন্য মুক্ত ব্যক্তিরাও অবিতৃপ্তভাবে যাঁহার গুণগান করেন, এবং যাহা ভবরোগের একমাত্র ঔষধ ও যাহা শ্রবণ ও মনের প্রীতিকর, সেই সর্ব্বকল্যাণকর শ্রীকৃষ্ণের নাম গানে কে বিরক্ত হইবে? যিনি ধর্ম্মসংস্থাপয়িতা, যিনি জীবের গতি, যিনি একমাত্র প্রেমের পাত্র, যিনি বিশ্বরূপ, তাঁর গুণকীর্ত্তনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনিই মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই মনুষ্যের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। যাহা সুদৃঢ় ধর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, তাহা অচিরস্থায়ী। ধর্ম্মই সবাইকে ধরিয়া রাখে। ধর্ম্মকে উপেক্ষা

করিয়া মানব কখনও জীবিত থাকিতে পারে না। ধৃতি ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মের যে দশটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার প্রত্যেকটীই মনুষ্য সমাজের সুখশান্তির হেতু ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার উপায়। ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা করিয়াই মনুষ্য অশেষ দুঃখভাজন হইয়াছে। ধর্ম্ম ব্যতীত সমাজের শৃঙ্খলা থাকে না, মনুষ্য-জীবনও দুঃখময় হইয়া থাকে। মানবের প্রকৃত জীবনীশক্তি ও মুলমন্ত্র ধর্ম্ম। ধর্ম্ম জগতের সীমার বাহিরে, অতি দূরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করে। সেখানে গেলে সংসারের সুখ দুঃখ আর স্পর্শ করিতে পারে না। তখন সমগ্র জগৎই সেই মহিমময় "ভূমা" আত্মারূপ মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়। একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই উপদেশ দিয়া থাকে, জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।

ত্যাগই ঐ ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, ভোগ নহে। এক এক জাতির পর আর এক জাতি সংসার রঙ্গভূমে নিজ অংশ অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাল-সমুদ্রে তাহারা একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গও উৎপাদন করিতে পারে নাই। কিন্তু, হিন্দু, কাক ভূষণ্ডীর মত বাঁচিয়া আছে। এই জাতির এখনও জীবনীশক্তি আছে। আমরা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র জগৎকে একটী সমস্যা পুরণে আহ্বান করিতেছি। পাশ্চাত্যদেশে সকলে এই চেষ্টা করিতেছে যে, সে কিসে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য সামগ্রীর অধিকারী হইবে। আমরা কিন্তু এখানে এই সমস্যায় নিযুক্ত যে, কত অল্প জিনিষ লইয়া আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। উভয় জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষ ও প্রভেদ এখনও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিবে। কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছু সত্য থাকে, যদি বর্ত্তমান চিহ্নসমূহ দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করা বিন্দু-মাত্র সম্ভব হয়, তবে দেখা যাইবে যে, যাহারা খুব অল্পের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ভবিষ্যৎ যুদ্ধে জয়ী হইবে। আর ভোগসুখাভিলাষী ব্যক্তিরা আপাততঃ যতই তেজস্বী প্রতীয়মান হউক্ না কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ভোগবিলাসেও যখন আশা মিটে না, তখন তাহাতেও বিতৃষ্ণা জন্মে। সনাতন ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের প্রায় প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলিই তাহাদের প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তকগণের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেই সকল যাবতীয় মত শিক্ষা নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই ঐ উপদেশগুলি লোকের মনে ঐরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই প্রবর্ত্তকের

জীবনের ঐতিহাসিকতার উপর যেন সেই সকল ধর্ম্মের আগাগোড়া ভিত্তি স্থাপিত। যদি সেই জীবনের ঐতিহাসিকতার উপর কিছুমাত্র আঘাত করা যায়, যদি তাঁহাদের উক্ত তথাকথিত ঐতিহাসিকতার ভিত্তি একবার ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তবে, সমুদয় ধর্ম্মপ্রাসাদটীই একবারে সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া যায়। তখন উহা পুনরুদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। বাস্তবিকই বর্ত্তমানকালে তথাকথিত প্রায় সকল ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের জীবনের সম্বন্ধেই তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহাদের জীবনের অর্দ্ধেক ঘটনা লোকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে; আর বাকি অর্দ্ধেকের উপর বিশেষ সন্দেহ। কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন নরনারীই বেদের প্রণেতা বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। বেদে সনাতন তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঋষিগণ উহার আবিষ্কর্ত্তা মাত্র। স্থানে স্থানে ঐ ঋষিগণের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু নাম মাত্র। তাঁহারা সনাতন তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন এবং নিজেরা জীবনে সেই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আদর্শ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন। সনাতন ধর্ম্ম কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। অথচ ইহাতে অনন্ত অবতার ও মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্মে যত অবতার, ঋষি মহাপুরুষ আর কোন্ ধর্ম্মে এত? ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে যে সকল অবতার, মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে তাঁহারা অনৈতিহাসিক প্রমাণিত হইলেও ধর্ম্মে কোন আঘাত লাগিবে না। কারণ, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর স্থাপিত নহে। ইহা সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ-বিরহিণী।

(লেখক—শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল।

তোমা লাগি প্রিয়তম, দিবানিশি তিতি আমি
নয়নের নীরে।
শয়নে স্বপনে তব মধুর মুরতি জাগে
হৃদয়-মন্দিরে।

পাতার মর্ম্মর ধ্বনি পশিলে শ্রবণে মোর
চকিতে তাকাই,
ভাবি বুঝি এলে তুমি; চারিদিক নিরখিয়া
দেখি তুমি নাই।
আশার লতিকা মম দারুণ আঘাতে হয়
ধূলি-বিলুণ্ঠিত,
নয়নে উছলি জল দর দর বহি, করে
হৃদয় প্লাবিত।
প্রাবৃট-গগন-তলে নবীন-নীরদ-কান্তি
করি দরশন।
স্মৃতি-পথে উদে নাথ, তোমার মাধুরীমাখা
শ্যামল বরণ।
মনের আবেগে কভু হেরিতে স্বরূপ তব
যমুনায় যাই,
কালিন্দী-জীবনে তব ভুবনমোহন রূপ
দেখিবারে পাই;
মনের আবেগে সখা, ঝাঁপ দিয়া পড়ি জলে
পাগলের মত,
ছুটে আসি সখীগণ সবলে করে গো মোরে
তীরে উত্তোলিত।
কানন-মাঝারে তব স্বরূপ হেরিব ভাবি,
হে কানন-চারি,
একাকিনী যাই বনে, দূর্ব্বাদলমাঝে পুনঃ
তোমারে নেহারি,
অমনি সম্বিত-হারা গড়াগড়ি যাই আমি
ধরণীর পরে,
অনুসরি সখীগণ দ্রুত আগমন করি,
উঠায় আমারে।
সুনীল অম্বর পানে চাহিয়া তোমার রূপ
করি দরশন,

এ বিশ্বে, হে বিশ্বনাথ, সর্ব্বত্র স্বরূপ তব
নেহারে নয়ন।
তবু যে অতৃপ্ত আশা চাহে তোমা ধরিবারে
ভুজের বন্ধনে,
চাহে অপার্থিব সুখ করিবারে আস্বাদন
তোমার মিলনে!
কানন-পাদপ-মাঝে কোকিল-কাকলি শুনি
ভাবি তব বেণু,
আবার আসিলে বুঝি ব্রজনাথ বৃন্দাবনে
চরাইতে ধেনু।
শুনিবারে তথ্য তার ধাই নন্দালয় পানে
পাগলিনী-প্রায়,
হেরি তথা যশোমতী লুটায় অবনীতলে
স্মরি শ্যামরায়!
জ্ঞানহারা হ'য়ে নাথ, অমনি লুটাই ক্ষিতি,
যশোমতী আসি
আদরে করিয়া কোলে করেন সান্ত্বনা কত
অশ্রুজলে ভাসি!
রজনীতে নিদ্রা নাই, নেহারি স্বপনে শুধু
মুরতি তোমার,
তবু কি হৃদয়ে তব না পড়িবে দয়াময়
ছায়া করুণার?
আর কতদিন মোরে এ দুখদহনে বল,
জ্বালাইবে নাথ?
করহ করুণা সখা, উচ্চারি তোমার নাম
হ'ক প্রাণপাত।
ঘটাকাশে মহাকাশে হউক উভয়ে নাথ
অভেদ মিলন;
জীবাত্মার পরাত্মায় টুটিয়া যাউক রোধ—
মায়ার বন্ধন!

গো-মাতা।

লেখক—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

"গৌর্মে মাতা ঋষভঃ পিতা মে শর্ম্ম জগতি মে প্রতিষ্ঠা"—বলিয়া যে গোমাতাকে শ্রুতি "মাতৃ" সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়াছেন, সেই গোমাতার আজ কি দুর্দ্দশা! আজ গোমাতার মুণ্ড ছিন্ন করিয়া শত শত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের উদরপূর্ত্তি করা ও বাহুতে বলের সমাধান করা হইতেছে! জাতি—জীবন্মৃত হিন্দুজাতি—তাহা দেখিয়াও নীরবে সহ্য করিতেছে, ইহা অপেক্ষা জাতির অধঃপতন আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বে প্রতি গৃহস্থ গোপালন, গোসেবা, ও গোপরিচর্য্যা অতি ধর্ম্ম ও পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করিত, প্রতি গৃহস্থের কন্যাগণ গো দোহন করিতেন, তাই তাঁহাদের নাম "দুহিতা" হইয়াছিল। ব্রজের রাখাল "গোপাল" স্বয়ং গোয়ালের ঘরে জন্ম লইয়া গোপালনের চরম উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। গো-দেবতার সেবা সুশ্রূষাই ছিল প্রাচীনকালের শিক্ষার প্রধান উপকরণ। আয়োদধৌম্য ঋষির ছাত্র উপমন্যু গুরুর আদেশে গরু চরাইতেন। বিরাট, জনক প্রভৃতি রাজন্য শত শত গোপালন করিতেন। পুরাণোক্ত উত্তর গো-গৃহ, দক্ষিণ গো-গৃহ, নৈমিষারণ্য, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি গো-দেবতার পদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল। গোদেবতা না হইলে আর্য্যগণের পিতৃযজ্ঞই সম্পন্ন হইত না। চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইলেই রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহার গরুসকল কুশলে আছে কি না? হিন্দুগণ এখনও শ্রাদ্ধকালে বৃষোৎসর্গকালে গরুকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করেন—

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
বৃণোমি ত্বমহং ভক্ত্যা সমাং রক্ষতু সর্ব্বদা।

আজ এই শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত বৃষ পল্লীগ্রামে—চাষার লাঙ্গলে, আর সহরে—মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লাটানা গাড়ীতে, নিয়োজিত হইতেছে। যে গাভীর প্রতি লক্ষ্মীর আরোপ করিয়া হিন্দুগণ ভক্তিভরে প্রণাম করেন—

যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ যা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥

---

* গো-রক্ষিণী সভায় লেখক-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

সেই গাভীরই বা আজ কি দুর্দ্দশা। বেশী দুগ্ধের লোভে আজ গোয়ালাগণ গাভীর জননেন্দ্রিয়ে বাঁশের চোঙ্গ দিয়া ফুকা দিয়া তাহাকে অসহনীয় কষ্ট দেয় এবং দুধ দেওয়ার কাল শেষ হইলেই তাঁহাকে কসাইয়ের হস্তে বিক্রয় করে। হিন্দু কোন্ প্রাণে ইহা সহ্য করেন, এবং কোন্ প্রাণে যে ইহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে বসিয়া থাকেন, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অতীত। গোঘৃত, গোময়, গোমূত্র খাইয়াই পুরাকালের ব্রাহ্মণ্যতেজ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সামান্য একবিন্দু গোদুগ্ধের এত শক্তি যে রাজা বিশ্বামিত্রের মত পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজাও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন মুনির নিকট পরাজিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং, বলং বলং ব্রহ্ম-বলং।" চার্ব্বাক্ মুনি বলিয়া গিয়াছেন, ঘৃতই আয়ু, ঘৃতই বীর্য্য, ঘৃতই শক্তি, অতএব "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" কিন্তু বৎসরে এইরূপ এককোটী করিয়া গোবংশ ধ্বংস হইলে ঘৃত দুগ্ধ ত দূরের কথা, গোধনের দর্শনলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটিবে কি না সন্দেহ। ভারতে গোবংশ ধ্বংস হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে, প্রধান কয়েকটি এই—(১) অবাধ গোহত্যা (২) গোখাদ্যের অভাব (৩) গোগণের পানীয় জলাভাব (৪) গোষ্ঠ ব গোচারণ ভূমির অভাব (৫) গো-জননোপযোগী বৃষের অভাব (৬) চর্ম্মব্যবসায়ি গণের নিকট এগ্রিমেণ্ট দিয়া দেশীয় কসাই ও মুচিগণ চর্ম্ম বিক্রয় করে বলিয় বিষদ্বারা গো কুলকে বিনাশ করে (৭) গোপালন ও গোচিকিৎসা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের অভাব (৮) গো-চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়ের অভাব (৯) গো-চিকিৎ সকের অভাব (১০) গো-পীড়া সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাব ১১। গর্ভধারণক্ষম গাভী দ্বারা হাল ও গো-শকট পরিচালন ১২। গোয়ালাগণ ফুকা দিয়া দুধ দোহ করিয়া বাছুর বিক্রয় করে ১৩। উপযুক্ত গোশালার অভাব ১৪। ধনী ও শিক্ষি লোকের গোপালনে অনিচ্ছা ১৫। শিশুকালে বৃষবৎসদিগকে বলীবর্দ্দে পরিণ করা ১৬। বাঘে গরু সকলকে হত্যা করা। প্রধানতঃ এই কয়েকটি কারে দেশের গো-কুল নির্ম্মূল হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হইতেছে গো হত্যার আলয়ে (Slaughter house এ) গোহত্যা করায়। এক কলিকাতা মিউ-নিসিপ্যালিটীতে প্রতিদিন ৫৫০টি গরু হত্যা করা হয়। এ দেশের গোরা সৈনিকদের জন্য অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বরফ দেওয়া গোমাংস আনাই-বার জন্য কয়েকজন দেশবৎসল লোক ভারত-সচিবকে একবার অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ইহা পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন যে জাহাজের ভাড়া তাঁহারা নিজের পকেট হইতে দিবেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট

ভারত-সচিব এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, ভারত গবর্ণমেণ্ট জবাব দেন যে এরূপ করিতে গেলে তাঁহাদের বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইবে।

ভারতে হিন্দু মুসলমানে কোনদিন কোনপ্রকার মনোমালিন্য নাই। হিন্দু মুসলমান অনেক শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষে ভাই ভাইয়ের মত এক সঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে। হিন্দুর জঠরে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হইলে তাহার প্রদীপ্ত শিখা মুসলমানের উদর স্পর্শ করে, আবার মুসলমানের গৃহে আগুন লাগিলে সেই আগুনের শিখা হিন্দুর ঘরে আসিয়াও লাগে। হাজার বিবাদ হউক, হিন্দু মুসলমান তবুও দুইটি ভাই। পরস্পরের স্বার্থের সহিত পরস্পরের স্বার্থ বিজড়িত। কেবল হিন্দু প্রাণে আঘাত পায় তাহার মুসলমান ভাইকে গোবধ করিতে দেখিলে। হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত মিলনের সূত্রই হইল গোবধ তুলিয়া দেওয়া। শাস্ত্রকারগণ জানিতেন কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে গোজাতির ধ্বংস হইলে দেশের সমূহ অনিষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিতেন যে গোমাংস কুষ্ঠব্যাধি-উৎপাদক এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে গোমাংসে সত্ত্বগুণের হ্রাস ও ক্রোধাদি তমোগুণের পরিবর্দ্ধন হয়, সেই জন্য তাঁহারা গোমাংসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে অনুশাসন করিয়াছেন। আর্য্য ঋষি মুনিগণের প্রতি সুদৃঢ়-ভক্তি-পরায়ণ হিন্দু এখনও অবনত মস্তকে ঋষি মহর্ষিদের অনুশাসন মানিয়া আসিতেছেন। গো-দেবতার প্রতি লাঞ্ছনা দেখিলে হিন্দুর প্রাণ যতটা কাঁদিয়া উঠে, আর কিছুতে তত হয় না। মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, সংবর্ত্ত প্রভৃতি সংহিতাকারগণ গো, গোদান, গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, হবিঃ প্রভৃতি গব্যদ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর দৈব ও পিতৃযজ্ঞ দধি ঘৃত না হইলে হয় না। আমাদের বাক্যের সৃষ্টিকর্ত্তাই হইলেন গো-দেবতা। গোমাতার "হাম্বা" "হাম্বা" রব হইতে আমরা অম্বা অর্থাৎ "মা" বুলি শিখিয়াছি। গো-লোক সর্ব্বলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বকার ঋষিগণ গোমাতাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক সমাদর করিতেন। ঋষি জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তথাচ গোদান করিতে সম্মত হন নাই।

প্রাচীন কালে গো-রক্ষার কিরূপ সুন্দর ব্যবস্থাই না ছিল! নিজের তুল্য ব্যক্তির প্রতি গোরক্ষার ভার দেওয়ার বিধান ছিল। গোকে দৃঢ় রজ্জুদ্বারা রাত্রিতে বাঁধিবে না, যদি বাঁধিতেই হয় গো-রক্ষক কুঠার হস্তে গোগৃহে দণ্ডায়মান থাকিবে। গোকে যে দণ্ড দ্বারা ফিরাইতে ও চালাইতে হইবে তাহা ভিজা ও পত্রযুক্ত হইবে যেন গো কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত না হয়।

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব)। আকবর গোজাতির উপকারিতা দর্শনে রাজ্য মধ্যে গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা আইন—ই—আকবরী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কিন্তু হায় আজ ভারতের কি দুরবস্থা। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৴১০ পয়সায় দুগ্ধের সের মিলিত, আর এখন ৷৷০ আনা দরেও একসের খাঁটী দুগ্ধ সহরে পাওয়া দুর্লভ। এখন আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড হইতে আমদানী জমাট দুগ্ধ (condensed milk) প্রবীণ ও শিশুদের একমাত্র আহার্য্য হইয়াছে। প্রতি বৎসর কত কোটী টাকার চর্ম্ম ও শুষ্ক মাংস যে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহার কি আর ইয়ত্তা আছে? দেশের ছাত্রগণ—কেরাণী-গিরি করিবে তথাচ কেহ গো-চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবে না! পাশ্চাত্য-শিক্ষার মোহে আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা "গো-চিকিৎসার" নাম শুনিলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করেন, অথচ এই অবলা জাতির সেবায় ও ইহাদের চিকিৎসায় যে কত পুণ্য—কত ধর্ম্ম—কত বিমল আনন্দ, তাহা কেহ একবার ভাবিয়াও দেখেন না।

সুখের বিষয় আজ মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে দেশের নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন রীতি-নীতি-আদর্শের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ আসিয়াছে। আজ যদি তাঁহার প্রভাবে দেশের যুবক মণ্ডলী গো-সেবা, গো-পরিচর্য্যা ও গো-চিকিৎসার দিকে একটু দৃষ্টি করেন, তবে দেশের একটা মস্ত অভাব দূর হয়। সকলজাতিই আজ আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতি কি তাহাদের আরাধ্য দেবতা গোমাতার দুর্দ্দশা ঘুচাইতে যত্নবান হইবে না? আর কি ভারতের গোঠে গোঠে রাখালের বেণু-ধ্বনিতে উর্দ্ধমুখে গাভীগণ ছুটিয়া আসিবে না। শ্মশান ভারত আর কি বৃন্দাবনে পরিণত হইবে না? ভগবান্ জানেন, এ জাতির ভবিষ্যৎ কি রহস্য-জালেই না আবৃত আছে।



হিন্দুর পরিণাম।

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখনই এ জাতির মধ্যে অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিয়াছে, যখনই এ জাতি লাঞ্ছিত বা বিপদস্থ হইয়াছে, তখনই দৃষ্ট হয় এ জাতিরই মধ্য হইতে এক নব শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে; এক মহা মানবের জন্ম ঘটিয়াছে। যেন সমস্ত জাতির আপৎ-কালীন আর্ত্তনাদে ও প্রার্থনায় প্রতিক্রিয়ারূপে মহাশক্তি মানবরূপে অবতীর্ণ এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এক অভিনব লীলা; এক অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বতোমুখী সভ্যতার আগমনে জাতীয় জীবনের গ্লানি দুর্দ্দশা দূরীভূত। আর্য্য হিন্দু তাঁহার আশ্রয়ে নব প্রাণ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্ব মহিমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে ইহাই বার বার প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। বেদ পুরাণ ইতিহাসাদি তাহার বর্ণনায় পূর্ণ। এ জাতির মধ্যে এমনি এক অদ্ভুত অফুরন্ত জীবনী শক্তি নিহিত। বেদানুগ আর্য্যজাতির জীবন-প্রবাহে আবর্জ্জনা জন্মিলেই ভীম স্রোতোবেগ আসিয়া সকল মলিনতা দূর করিয়া যুগে যুগে উপর্য্যুক্ত প্রতিজ্ঞার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিয়া আসিতেছে।

হিন্দুর আত্ম-প্রসারণ ক্ষমতাও অদ্ভুত। কত অনার্য্য জাতিকে আর্য্যত্বে উত্থিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাম, কৃষ্ণ, অগস্ত্য, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, কবির, বৈষ্ণবগণ, শৈবগণ, তান্ত্রিকগণ এ মহা জাতীয় যজ্ঞের প্রধান প্রধান হোতা।

ধর্ম্ম—আত্মা—তার জীবনের চরম আদর্শ। তার শাস্ত্র বলে ত্যাগেন ভুঞ্জিথা আরও বলে অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা—বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। জাগতিক বিষয় তার লক্ষ্য নহে, চরম লক্ষ্য প্রাপ্তির সহায়ক মাত্র। সে জানে আত্মা দেহ ও মনের মধ্য দিয়া কার্য্য করেন, তাই দেহ ও মনের প্রয়োজনীয়তা, তথা জীবনের পূর্ণ-বিকাশের জন্য পার্থিব বস্তুরাজি—দেশ, সমাজ, সম্পদ অবশ্যপ্রয়োজনীয়। তার উপদেশ—অবিদ্যা—লৌকিকজ্ঞান—জড়বিজ্ঞানাদি দ্বারা দেহ সমাজ দেশকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া বিদ্যা—অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্বকে লাভ করিতে হইবে। তার আদর্শ দেহ তাহাই, যদ্দ্বারা মনের পূর্ণ বিকাশ ও পরা বিদ্যা লাভ হয়। আদর্শ মনই তাহাই, যদ্ দ্বারা জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি—আধ্যাত্ম জীবন ঋষিত্ব লাভ হয়, সত্য সাক্ষাৎকার হয়। আত্মাই তাহার চরম লক্ষ্য হওয়াতে আত্মা তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। ক্ষণ-ভঙ্গুর বিষয় রাজ্য সম্পদ যে যে জাতির সভ্যতার মূলে, ঐ সমুদয়ের নাশে তাদের সভ্যতার নাশ—জাতীয় জীবনের মৃত্যু

ঘটিয়াছে। আত্মাবলম্বী হওয়ায় এ জাতি আত্মার ন্যায় সনাতন ও অবিনাশী। আত্মাকে—ধর্ম্মকে ত্যাগ করিলেই ইহার বিশেষত্ব-নাশ ও ইহার জাতীয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জড় ও চৈতন্যের যাহাকেই উপেক্ষা করা যায়, ত্যাগ করা যায়, দুর্য্যোধনের উরুর ন্যায় সেই দিকই দুর্ব্বল থাকে এবং মৃত্যুও সেই পথ দিয়া প্রবেশ করে। পৌরাণিক কালের হিন্দু তাহার সে পূর্ব্ব আদর্শচ্যুত-প্রায় এবং বর্ত্তমানেও তাহাই চলিতেছে এবং অনেকস্থলে জাতীয় জীবনের পুনরুত্থান অর্থে সেই মৃত্যুর সংকীর্ণতার অবলম্বনকেই অনেকে বুঝিতেছেন। যে হিন্দু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এ মহান্ সত্য দর্শন করিয়াছিলেন যত্রজীব স্তত্র শিবঃ ঘটে ঘটে নারায়ণ, এ মহাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহারই বংশধরগণের সংকীর্ণতায় স্বধর্ম্মি-দ্বেষিতায় জাতি আজ মহাপাপপঙ্কে পতিত, মৃত্যুর দিকে দ্রুতধাবিত। আজ হিন্দু ব্রহ্মের চরম বিকাশ বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানব নরনারায়ণের স্পর্শে আপনাকে কলুষিত মনে করে, এক ব্রহ্মের বিকাশ ঠিক তদনুরূপ আর একজনের সংস্পর্শে অপবিত্র হয়, এক মানুষ দ্বারা আর একজন মানুষের মস্তকে পদার্পণই ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত তাহা প্রমাণার্থ ও অপর ভ্রাতার মনুষ্যত্ব হরণের সুবিধার্থ সে ধর্ম্মের নামে কত শ্লোক রচনা ও যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজ জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিল বলিয়া মনে করে। সে কিছুদিনের জন্য কোন লোকবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারে কিন্তু সেই বিশ্বতশ্চক্ষু বিশ্বাত্মার রুদ্রচক্ষুর নিঃসৃত ক্রোধাগ্নি তাঁহার বিরুদ্ধাচারী ও তাঁহার প্রিয়তম সৃষ্টি মানবের সর্ব্বনাশকারীকে ধ্বংস করিতে রত হয়। হিন্দু আজ তার আপন ভ্রাতাকে দূর করিয়াছে। তাই তাহারা দলে দলে পরগৃহে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই স্বধর্ম্মিদ্বেষিতা এবং নিজ ভ্রাতৃগণকে জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম হইতে বঞ্চনারূপ মহাপাতক তাহাকে আজ দুর্ব্বল, ধ্বস্ত ও ক্ষয়শীল মৃতদেহবৎ করিয়াছে। অপর পক্ষে অন্য সমাজ বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া স্বীয় দেহের পুষ্টিসাধনে রত। মুষ্টিমেয় অভিজাতবর্গ আভিজাত্য-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের উপদেশ ও আদর্শ পদদলিত করিয়া অত্যাচার ও উদাসীনতা দ্বারা যে সর্ব্বনাশ আনিয়াছে, তাহা তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে। ভাই সব, শুনিতেছ নাকি ঐ লাঞ্ছিত পদদলিত উপেক্ষিত তথাকথিত হীনজাতীয় হিন্দুগণের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ ও অভিশাপে ভারতগগন পরিপূরিত। রুষ্ট কেন উহাদের মনুষ্যত্বের দাবীতে বা অভিশাপে। আবার দলবদ্ধ হইয়া উহাদিগকে অধিকতর লাঞ্ছনার ব্যবস্থাই কি হিন্দুজাতির নব জাগরণ বা বিকারে আত্মহনন-চেষ্টা?

ধৈর্য্যধারণ করে ঐ শুন তাহাদের আর্ত্তনাদ "আমাদের স্পর্শে হে অগ্রজ অভিজাত-বর্গ, তোমরা অপবিত্র হও, দেবতার জাতি যায়, জাতিভ্রষ্ট বিগ্রহকে গোময় গোমূত্র প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া জাতিতে তুলিয়া লও। মানুষের ছায়াস্পর্শে দেবতার জাতি যায়, আবার মানুষই এবম্প্রকারে তাহাকে পবিত্র করে। আমাদের ছায়া বা উপস্থিতি বিড়াল কুক্কুরাদির অপেক্ষা ঘৃণ্য। পশুদ্বারা যে আহার্য্য ও পানীয় অপবিত্র না হয়, মানুষের দ্বারা তাহা হয়। আবার তোমরা বল সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—মানুষ নারায়ণের বিগ্রহ। কি অদ্ভুত আত্ম-প্রবঞ্চনা। শাস্ত্র অধ্যয়ন বা ভগবানের নাম ওঁ উচ্চারণে আমরা বঞ্চিত। নিষেধ অমান্যে ভীষণ শাস্তি, কর্ণে শিশা গলাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা, জিহ্বাচ্ছেদনের ব্যবস্থা। ভগবান জ্ঞান কর্ম্মাদির ক্ষমতা দিলেও মানুষ সে অধিকার হরণ করে এবং তাহা ধর্ম্মের নামেই, কি ভীষণ! হায় মানুষ মানুষকে কি না করে। হিন্দুর দেবতা ব্রাহ্মণের সেবা করে, এ সমাজের অধীন থেকে এই তার পুরস্কার। ধোবা নাপিত বেহারা হইতে বঞ্চিত, কুষ্ঠগ্রস্ত রোগী অপেক্ষায় স্পর্শ-দূষণীয়। মৎস্য হনন বা চর্ম্ম প্রস্তুত করা পুরুষানুক্রমিক অবলম্বন; যেন ইহাতেই জীবনের চরম সার্থকতা। বৃত্ত্যন্তর-গ্রহণ ভীষণ পাপ বলিয়া কথিত। চর্ম্মকার বা মৎস্য-জীবীর পুত্রগণের অন্য সকল পথ বন্ধ। এ সমাজে জীবনের অভিব্যক্তির উন্নতির সকল বাধাই সৃষ্টি করা হইয়াছে, মনুষ্যত্ব-হরণের সকল নিয়মই বর্ত্তমান, যেন পশুবৎ জীবন অতি বাহন ও পদলেহন; না না, তাহাও ত সম্ভব নহে—দূর হইতে দণ্ডবৎ পতিত হওয়াই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহাই ধর্ম্ম-পরায়ণতার নামে অভিহিত। যাহাতে মানুষের জীবনের অভিব্যক্তি ঘটে, সকল অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মেষ ঘটে, তাহার চেষ্টা রৌরব নরকের পথ বলিয়া কীর্ত্তিত। আর মরণ অপেক্ষাও ভীষণ চতুর্দ্দিকের ঘৃণাস্তূপ। জন্ম হইতে আমরণ শুনিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, আমরা ঘৃণ্য, নীচ, ছোট। আমাদের জীবন-পথ চতুর্দ্দিক হইতে কণ্টকিত, যেন আমাদের জীবনই মৃত্যু, মৃত্যুই বিশ্রাম। আরও ভীষণ, এ অত্যাচার ধর্ম্মের নামে সাধিত হয়, ইহার বিরুদ্ধে দীর্ঘ নিঃশ্বাসটী ফেলিবার উপায় নাই; তাহা হইলে জীবিত অবস্থায় ভীষণ রাজদণ্ডের ব্যবস্থা, কর্ণপটহ-বিদারণ, কটিদেশ দাহন, অঙ্গচ্ছেদ, মরণান্তে নাকি আশু নরক। †

† এই সকল স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অনুশাসন উদ্ধৃত করিয়া লেখকের আত্মপক্ষ সমর্থন করা কর্ত্তব্য ছিল। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক স্মরণ রাখিবেন প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকই দায়ী, সম্পাদক দায়ী নহেন।

অবশ্য ইহ-লৌকিক শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপক্ষালন অন্যধর্ম্মীর রাজত্বে সুবিধাজনক নহে। ধর্ম্ম কি এতই ভীষণ ও মনুষ্যবক্ষঃ-শোণিত-শোষণকারী। ধর্ম্ম যিনি, তিনি বোধ হয় এ অত্যাচারে কান্দেন। এই ঘৃণ্য হীন ও দূর হ"—কথা শুনিতে শুনিতে আমরা প্রকৃতই হীন হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের এই পশুবৎ জীবনের জন্য দায়ী কারা ? ভগবান বোধ হয় তাদের এ পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। সকলের ঘৃণায় পদাঘাতে আমরা মত্তকল্প ও বাত্যাতাড়িত শুষ্ক পত্রবৎ। জগৎ যেন আমাদিগকে পেষণ করিতে প্রস্তুত, আমরা যেন এর জন্যই সৃষ্ট। নানা অত্যাচারের আকার ধরিয়া মৃত্যু যেন চারিদিক হইতে গ্রাস করিতে আসিতেছে এবং ইহা মানুষকৃত। হায়! এ মানুষের করাল কবল হইতে আমাদিগকে কেহ বাঁচাইবে নাকি ? একদিন তোমাদেরই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবির, চৈতন্য তাঁদের সুশীতলক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আমাদের ক্ষতে স্নেহ প্রেমৌষধ দিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন, তোমরা তাঁহাদের সে আদর্শকে পদদলিত করে তাঁহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করে সয়তানের অত্যাচারকে পূজা করিতেছ, আর মনে ভাবছ সে সব মহাপুরুষেরই পূজা হচ্ছে, বিকারে সব ভুল।

আর একদিকে দেখ যেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছি অমনি আমাদের চারিদিক নব উষার আশার আলোকে উদ্ভাসিত, সব যেন পরিবর্ত্তিত, যেন নূতন জগতে আগত। অমনিই বুঝিলাম আমিও মানুষ, সমাজে দেশে জাতীয় জীবনে আমার জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমিও সব মানুষের সমান উন্নতির অধিকারী। জীবনের স্বাদ, স্বাধীনতার আনন্দ, জ্ঞান কর্ম্ম প্রেমের গৌরবের আমিও অধিকারী। যিনি কাল আমাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে-ছিলেন তিনি আজ আমার কর-মর্দ্দনে কৃতার্থম্মন্য! অনন্ত-প্রবাহী উন্নতির পথ, জীবনের সার্থকতার পথ, আমার সম্মুখে উন্মুক্ত। চারিদিকে ভ্রাতৃপ্রেম-সিক্ত হাসি মুখ। অহো বুঝি দেবাদিদেবও হাসিলেন। সে আমি আর নাই, আমি পবিত্র হইয়াছি, আমি মনুষ্য-শ্রেণীতে সহসা উন্নীত, তাই ধোবা নাপিত বেহারা সেলাম জ্ঞাপন করিয়া আমার সেবায় ব্যস্ত। হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকা কি পাপ, হিন্দুধর্ম্ম কি অস্পৃশ্যই করিতে পারে, সে কি মানুষকে মানুষ করিতে পারেনা ? এজন্মেত নহে, পর জন্মে কি হবে তার ঠিকানা কি ? এবম্বিধ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দ্বারা যে একজন সধর্ম্মার হ্রাস হইল তাহা নহে, জাতীয় জীবন-যুদ্ধে একজন স্বগৃহের বিদ্রোহী প্রতিশোধ-পরায়ণ, প্রতিপক্ষ বর্দ্ধিত।

কিন্তু ভাই সকল, যত পার কান্দ, তোমার ক্রন্দনে গগন কম্পিত হোক, সে কম্প দয়াময় পরম পিতার সিংহাসন কম্পিত করুক। তাঁহার সিংহাসন হইতে করুণা ধারা বর্ষিত হইবে। এতদিন কান্দ নাই, রোগে ব্যথা বোধ ছিল না, তাই প্রতিকার চাও নাই, পাও ও নাই। আজ ব্যথা বোধ জেগেছে, তাই কান্দিতেছ, তাই আশা হয় এবার চিকিৎসা হইবে। এতদিন এতে সন্তুষ্ট ছিলে, তাই সে কল্পতরুও রাজী ছিলেন। উঠুক তোমাদের ক্রন্দনের ভীমধ্বনি; তার প্রতি-ক্রিয়ায় নবশক্তি সর্ব্বশক্তিমানের নিকট হইতে নামিয়া আসিবে। ভাই সব, তোমরাও যে সেই পরম পিতার পুত্র—তোমরাও যে অমৃতের সন্তান, তোমরাও অনন্তের অধিকারী। এতদিন তোমরা পরের কথায় Self hypnotised আত্মসম্মোহিত ছিলে। নচেৎ এজগতে কেহ নাই যে তোমাদিগকে পিতৃধনের অধিকার বিচ্যুত করে। তোমরা পিতার দিকে নজর কর, তাঁর সর্ব্বশক্তিময় নামে ভীমরবে হুঙ্কার দিয়ে এ সম্মোহন দূর কর। রাম নামে কি ভূত তিষ্ঠিতে পারে? দেখিবে তোমরাও অচিরে জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমে সমুজ্জ্বলিত হইয়া জগৎকে স্বীয় প্রভায় উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইবে।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে আমাদের এই আত্মঘাতক স্বধর্ম্মদ্বেষিতারূপ মহা-পাতক হইতে উদ্ধার করিতেই যেন করুণাময় পরম পিতা ভ্রাতৃ প্রেমের জ্বলন্ত আদর্শ practical Vedantist—বেদান্ত নিহিত সত্যবার্ত্তাকে কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত-কারী ইস্‌লামীয় গণকে এদেশে বড় সময়েই প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজ ভারতের দশ কোটী ইস্‌লামধর্ম্মী আমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। স্বধর্ম্মি-দ্বেষিতার ফলে যে সব ভারতবাসী সাম্যবাদী ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাহা না করিতেন তবে ধর্ম্মের নামে মনুষ্যত্ব-শোষণকারী অধর্ম্ম পেষণে আজ কোটী কোটী মানব ধরা-পৃষ্ঠ হইতে অপসারিত হইত বা মরণাধিক শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও হেয় অবস্থায় পেষিত হইতে হইতে মরণের মুখে চালিত হইত। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে ৪০ কোটী হিন্দু ছিল, এই কয়েকশত বর্ষে তার দশ কোটী নাই, এখনও খরবেগে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে, অন্য পক্ষে অন্যধর্ম্মীর সংখ্যা তুলনায় দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। এ অবস্থায় থাকিলে বুঝি বা কয়েক সহস্র বৎসর মধ্যে হিন্দু তার স্বকার্য্যোপযোগী লোকে গমন করিবে। ধরাধামে থাকিবার কাজ যখন শেষ করাই হইয়াছে তখন ধরিত্রীদেবী আর বৃথা বহন করিবেন কেন? কূপ-মণ্ডুকনীতি অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল অনিবার্য্য ধ্বংস। ক্ষুদ্র হীন স্বার্থ ছাড়িয়া একটু দূরদর্শী হইলে প্রকৃত স্বার্থ চিনিতে পারিলে

ফল অন্যরূপ। জাতির অধিকাংশ যদি জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম বঞ্চনার দ্বারা দুর্ব্বলীকৃত হয়, তবে সে জাতি জ্ঞান-কর্ম্ম-ধর্ম্ম-চ্যুতিতে দুর্ব্বল ও হীন। জীবন যুদ্ধে সে জাতির পরাজয় নিশ্চিত। যদি আমরা বাঁচিতে চাহি, মানুষের মত বাঁচিতে চাহি, তবে এখন হইতে আমাদের তমোভাবজ জড়তা—আত্মক্ষয়কারী বিদ্বেষ বা উদাসীনতা পরিহার করিয়া জীবনের পথে—আত্ম-প্রসারণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নান্যঃ পন্থা অয়নায়—নতুবা মরণং ধ্রুবং। মধ্যযুগে, অতীতপ্রায় তামসিক যুগে, আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক পাপরাশি সঞ্চিত হইয়াছে যাহার ফলে আমরা আজ দেশে বিদেশে অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত, এত দুর্বিল, এত হীন—মানুষকে ঘৃণা করে আমরা ঘৃণ্য হ'য়ে পড়েছি, প্রেমময় অবতার পুরুষগণের অভিসম্পাত আমাদের উপর বর্ষিত—অত্যাচারিত মানবগণের উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস আমাদিগের জীবন-বায়ু কলুষিত করিতেছে। বর্ত্তমানের কর্ম্ম আমাদিগকে ও আমাদিগের বংশধরদিগকে ভোগ করিতে হইবে। আমাদের কৃত পাপ—লৌহ-জাত মল যেমন লৌহকে ক্ষয় করে, আমাদিগকে ও আমাদের আত্মজগণকে ক্ষয় করিবে।

(ক্রমশঃ)

নীলাম্বরের কথা।

(লেখক শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম, বি, এ, এ।)

We are in the calm and proud
possession of eternal things.
Russell.

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে তুমি প্রতিদিন আকাশে কি দেখ? সেই একই তারা, একই গ্রহ, উপগ্রহ, প্রতিদিন উহাদের কি দেখ? আমি সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি আপনারা প্রতিদিন তাস, পাসা, টেনিস, ফুটবলের কি খেলেন? সেই একই তাস, পাশা, একই টেনিস্, ফুটবল প্রতিদিন উহার কি খেলেন? হার জিত যেমন খেলার বিশেষত্ব, জ্যোতিষ্কের অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ তাহাদের জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধি, তাহাদের গতি, নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ও তিরোভাব তেমনি প্রতিদিন তারা দেখার বিশেষত্ব। তাহা ব্যতীত

তারা দেখায় এমন একটী ভগবন্মুখ বিমল আনন্দ উপভোগ করা যায় যাহাতে আমরাও মনে করিতে পারি যে We are in the calm and proud possession of eternal things.

আজকাল বহুরূপ তারা পর্য্যবেক্ষণ এক শ্রেণীর জ্যোতিষি-সঙ্ঘের নিয়মিত কার্য্য, আমেরিকার হারভার্ড মানমন্দিরস্থ বহুরূপ তারা পর্য্যবেক্ষক সমিতি— American Association of Variable star observers— ইহাদের মধ্যে অগ্রণী, তিন শত ছেয়াত্তরটী বহুরূপ তারা ঐ সমিতির পর্য্যবেক্ষণে রহিয়াছে। ঐ সকল বহুরূপ তারার মধ্যে বকরাশির ss তারা, (ss. cygni.) ব্রহ্ম রাশির ss. তারা, (ss Aurigae.) মিথুন রাশির U তারা, (U. Geminorum) উত্তর কিরীট রাশির R তারা, (R.coronae Borealis.) বৃষ রাশির SU তারা (SU. Tauri) ধনু রাশির RY. তারা (RY. sagittarii) গরুড় রাশির দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ R তারা (R. Scuti) হ্রদ সর্প-রাশির V তারা, (V. Hydrae.) এবং বক রাশির RS. তারা (RS. Cygni.) র হ্রাস বৃদ্ধি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ নহে। ইহারা যে কখন হ্রস্বতম জ্যোতিঃ হইতে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হয় অথবা স্থূলতম জ্যোতিঃ হইতে হ্রস্ব তম জ্যোতিতে পরিণত হয় অথবা কখন কিরূপ উজ্জ্বল থাকে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই তারা গুলিকে বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশে পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত আছেন, যখন যে দেশে রাত্রি হয় তখন সেই দেশের পর্য্যবেক্ষকগণ উহাদিগকে দেখিয়া তাহার বিবরণ হারভার্ড মানমন্দিরে পাঠাইয়া দেন। এই কয়েকটী বহুরূপ তারা ব্যতীত আরও কয়েকটী বহুরূপ তারা আছে, তাহারা যখন হ্রস্বতম জ্যোতিতে পরিণত হয় তখন অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীণ ভিন্ন দেখিবার অন্য উপায় নাই, কিন্তু যখন তাহারা স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হয় তখন সকলেই সহজে খালিচক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে পান। এই শ্রেণীর তারার মধ্যে মার তারা (Mira or O. ceti.) সর্ব্ব জন বিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ, আর হ্রদ সর্প রাশির R তারা (R. Hydrae.) বক রাশির চাই তারা (Chi. cygni.) এবং কাল পুরুষ রাশির U তারা (U. Orionis) ও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আরও কয়েকটী বহুরূপ তারা আছে যাহাদের হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশী নহে কিন্তু তাহা দিগকে সর্ব্বাবস্থাতেই খালিচক্ষে বেশ সহজে দেখিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে দানব চক্ষু বা পর্শু রাশির বিটাতারা (Beta Persei) কে সকলেই চেনেন। এই বহুরূপ তারা কয়টীর জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধির বিবরণ পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত হইতেছে:—

বক রাশির SS তারা ব্রহ্ম রাশির SS তারা এবং মিথুন রাশির U তারা এর সময়ে সময়ে একই দিনের মধ্যে হ্রস্বতম জ্যোতিঃ হইতে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত ; হয় ঐ সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উহাদের পর্য্যবেক্ষণআবশ্যক হয়। উহারা অধিকাংশ সময় অদৃশ্য থাকে এবং কয়েক দিন মাত্র স্থূলতম জ্যোতিতে দেখা দেয়। ১৯২০ খৃঃ অঃ ১০ ই নভেম্বর বক রাশির SS তারার জ্যোতিঃ পর্যবেক্ষণের বিবরণঃ—

তারিখ	সময় *	উজ্জ্বলতা	পর্য্যবেক্ষক	স্থান।
১০-১১-২০	০˙৩	১২˙০	ল্যাকিনি	ইটালি।
ঐ	০˙৪	১১˙৯	গিনোরি	ঐ
ঐ	০˙৫	১১˙৫	পেলটির	আমেরিকা।
১১-১১-২০	০˙২	১১˙৩	চন্দ্র	ভারতবর্ষ।
ঐ	০˙৪	১১˙২	গিনোরি	ইটালি।
ঐ	০˙৬	১১˙১	কুমারী ইয়াং	আমেরিকা।
ঐ	০˙৬	১১˙০	অলকট	ঐ
১২ ১১-২০	০˙২	৯˙২	জ্যাঙ্কিউস্ক	সুইজরল্যাণ্ড।
ঐ	০˙৩	৮˙৯	চন্দ্র	ভারতবর্ষ।
ঐ	০˙৭	৮˙৬	ইয়ালডেন	আমেরিকা।
১৩-১১-২০	০˙২	৮˙৫	চন্দ্র	ভারতবর্ষ।
ঐ	০˙৪	৮˙২	জ্যাঙ্কিউস্ক	সুইজরল্যাণ্ড।

আবার বকরাশির S S তারাটী গত নভেম্বর মাসে কেমন ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়াছিল দেখুন :—

তারিখ		সময় † ঘঃ—মিঃ	উজ্জ্বলতা।	
১৪-১১-২২	রাত্রি	৮-৫৪	১১˙৭৫	অন্যান্য স্থানের পর্য্য-
১৬-১১-২২		১১-১৮	১১˙৭৫	বেক্ষণের ফল
১৭-১১-২২		৯-২৪	১১˙৫৯	এখনও আমাদের
২৬-১১-২২		৮-৫৪	১০˙৭২	হস্তগত হয় নাই।

* গ্রীণউইচের অহোরাত্রির দশমাংশ। দিবা দ্বিপ্রহর হইতে পরদিন দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এক অহোরাত্র।

† যশোহরের স্থানীয় সময়।

২৭-১১-২২	”	৯-৪৮	১০'৪৩
২৮-১১-২২	”	৮-৪২	৯'৬০
২৯-১১-২২	”	৮ ৩৬	৯'৪১
৩০-১১-২২	”	৮-৩০	৯'১৯
১-১২-২২	”	৭-৪৮	৮'৮০
২-১২-২২	”	৮-০০	৮'৭০
৩-১২-২২	”	৮-০০	৮'৬৫ উজ্জ্বলতম

(ক্রমশঃ)

বিশ্বধর্ম্ম।

(লেখক—সম্পাদক।)

(১) সকল ধর্ম্মের মূলে যে ধর্ম্ম, উহাই বিশ্ব ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, জোরেস্তার বা পারশিক ধর্ম্ম, সিণ্টোধর্ম্ম, কনফিউসিয়াস ধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, এবং অন্যান্য বিবিধ ধর্ম্মের মূল যে ধর্ম্ম উহাই বিশ্ব-ধর্ম্ম। দেশ ভেদে, কাল ভেদে, পাত্র ভেদে, এই মূল ধর্ম্ম বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সকল ধর্ম্মের মূলই—এই বিশ্বধর্ম্ম-তত্ত্ব—পাওয়া যায়। কখন কখন ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তি-সমষ্টি-বিশেষের কৃত কার্য্য কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় এত বিকৃত ভাব ধারণ করে, যে উহার মধ্যে মূলতত্ত্ব নিরূপণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও, মূলতত্ত্বটি কি তাহা নির্দ্ধারণ করা একেবারে অসম্ভব নহে।

(২) আমরা সমস্ত বিশ্বের ব্যাপার সম্বন্ধে যতই জানি না কেন, আমাদের জ্ঞানের প্রসার যতই হউক না কেন, চিরকালই উহার একটা সীমা থাকিয়া যাইবে। এই বিশ্বের স্বতন্ত্র কোন নিয়ন্তা আছেন, না প্রকৃতি দেবী স্বয়ম্ভুবা, আত্মনিহিত শক্তি দ্বারাই আপনাকেই এই বিচিত্র বিশ্বে পরিণত করিয়াছেন, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, এবং প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় মত সমর্থন জন্য প্রস্তুত আছেন। সকলেই স্বীয় মতকে অভ্রান্ত এবং অপর মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র। এইরূপ তর্ক বিতর্কের দ্বারা কোন বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না।

(৩) যখনই কোন ধর্ম্মের কথা বলা হয়, তখনই মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয় স্বতঃই মনে উদিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তি প্রবলভাবে থাকায় তাহার গন্তব্য পন্থা বিভিন্ন হইয়া পড়ে, এই জন্য তাহার জন্য বিধি নিয়মের প্রয়োজন হয়। মানবেতর প্রাণীর পক্ষে ইহার প্রয়োজন হয় না। তাহারা বংশানুক্রমিক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং মানব সমাজের অধীনে আসিয়া তাহার দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও, তাহাদের প্রকৃতিজাত বৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত হয়। ব্যাঘ্রের পক্ষে মাংস খাওয়া উচিত কিনা, এ প্রশ্ন কখনও মনে উঠে না। পালিত কুক্কুর কুক্কুরীকে নিরামিষ খাওয়াইয়া এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিকেও বহু পুরুষ ধরিয়া নিরামিষ খাওয়াইতে থাকিলে, তদ্বংশীয়দিগের মাংস খাইবার প্রবৃত্তি একেবারে নষ্ট করা যায় কিনা ইহা এ পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এটা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মানুষও অভ্যাসের দাস। মানুষ অভ্যাস বশতঃ নিরামিষ ভোজন করিয়াও হিংসার অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, কাশী প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা নিরামিষ-ভোজী, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় নরহত্যা করিয়া বসেন।

(৪) জীব মাত্রেরই এমন কি উদ্ভিদাদিরও আহারের প্রয়োজন। কিছু-না-কিছু না খাইলে শরীর রাখা যায় না। অনেকে দীর্ঘ কাল উপবাসী থাকিয়াও, বা স্বল্প আহার করিয়াও জীবিত থাকিতে পারেন। কিন্তু একেবারে কিছু না খাইয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না।

(৫) আহারের বিষয় চিন্তা করিলে প্রথম সিদ্ধান্ত এই হয় যে সকলেরই আহার করিতে হইবে। শিশু দুগ্ধ পান করে, ক্রমে কঠিন দ্রব্য খাইতে শিখে। কেহ নিরামিষ কেহ আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্য ভোজন করে। যাহাদিগকে বাল্য কাল হইতে আমিষ খাইতে দেওয়া না হয়, এবং আমিষ ভোজন অন্যায় বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহারা সহজে আমিষ ভক্ষণ করেন না। আমিষ ভক্ষণ অন্যায় এই বিশ্বাস চলিয়া গেলেও অনেকে অভ্যাস বশতঃ আমিষ ভক্ষণে সম্মত হন না। অপর দিকে আমিষাহারী আমিষ-ভক্ষণ অন্যায় এইরূপ বিশ্বাসে উপনীত হইলেও, অভ্যাস বশতঃ সহজে আমিষ ত্যাগ করিতে পারেন না। সহসা ত্যাগ করিলেও অনেক সময় সুফল ফলেনা। সুতরাং বিশ্বাস ও অভ্যাস এই দুইজনই মানুষের হর্ত্তা কর্ত্তা। বিশ্বাস ও অভ্যাস-বিরুদ্ধ পথগামী হইলে, মানবের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়।

(৬) পশু পক্ষীর মধ্যে এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় না। ব্যাঘ্র আমিষ-ভোজী। মাতৃ-স্তন্য পান করিতে করিতেই সে পিতা মাতার শিকারের মাংসের আস্বাদ পায় এবং মাংসাশী হইয়া উঠে। মাংস খাওয়া উচিত কি অনুচিত এ ভাবনা তাহার কখনও ভাবিতে হয় না। এইরূপ ভাবিবার সম্পদ্ হইতে সে বঞ্চিত। গোমেষাদিরও মাংস খাওয়ায় দোষ আছে কি না এ চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না।

(৭) মানুষের বেলাতেই এই চিন্তা উঠে। চিন্তা উঠিলেই নানা মুনি নানা সিদ্ধান্ত করেন। যাহারা মাংস খাওয়ার বিধি দেন, তাহারাও অনেকে অনেক মাংস বর্জ্জন করিতে বলেন। নানা কারণে একদেশে যাহা বর্জ্জিত, অপর দেশে তাহা বর্জ্জিত নহে। পৃথিবীর সকল দেশের সভ্য অসভ্য জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে মানুষ খায় না এমন মাংস প্রায় দেখা যায় না। [illegible] একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একবার নেপালের সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ [illegible] জঙ্গ বাহাদুর ভারতবর্ষে আসিলে, কেহ তাহাকে প্রশ্ন করে যে নেপা[illegible] মাংস প্রচলিত, তাহার উত্তরে তিনি বলেন যে কি কি মাংস খাওয়া হয়, তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া কি কি মাংস খাওয়া হয় না তাহাই জিজ্ঞাসা করুন। পরে ঐরূপ প্রশ্ন হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন যে যাহারা উড়ে তাহাদের মধ্যে খাওয়া হয় না কেবল ঘুড়ি, আর চতুষ্পদের মধ্যে খাওয়া হয় না খাটিয়া। অর্থাৎ কোন মাংসই বাদ দেওয়া হয় না। জঙ্গ বাহাদুরের কথাটা একটু অতিরঞ্জিত, কেন না নেপালেও অনেক মাংস বর্জ্জিত আছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুর, সর্প, কাক, প্রভৃতি নেপালে কেহই খায় না। হীন-জাতীয় ব্যক্তিরা মহিষ ভক্ষণ করে, কিন্তু উচ্চ বর্ণের লোকেরা মহিষ খায় না। নেপাল হিন্দুর রাজ্য, সেখানে গোবধ হয় না। জঙ্গ বাহাদুরের ও কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে ভারতবর্ষে যেরূপ যেরূপ খুটি নাটি আছে, নেপালে তাহা নাই।

(৮) যাহা হউক এখন দেখা যাউক যে, সকল মানুষের পক্ষে পালনীয় আমিষ নিরামিষ সম্বন্ধে এরূপ কোন বিশ্ব-নিয়ম আছে কি না? কেহ বলেন যে আমিষ মানুষের পক্ষে আহার্য্য হওয়া উচিত নহে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম। আমিষ আহারে হিংসার প্রয়োজন। আর মানুষের দন্ত হইতেই দেখা যায় যে সে ফলাহারী। যে দাঁতকে কুকুর দাঁত বলা যায় সে মাংস ছিঁড়িবার জন্য। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে বানরের সহিত মানুষের অনেক মিল আছে, বানর নিরামিষ-ভোজী। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মাংসের দিকে নয়। বৃক্ষে সুপক্ক

ফল দেখিলে তাহার দিকে যেমন প্রবৃত্তি আসে, একটি অজা কি মেষ দেখিলেই খাইবার সেরূপ প্রবৃত্তি হয় না। মাংসাহারে শরীরে বহুবিধ রোগ উপস্থিত হয়। মাংস খাইতে গেলে তাহার দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে তাহাকে অগ্নিতে পাক করা হয়। মসলাদি দ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে হয়। মানুষের কোমল-বৃত্তিগুলি নষ্ট করিতে হয়। এইরূপ বহুবিধ যুক্তির দ্বারা নিরামিষ-ভোজনের পক্ষ সমর্থিত হয়।

৯। আমিষপক্ষ হইতে বলা হয় যে অহিংসা কেবল মুখের কথা। ফল মূল আদি আহার করিতে গেলেও হিংসা করিতে হয়। উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। তাহাদেরও সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে। প্রতি নিমেষে আমরা নিঃশ্বাসের সহিত সহস্র সহস্র জীবহিংসা করিতেছি। মানুষের যদি নিরামিষই আহার হইবে, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত শীতপ্রধান দেশে উদ্ভিদ্ জন্মে না, তথাকার অধিবাসীরা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে। সর্ব্বদেশে সকলকালেই মানুষ মাংস খাইয়া আসিতেছে। মাংস যদি মানুষের খাদ্য না হইত, তাহা হইলে এইরূপ সকল দেশেই মাংসের ব্যবহার কিরূপে চলিল। যদি বল মানুষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মাংস খাওয়া শিখিয়াছে। তাহাও ঠিক নহে, কারণ অসভ্য বর্ব্বরদিগের মধ্যেও মাংসের অধিকতর প্রচলন দেখা যায় এবং তাহারা সভ্য সমাজের বর্জ্জিত মাংসও ভক্ষণ করে। বরং সভ্য সমাজেই মাংসের প্রচলন কম—মানুষের কোমল বৃত্তি আছে বটে, কিন্তু সে কোমল বৃত্তিগুলির আত্যন্তিক প্রবলতা হইলে মানুষের আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকে না। অভ্যাসহেতুই মাংস পাক করিতে হয়, বর্ব্বর মানব আমমাংসই ভক্ষণ করে, আর বৃক্ষের সুপক্ক ফল দেখিলে যেরূপ লোভ হয়, নরমাংস-ভোজী বর্ব্বরদিগেরও সুকুমার শিশু দেখিলে খাইবার লোভ হয়। সভ্য-সমাজে অনেকেরও অজ-শিশু দেখিলে রসনা রসাক্ত হয়। সুতরাং তাহারা বলেন যে আমিষ যে মানুষের খাদ্য নহে ইহা কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না।

১০। এইরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য কোন বিশ্ব-নিয়ম কি অসম্ভব ? এ বিষয় আলোচনা করিতে গেলে সত্যযুগ সম্মুখে, কি পশ্চাতে, তাহারই আলোচনা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

১১। প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই বলেন যে সত্যযুগ পশ্চাতে। সত্যযুগেই মানব সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ ছিল, ক্রমে ক্রমে যে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান এই বিশ্ব-সংসার সুসজ্জিত ক'রে, মানব-দম্পতী সৃষ্টি করেন। তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ

ক্রমে হীনতা-প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান দশায় উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে একটি নর প্রথম সৃষ্ট হয়, এবং তাহার অঙ্গ হইতে নারী সৃষ্ট হয়, কিম্বা যিনি প্রথম সৃষ্ট হন, তিনি দ্বিখণ্ডিত হইয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ হয়েন, অপরার্দ্ধে স্ত্রী হয়েন। ফল কথা, সমগ্র মানবই এক বংশ সমদ্ভূত, এবং আদিম মানবেরাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন—উত্তর পুরুষ ক্রমে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

১২। এইরূপ মত কতদূর অভ্রান্ত তাহা সকলে বিবেচনা করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন; সত্যের অনুরোধেও প্রস্তুত নহেন। মনুষ্যমাত্রেই ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ রহিয়াছে—মানব-সমাজের এই যে চিরন্তন বিশ্বাস তাহা ভ্রান্ত বলিতে উৎকণ্ঠা না হইয়া পারে না। কিন্তু ঐ বিশ্বাস সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত কি না তাহা আলোচনা করিলে ক্ষতির কারণ বুঝিতে পারি না। স্বয়ং ঈশ্বর আছেন কি না তাহাও যখন পূর্ব্ব মহাত্মারা আলোচনার অযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন নাই, তখন মানব-বংশ একই দম্পতীর বংশসম্ভূত কি না এ আলোচনায় দোষ কি হইতে পারে?

১৩। পৃথিবী ব্যতীত আর কোন গ্রহ উপগ্রহে বা তারায় মানুষ যদি থাকে তাহা আমরা জানি না। থাকিলেও আমাদের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে মঙ্গল গ্রহে কোন জীব থাকিলেও থাকিতে পারে। মানুষ দূরের কথা, কোন জীব আছে কি না তাহাও ঠিক হয় নাই।

১৪। মনে কর ভগবান মানবের আদি পিতা ও আদি মাতাকে দুইটি সদ্যোজাত শিশুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ করাইলেন। মাতৃস্তন্যের অভাব—কি খাইবে? হাটিতে পারে না, কথা বলিতে পারে না। এই মাতৃ-পিতৃ-হীন শিশুদ্বয়কে কে লালন পালন করিয়া বর্দ্ধিত করিবে? এইরূপ শিশুদ্বয় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে তাহাদের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং ভগবান মানুষের রূপ ধরিয়া তাহাদের শিশু সন্তানের ন্যায় পালন না করিলে এবং তাহাদের শিক্ষাবিধান না করিলে উপায়ান্তর নাই। বহুযুগ ধরিয়া অশীতি লক্ষ বা ততোধিক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে পর পর জ্ঞানলাভ করা এক কথা—আর হঠাৎ মানবের আবির্ভাব আর এক কথা।

১৫। আদিম পিতা মাতাকে শিশুদ্বয়রূপে অবতীর্ণ না করাইয়া যদি পূর্ণ-বয়স্ক করিয়া অবতীর্ণ করান হয়, তাহা হইলেও তাহার পূর্ব্ববৎ সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

১৬। কেবল কল্পনার দিকে না গিয়া যদি মানবের পূর্ব্বজন্মের ইতিবৃত্ত অনু-সন্ধান করা যায়, তাহা হইলে আমাদের অনেক উপকার হয়। সত্য আবিষ্কার করিতে গেলে কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

(ক্রমশঃ)

আত্মা।

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান সরস্বতী তত্ত্বনিধি কাব্যভূষণ কাব্যতীর্থ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩০)

দেহ হতে ভিন্ন আমি নিরিন্দ্রিয় আর
আমার জনমজরা নাহি কার্শ্য লয়
শব্দস্পর্শ রস আদি সকল বিষয়
সহিতে সম্বন্ধ কোন নাহিক আমার।

(৩১)

অমনা অপ্রাণ আত্মা স্বচ্ছ মলহীন
শ্রুতিবাক্য এইরূপ করিছে নির্দ্দেশ,
সুতরাং আমি হই বিকার-বিহীন
নাই মম দুঃখ রাগ কিম্বা ভয় দ্বেষ।

(৩২)

গুণহীন ক্রিয়াহীন নিত্য নির্ব্বিকার
বিকল্প-রহিত আমি হই নিরাকার,
আমি হই নিরঞ্জন অবিদ্যাবিহীন
চিরকাল মুক্তভাব মলিনতা-হীন।

(৩৩)

সমভাবে সর্ব্বদ্রব্যে ভিতর বাহির
আকাশের ন্যায় নিত্য রহিয়াছি স্থির,
অথচ বিশুদ্ধ আমি হই নিরমল
সঙ্গহীন সর্ব্বকাল অচ্যুত অচল।

(৩৪)

কেবল অখণ্ডরূপে যিনি অবস্থিত,
অনন্ত আনন্দরূপে নিত্য বিরাজিত,
সত্যের স্বরূপমুক্ত পরব্রহ্ম যিনি,
জ্ঞানরূপ অদ্বিতীয় আমি হই তিনি।

(৩৫)

রোগী যথা রসায়ন করিলে সেবন
রোগচয় নষ্ট হয়, তথা অবিরল
আমি ব্রহ্ম এইরূপ করিলে চিন্তন
দূর হয় সংসারের প্রপঞ্চ সকল।

(৩৬)

বিষয়ে নিস্পৃহ হয়ে, করিয়া বিজয়
কাম ক্রোধ লোভ আদি রিপু সমুদয়
করিবে চিন্তন সুধী বসি এক মনে
অনন্ত স্বরূপ এক ব্রহ্মে নিরজনে।

(৩৭)

নিখিল পদার্থচয় যত দৃশ্যমান
আত্মায় বিলয় পায় করি মনে জ্ঞান
নির্ম্মল আকাশবৎ করিবে চিন্তন
নিরমল একমাত্র ব্রহ্মে সুধীজন।

(৩৮)

পরিহরি রূপবর্ণ যত সমুদায়
পরিপূর্ণ চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মায়
করিবেন অবস্থান জ্ঞানী ব্যক্তিগণ
স্পৃহাহীন পরমার্থ-তত্ত্ব-পরায়ণ।

(৩৯)

জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় বলে পরম আত্মায়
এ প্রকার বিভিন্নতা নাহি কোনরূপ
কিন্তু সেই ব্রহ্ম চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ
স্বয়ং প্রকাশ পান ভক্তের হিয়ায়।

(৪০)

আত্মারূপ অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠের ইন্ধনে
এইরূপ নিরন্তর ধ্যানের মন্থনে
জ্ঞানরূপ হুতাশন হলে সমুদ্ভূত
সমস্ত অজ্ঞান কর্ম্ম করে ভস্মীভূত ॥

(৪১)

অরুণ-কিরণে পূর্ব্বে বিদূরি তিমির
পরিশেষে সমুদিত যেমন মিহির,
আত্মা স্বয়ং জ্ঞানচ্ছটা করি বিকীরণ
অজ্ঞান তিমির নাশি বিকশিত হন।

(৪২)

আপনার কণ্ঠস্থিত যদি আভরণ
অপহৃত মনে করে ভ্রমে কোনজন
পুনর্ব্বার পরিশেষে হইলে স্মরণ
পুনঃপ্রাপ্ত মনে করে সেজন যেমন
আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত তথা হলেও সতত
অপহৃত মনে হয় অবিদ্যাবশতঃ
পরিশেষে অবিদ্যার হইলে বিনাশ
প্রাপ্তবৎ আত্মতত্ত্ব হন সুপ্রকাশ।

(৪৩)

তিমিরে পুরুষজ্ঞান স্থাণুতে যেমন
আত্মায় জীবের ভাব অবিদ্যা কারণ
স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রান্তি নিবৃত্তির ন্যায়
জীবে ব্রহ্মজ্ঞানে জীবভাব লয় পায়।

(৪৪)

দিক্‌তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে যেমন
লয় পায় দিগ্‌ভ্রম লোকের তখন,
নষ্ট হয় তথা হলে তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়
"আমি" "মম" ইত্যাকার অজ্ঞান-নিচয়।

(৪৫)

সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যিনি যোগিজন
জ্ঞানের নয়ন তিনি পাইয়া সহায়
যত কিছু একমাত্র স্বকীয় আত্মায়
জগতের সমুদয় করেন ঈক্ষণ।

(৪৬)

ঘটাদি মৃত্তিকা হতে যেমন নির্ম্মিত
অন্য কিছু নহে ঘট মৃত্তিকা ব্যতীত,
আত্মা হতে জাত সব বিশ্ব চরাচর
আত্মা ভিন্ন নাহি আর কিছুই অপর।
সকল বস্তুর মধ্যে আত্মবিৎ জন
একমাত্র পরমাত্মা করেন দর্শন।

(৪৭)

দেহাদির জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানিজন
পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণোপাধি করেন বর্জ্জন,
প্রগাঢ় ভাবনা দ্বারা * আশুলা যেমন
ভ্রমর-কীটের গুণ করে বিধারণ;
তথা নিত্য ব্রহ্ম তিনি করিয়া চিন্তন
চিদানন্দ স্বরূপের ভাবপ্রাপ্ত হন।

(৪৮)

উল্লঙ্ঘিয়া বিষয়জ মোহের সাগর
বধি রাগ দ্বেষ আদি রাক্ষস নিকর
বৈরাগ্য বিবেক বন্ধু অমাত্য আবৃত
আত্মারাম যোগী শান্ত হন বিরাজিত।

(৪৯)

বাহিরের বিনশ্বর সুখে যোগিগণ
আসক্তি সম্পূর্ণরূপে করেন বর্জ্জন;

---

* আশুলা প্রগাঢ় ভাবনাদ্বারা ভ্রমর কীটের গুণ প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

আত্মসুখ বিনিবৃত্ত ঘট মধ্যস্থিত
দীপবৎ অন্তরেই হন অবস্থিত।

(৫০)

উপাধিস্থ হইলেও আকাশ যেমন
নির্লিপ্ত উপাধিধর্ম্মে স্থিত মুনিজন
বিজ্ঞ হয়ে অবস্থিত অজ্ঞের মতন
অনাসক্ত বায়ুবৎ করে বিচরণ।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

ধর্ম্মকার্য্যে মর্ম্মে আঘাত—

ফরিদপুরের জেলাবাসী বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ প্রাতে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেন। কিন্তু ইহাতে স্থানীয় মুসলমানগণ কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। একদিন কোন মসজিদের ধার দিয়া ঐ সংকীর্ত্তনের দল যাইতে ছিল এমন সময় বহু সংখ্যক মুসলমান তাহাদের উপর পতিত হইয়া তাহাদের মারপিট করিয়া খোল প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই ব্যাপারে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অন্তরে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। আশা করি সুযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতিবিধান করিবেন।

সীতাকুণ্ডে মেলা।—এবার শিবরাত্রি উপলক্ষে সীতাকুণ্ডে প্রায় ২০,০০০ যাত্রী সমবেত হইয়াছিল। সরকার বাহাদুরের যত্নে যাত্রীর কোন অসুবিধা হয় নাই।

আগামী ৩১শে মার্চ্চ হইতে দিবসত্রয় যশোহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহার প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইয়াছেন। হাটবাড়িয়ার জমিদার-পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২৯ বর্ষ, ২৯শ খণ্ড
১২শ সংখ্যা।

ভ্র।

১৩২৯ সাল।
১৮৪৪ শকাব্দাঃ

শোক-স্মৃতি।

ঢাকা কলেজের সুপ্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক স্বর্গত কালীপদ বসু এম, এ,
মহোদয়ের মৃত্যু-স্মৃতি।

লেখক—শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল।

তুমি সুপ্ত নিশীথে স্তিমিত অলোকে কোথায় চলিয়া গেলে ?
পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজন অনুগত-দলে ফেলে ?
(আজি) তোমার বিরহে হৃদয় আমার দাবদাহে সদা দহে,
তোমার ফুল্ল বদন না হেরি আমার নয়নে আসার বহে।
আজি বিশাল বিশ্বে তোমার অভাবে হেরিতেছি শূন্য সব।
হে অনঘ, আজি এ দীন বেদনা কে করিবে অনুভব ?
বৃদ্ধা জননীরে, মাতৃ-গত-প্রাণ, কেমনে কান্দায়ে গেলে ?
হে সৌম্য, তোমার প্রিয় বন্ধুগণে কার করে সমর্পিলে ?
তপ্ত অশ্রুধারা হের বিগলিত ত্রিদিব-নয়নে আজি,
প্রিয় কন্যাগণে, প্রাণের কান্তায় কেমনে যাইলে ত্যজি ?

আজি অন্ধকার তব জন্মভূমি তোমাধনে হ'য়ে হারা,
কে বুঝিবে হায় মায়ের বেদনা ? কে মুছাবে অশ্রুধারা ?
হে বিদ্বন্‌, তব বিদ্যার গরিমা সমস্ত ভারত গায় ;
হে সুজন, তব আদর্শ জীবন শ্রীরামচন্দ্রের প্রায়।
আদর্শ তনয়, আদর্শ জনক, ভার্য্যার আদর্শ পতি,
আদর্শ ভকতি ছিল যে তোমার দেব-দ্বিজ-গুরু প্রতি।
ন্যায়-পক্ষপাতী সরল-হৃদয়, সুভ্রাতৃ-বৎসল ধীর,
স্বজন-পালক, আদর্শ বান্ধব, বিপদে অটল স্থির ;
পালক মহান, হে গুণ-সাগর, বন্ধু গুরু হে আমার,
(আজি) তোমারে হারায়ে, অসার সংসার জীর্ণারণ্য অন্ধকার !
হে তেজস্বী বীর, শতরথী হেরি ভীতিশূন্য অকাতর,
সনাতন ধর্ম্মে সদা আস্থাবান্‌, সাধু কার্য্যে অগ্রসর।
কত বিধবার অশ্রুর প্রবাহ মুছায়েছ মহাপ্রাণ,
কত বালকেরে অন্নবস্ত্রসহ করিয়াছ শিক্ষাদান।
কত বিপন্নের হরিয়াছ ভয়, সময়ে সাহায্য করি,
কত নিরন্নের অন্নের সংস্থান হ'য়েছে তোমায় ধরি।
নিষ্পাপ-হৃদয়, মহামিলনের বিমল-আনন্দ তরে,
এ মর পৃথিবী ত্যজিয়া, ধার্ম্মিক, চলিলে সুরেন্দ্রপুরে।
যতদিন ভবে রহিব বাঁচিয়া গাব তব গুণ-গান,
উচ্ছ্বাস-পূরিত হৃদয় হইতে উঠিবে শোকের তান।
খনিগর্ভে মণি, সাগরের তলে মুকুতার অবস্থান,
নাহি কোন চেষ্টা ঘোষণা করিতে আপনার বহুমান ;
যে চিনে রতন, সেই মহাজন আপনি খুঁজিয়া আনে,
যতনে ভূপতি মুকুটে পরিয়া আপনারে ধন্য মানে।
বঙ্গের নিউটন, দীনে দয়াবান্‌, উন্নত-হৃদয় দাতা,
মর্ত্ত্য মানবের আদর্শ স্বরূপে তোমায় সৃজিলা ধাতা।
মৃত্যুকালে তব অমল বদনে পড়েনি চিন্তার রেখা,
অন্তিম সময়ে আছিল তোমার অক্ষুণ্ণ জ্ঞানের শিখা।
শাশ্বত আনন্দ লভিতে তখন পিপাসিত ছিল মন,
শিথিল তখন মায়ার বন্ধন, সংসারের আকর্ষণ।

মহামানবের মহাযাত্রা হেরি মহাশিক্ষা লভে নর,
সংসার-সিন্ধুর পরপারে যেতে নিষ্পাপের নাহি ডর।
তব গুণ-গাথা সম্যক্ গাইতে শকতি আমার নাই,
(আজি) বঙ্গের আকরে রত্ন তোমাসম দুর্লভ দেখিতে পাই।
যাও সুরধামে, সুরগণ-প্রিয়, দেবসহ কর বাস,
সুগন্ধি গোলাপ শুকায়েও গেলে রহে সুখপ্রদ বাস।
তোমার জীবন, অনিন্দ্য সুন্দর, পশি শ্রুতি-অন্তরে,
কর্ত্তব্যে অটল, দরিদ্রে দয়াল, করুক বঙ্গের নরে।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ইষ্ট নিষ্ঠারূপ যে অপূর্ব্ব মত আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহাতে এই সকল অবতারগণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে আদর্শ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে। বৈদিক সনাতনতত্ত্ব-সমূহের উদাহরণ-স্বরূপ বলিয়াই আদর্শ সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মাহাত্ম্য যে, তত্ত্বাত্মক সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের ব্যাখ্যাতা। ধর্ম্ম সমূহ তুলনায় সমালোচনা করিয়া তাহা হইতে যে দুইটী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই, তাহা এইরূপ। প্রথমতত্ত্ব এই যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। দ্বিতীয়তত্ত্বটি এই যে, জগতের সকল বস্তুই আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া বোধ হইলেও সকলই এক বস্তুর বিকাশ মাত্র। কিন্তু, জগতে সবাই সে তত্ত্ব না জানিয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া মনুষ্য-রক্তে ধরণী রঞ্জিত করে। কিন্তু, অতি প্রাচীনকালে ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। জগতে এরূপ মহাপুরুষ-সকলের সংখ্যা অতি অল্প। সেই প্রাচীনকালেই সেই মহাপুরুষ, এই সত্য উপলব্ধি করেন ও প্রকাশ করেন। একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। বাস্তবিক জগতে একমাত্র বস্তু আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাহা নানা ভাবে বর্ণনা করেন। এইরূপ চিরস্মরণীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই। এরূপ মহান্ সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

আর এই সত্য আমাদের হিন্দু-জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ঐ মহত্তম সত্যটীকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাই আমাদের দেশ পরধর্ম্মে দ্বেষ-রাহিত্যের মহিমময় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগৎকে আমাদিগের নিকট পরধর্ম্মে দ্বেষ-রাহিত্যরূপ মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আর একটী কথা এই যে, আপনার প্রতি বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। যদি তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রতি বিশ্বাস থাকে, আর আত্মার প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তবে কখনই মুক্তি হইবে না। আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়াই আমরা পর-পদ-দলিত হইয়াছি। প্রত্যেক পাশ্চাত্যদেশবাসী নিজের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। সেই জন্যই তাহারা সমধিক উন্নত। কেহই প্রকৃত-পক্ষে দুর্ব্বল নহে, আত্মা অনন্তশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। আত্মার ভিতর যে ভগবান আছেন, ইহা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে হইবে। তাহা অস্বীকার করা অকর্ত্তব্য। আমাদের জাতির ভিতর ঘোর আলস্য, দুর্ব্বলতা, মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। ঘোর মোহ-নিদ্রায় অভিভূত আত্মার মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে, শক্তি, মহিমা, সাধুত্ব আসিবে। যাহা কিছু ভাল সমস্তই আসিবে। আমাদের দেশে শতবর্ষ-ব্যাপী সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে কোন হিতকর স্থায়ী উপকার হয় নাই। হিন্দুজাতি ও হিন্দু-সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু, তথাপি বাস্তবিক সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কোন উপকার সাধিত হয় নাই। নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণই উপকার না হইবার কারণ! আমাদিগকে আমাদের জাতীয়বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইবে। ইহা স্বীকার্য্য যে, আমাদিগকে অপর জাতিদিগের নিকট হইতে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য-কার্য্য-প্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণ মাত্র।

ভারতে ইহাদ্বারা কখনই কার্য্য হইবে না। কাহারও কল্যাণসাধন করিতে হইলে নিন্দা বা গালিবর্ষণ দ্বারা কোনও ফল হয় না। বিশেষতঃ এমন কোনও সমাজ নাই, যাহা একবারে দোষশূন্য। জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের জাতিই মোটের উপর সমধিক নীতি-পরায়ণ ও ধার্ম্মিক। আমাদের সামাজিক বিধানগুলিই, তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বিচার করিলে, মানব-জাতিকে সুখী করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। জাতীয়ভাবে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও পরিণতিই প্রার্থনীয়। যখন আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস

পর্য্যালোচনা করি, তখন সমগ্র জগতে এমন দেশ দেখিতে পাই না, যাহা মানব-মনের উন্নতি-বিধান জন্য এমত করিয়াছে। আমাদের আরও ভাল কাজ করিতে হইবে। এদেশে প্রাচীন কালে অনেক বড় বড় কাজ হইয়াছে, কিন্তু মহত্তর কার্য্য করিবার এখনও যথেষ্ট সময় ও অবসর আছে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা আমাদিগকে মহত্তর কার্য্য করিতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া আসা চলিবে না, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে। অতএব মহত্তর কার্য্যের জন্য যেমতে হউক আমাদিগকে অগ্রসর হইতেই হইবে।

পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় ধর্ম্মচিন্তায় যে সকল পরিণতি হইয়াছে, উপনিষদে তাহারও বীজ দৃষ্ট হয়। সময়ে সময়ে বিনা হেতুবাদে এমত অভিযোগ করা হইয়া থাকে, যে, উপনিষদে ভক্তির আদর্শ নাই! যাঁহারা উপনিষদ বিশিষ্ট-রূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন এ অভিযোগ একবারে সত্য নহে। প্রত্যেক উপনিষদেই সন্ধান করিলে ভক্তির কথা পাওয়া যায়। তবে, অন্যান্য অনেক বিষয় যাহা পরবর্ত্তী কালে পুরাণ ও অন্যান্য স্মৃতিতে বিশেষরূপে পরিণত হইয়া ফুল-ফল-সুশোভিত মহীরুহাকার ধারণ করিয়াছে, উপনিষদে সে গুলিও বীজভাবে মাত্র বর্ত্তমান। উপনিষদে উহারা চিত্রের প্রথম রেখা-পাতরূপে অথবা কঙ্কালরূপে বর্ত্তমান। কোন না কোন পুরাণে ঐ চিত্র গুলি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কঙ্কাল-সমূহে মাংস-শোণিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু, এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় ধর্ম্ম নাই, যাহার বীজ সেই সর্ব্বভাবের খনি-স্বরূপ উপনিষদে না পাওয়া যায়। বিশিষ্টরূপ-উপনিষদ-বিদ্যা-বিহীন কতকগুলি ব্যক্তি, ভক্তিবাদ বিদেশাগত, এইটী প্রমাণ করিবার হাস্যাস্পদ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। উপনি-ষদের কথা কি, সংহিতায় পর্য্যন্ত ভক্তির কথা আছে। ভক্তি-তত্ত্বের যাহা কিছু আবশ্যক সবই আছে, কেবল ভক্তির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হই-তেছে। উপনিষদের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, উপনিষদের ধর্ম্ম জ্ঞানের ধর্ম্ম। পরবর্ত্তী পৌরাণিক শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বেদের মত গ্রহণ করিবে। কার্য্যতঃ আমরা দেখিতে পাই, আমরা শতকরা ৯০ জন পৌরাণিক, বাকি শতকরা ১০ জন বৈদিক। তাহাও হয় কিনা সন্দেহ।

আরও আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে নানাবিধ অতিশয় বিরোধী

আচার সকল বিদ্যমান। দেখিতে পাই আমাদের সমাজে এমত ধর্ম্ম-মত-সমূহ রহিয়াছে, হিন্দু শাস্ত্রে যাহাদের কোন প্রমাণ নাই। আর শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই ও দেখিয়া আশ্চর্য্য হই যে, আমাদের দেশে এমন সকল আচার প্রচলিত, যাহাদের প্রমাণ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ কুত্রাপি নাই। সে গুলি কেবল বিশেষ বিশেষ দেশাচার মাত্র। তথাপি প্রত্যেক অজ্ঞ গ্রামবাসী মনে করে যে, যদি তাহার গ্রাম্য আচারটী উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সে আর হিন্দু থাকিবে না। তাহার মনে বৈদান্তিক ধর্ম্ম ও এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশাচার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শাস্ত্র পাঠ করিয়াও সে বুঝিতে পারে না যে, সে যে সকল আচার পালন করিতেছে তাহাতে শাস্ত্রের সম্মতি নাই। তাহার পক্ষে ইহা বুঝা বড় কঠিন হইয়া উঠে যে, ঐ সকল আচার পরিত্যাগ করিলে কিছুই ক্ষতি হইবে না, বরং তাহাতে সে পূর্ব্বাপেক্ষা মানুষের মত মানুষ হইবে। শাস্ত্র মানুষকে বিপথে নিপাতিত করিতে কখনও উপদেশ দেন না। কাব্যাদির ন্যায় বর্ণনাচ্ছলেও শাস্ত্র, জগতে মহান্ উপদেশ দিয়া থাকেন। একটী মাত্র উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ, যথার্থ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
সমানেবৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতিমুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।
যদাপশ্যঃ পশ্যতেরুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদাবিদ্বান পুণ্য পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্)

একবৃক্ষের উপর সুন্দর পক্ষযুক্ত দুটী পক্ষী রহিয়াছে, উভয়েই পরস্পর সখ্য-ভাবাপন্ন। তন্মধ্যে একটী সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরটী না খাইয়া স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া আছে। নিম্ন শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী কখন মিষ্ট কখনও বা কটু ফল ভোজন করিতেছে, সেই কারণে কখনও বা সুখী কখনও বা দুঃখী হইতেছে। কিন্তু, উপরিস্থ শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী স্থির গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট; সে কোন ফলই খাইতেছে না। সে সুখ দুঃখে উদাসীন, নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া অবস্থিত। এই পক্ষিদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মানব ইহজীবনের স্বাদু অস্বাদু ফল ভোজন করিতেছে, সে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ ধাবমান। সংসারের ক্ষণিক বৃথা সুখের জন্য মরিয়া হইয়া পাগলের মত ছুটিতেছে। জীবনের উষাকালে

মানুষ কত সোণার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু, শীঘ্রই সে বুঝিতে পারে সে স্বপ্ন মাত্র। বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে সে তাহার অতীত কর্ম্ম-সমূহের রোমন্থন করিতে থাকে। কিন্তু, কিরূপে এই সংসারজাল হইতে বাহির হইবে তাহার কিছু উপায় খুঁজিয়া পায় না। মানুষের ইহাই নিয়তি। কিন্তু সকল মানবেরই জীবনে সময়ে সময়ে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া থাকে, এমন কি গভীরতম শোকে, এমন কি গভীরতম আনন্দের সময়, মানুষের এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সেই সূর্য্যালোকাবরোধকারী মেঘের খানিকটা যেন ক্ষণকালের জন্য সরিয়া যায়। তখন আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধ ভাব সত্ত্বেও ক্ষণকালের জন্য সেই সর্ব্বাতীত সত্তার চকিতবৎ দর্শনলাভ করি। দূরে দূরে—পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবনের অনেক পশ্চাতে, এই সংসারের সুখ দুঃখের অনেক দূরে, দূরে দূরে—প্রকৃতির পারে, ইহলোকে বা পরলোকে আমরা যে সুখ-ভোগের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হইতে বহুদূরে—বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, প্রজৈষণা হইতে বহু দূরে। তখন মানুষ ক্ষণিকের জন্য দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে। সে তখন বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থিত অপর পক্ষীকে শান্ত ও মহিমময় অবলোকন করে। সে দেখে তিনি স্বাদু অস্বাদু কোন ফলই ভোজন করিতেছেন না। তিনি নিজ মহিমায় বিভোর আত্মতৃপ্ত। যদি সে সৌভাগ্যক্রমে ক্রমাগত সংসারের তীব্র আঘাত পায়, তবে সে, তাহার সঙ্গী, তাহার প্রাণ, তাহার সখা, সেই অপর পক্ষীর ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইতে থাকে। আর যতই সে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়, ততই দেখে সেই উপরিস্থ পক্ষীর দেহের জ্যোতিঃ আসিয়া তাহার পক্ষের চতুর্দ্দিকে খেলা করিতেছে। আরও যত সমীপবর্ত্তী হয় ততই তাহার রূপান্তর ঘটিতে থাকে। ক্রমশঃ অতি নিকটবর্ত্তী হইলে সে দেখিতে পায় যেন সে মিলাইয়া যাইতেছে, শেষে সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটে। তখন সে বুঝিতে পারে যে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না। সে সেই সঞ্চরণশীল পত্ররাশির ভিতর শান্ত ও গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট অপর পক্ষীর প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু, এই অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভ, ইন্দ্রিয়ের দাস দুর্ব্বল মনুষ্যের সাধ্য নহে। দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি না করিয়া ক্রমশঃ সবল হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। পরন্তু হৃদয়ের চিরসঞ্চিত অজ্ঞানরাশি দূর করিতে হইবে। অজ্ঞান হইতেই ভেদবুদ্ধি জন্মে, এবং তন্নিবন্ধন বিরোধ সমুপস্থিত হয়। পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। নিজেকে কখনও পাপী বা দুর্ব্বল বলিয়া মনে করা উচিত নহে। যাহা ভাবা যায় তাহাই গঠিয়া উঠে। আমরা সর্ব্বশক্তিমান নিরঞ্জনের অংশ ইহাই চিন্তা করিতে হইবে।

আমাদিগের এখন আর পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি করিলে চলিবে না। এখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। নিজকৃত শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিতে হইবে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" তিনি অংশ বা কলা নহেন, তিনি পূর্ণ ভগবান। তিনি স্বয়ং বেদ-স্বরূপ এবং সর্ব্বোপ-নিষদের টীকা-স্বরূপ গীতার প্রচারক। যখন আমরা বিবিধভাব-সমন্বিত চরিত্রের বিষয় চিন্তা করি, তখন তাঁহার প্রতি এমত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তিনি একাধারে অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন। তাঁহার মধ্যে অত্যদ্ভুত রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁর অত্যদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কখনই কৃষ্ণচরিত্র বুঝা যাইতে পারে না। কারণ, তিনি তাঁহার নিজোপদেশের মূর্ত্তিমান বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। তিনি অনাসক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন না। তাঁহার জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্ব্বোধ্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্র-স্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। যাহা প্রেমের অত্যদ্ভুত বিকাশ, যাহা সেই বৃন্দাবনে মধুর লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রেম-মদিরাপানে যে একবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম। কে সেই গোপীদিগের প্রেমজনিত বিরহভাব বুঝিতে সক্ষম? যে প্রেম প্রেমের চরম আদর্শস্বরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না, যে প্রেম স্বর্গ পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে প্রেম ইহলোক পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না। গোপী-প্রেম দ্বারাই সগুণ নির্গুণ ঈশ্বর-বাদের সামঞ্জস্য হইয়াছে। আমরা জানি মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা ইহাও জানি দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগৎব্যাপী সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ, একটা সাকার বস্তু চায়, এমন বস্তু চায়, যাহা আমরা ধরিতে পারি। যাঁর পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানবের চূড়ান্ত ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। যদি একজন সম্পূর্ণ ঈশ্বর দয়াময় থাকেন, তবে নরকবৎ এ সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাকে একজন মহা পক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে ইহার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই, কেবল গোপী-প্রেম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়া যায়, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে।

কৃষ্ণের প্রতি তাহারা কোনও বিশেষণ প্রয়োগ করিতে চাহিত না। কেবল তাহারা বুঝিত তিনি প্রেমময়, ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়াই বুঝিত।

ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

হে জগদীশ! ধন, জন, কবিতা বা সুন্দরী, কিছু প্রার্থনা করি না; হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহেতুকী ভক্তি জন্মে। ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা এক অধ্যায়, এই অহেতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম্ম, আর মনুষ্যের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আর মনুষ্য-হৃদয়ে সুখভোগেচ্ছা নরকভীতি সত্ত্বেও এই অহেতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মরূপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শের অভ্যুদয় হইল। আমাদের মধ্যেও এমন নির্ব্বোধের অসদ্ভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতি অপূর্ব্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম। অশুদ্ধাত্মা নির্ব্বোধ অনেক আছে, যাহারা গোপী-প্রেমের নাম শুনিলে অতি অপবিত্র ব্যবহার ভাবিয়া ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই, আপনার মন আগে বিশুদ্ধ কর। আর ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, আজন্মশুদ্ধ ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভগবৎ-প্রেম অসম্ভব। উহা কেবল দোকানদারি; আমি তোমায় কিছু দিতেছি, প্রভু, তুমি আমায় কিছু দাও। আর ভগবান বলিতেছেন যদি তুমি এরূপ না কর তাহা হইলে মরিলে তোমায় দেখিয়া লইব। চিরকাল আমি তোমায় দগ্ধ করিয়া মারিব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বর ধারণা এইরূপ। যতদিন মাথায় এসব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদিগের বিরহজনিত প্রেমোন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিত-বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতর-রাগ-বিস্মারণং তব বীর নস্তেহধরামৃতং॥

একবার, একবার মাত্র যদি সেই অধরের মধুর চুম্বনলাভ করা যায়,—যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। তাহার বিষয়াসক্তি দূর হয়। তখন তুমিই তাহার একমাত্র প্রীতির বস্তু হও। প্রথমে, কাঞ্চন, নাম, যশঃ, এই

মিথ্যা ক্ষুদ্র সংসারের প্রতি, আসক্তি ছাড় দেখি; তখনই গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিতে পারিবে। উহা এত বিশুদ্ধ যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। পৃথিবীর যাবতীয় বাসনা ত্যাগ করিবার পর যদি চিত্তে ভগবানের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা জন্মে, অপ্রাপ্তিতে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে এইরূপ ভাব চিত্তে জন্মিলে, তবে, গোপীদিগের প্রেমোন্মত্ততার উপলব্ধি হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)



শক্তির দ্বন্দ্ব।

(লেখক—শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুই শক্তির অবিরাম লীলা, প্রতিনিয়তই দ্বন্দ্ব। এক সৃষ্টিরক্ষাকর্ত্রী, অপর ধ্বংস-প্রলয়ের জননী। একটীর নাম অনুকূল, অন্যটীর নাম প্রতিকূল। রক্ষাকর্ত্রী শক্তি দেবতা। ধ্বংস-শক্তি অসুর। অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি ৩৩টী রক্ষাকর্ত্রী দেবতা বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উদাহৃত হইয়াছে।

"ত্রয়স্ত্রিংশত্বেব দেবাঃ"

সৃষ্টি-রক্ষার্থই ইহারা সৃষ্ট ও বর্দ্ধিত। লোকপালরূপে সকলকার প্রপূজিত ইহার বিপরীত, ধ্বংসশক্তি অসুর। এই ধ্বংসশক্তির নামই প্রতিকূল শক্তি। ইহার অস্তিত্ব যদিও সর্ব্বসময়ে বিদ্যমান, কিন্তু প্রকৃত প্রবল ভাব কদাচিৎই দৃষ্ট হয়। বন্যা, ঝটিকা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতিই অসুর। এই অসুরগণের পূর্ণ বিকাশে প্রলয়। প্রলয়কালে অসুরগণের পূর্ণ প্রতাপ। তখন দেবতারা পর্য্যন্ত অসুরগণের সহিত মিশিয়া গিয়া একরূপতা ধারণ করে। তখন দ্বাদশ সূর্য্য, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু ভীমবিক্রমে সৃষ্টির ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে

জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এই শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্ব এক অদ্ভুত ব্যাপার। উভয়ের দ্বন্দ্ব নিয়তই বিদ্যমান। কখনও বা উভয়ের সাময়িক মিলন। আবার সেই মিলনেরই অবশ্যম্ভাবী ফল ঘোরতর দ্বন্দ্ব। ইহা এক বিচিত্র বিরোধও বটে, আবার সেই বিরোধের বিচিত্র সামঞ্জস্যও বটে। দেবাসুরের মিলনে অমৃতের উদ্ভব দ্বন্দ্বে অমৃতের রক্ষা। একের পরাভব সৃষ্টিরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। সৃষ্টি

প্রথম হইতে এই অবিরাম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে সৃষ্টির রক্ষা ও ধ্বংস, প্রকৃতির সমতা ও বৈষম্য।

সাধারণতই সৃষ্টি ও রক্ষাই অনুকূল শক্তির কার্য্য। ধ্বংস বা প্রলয় প্রতিকূল শক্তির কার্য্য। এই উভয়শক্তির দ্বন্দ্বে কখনও একের পরাভব দৃষ্ট হয়, কখনও বা উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের উদ্ভব হয়। সত্ত্বরজোময়ী ব্রহ্মবিষ্ণু-মূর্ত্তি। আর ধ্বংসপ্রলয়ের দেবতা মহাদেব। শাস্ত, শিব, আশুতোষ, ভোলানাথ, দিগম্বর শঙ্করই প্রলয়ের দেবতা।

প্রতিকূলশক্তির তখনই প্রাবল্য, যখন অনুকূল শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উপনীত হয়। এ নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান, সৃষ্টির অপরিহার্য্য ফল। অনুকূল শক্তি অবিরাম-গতিতে আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেছে। অবিশ্রান্ত-গতিতে স্রোতের মত হুহু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। ফলে যন্ত্রের মত সেই শক্তিকে একদিন বিকলপ্রায় হইতে হইবে; শক্তিরূপ সে যন্ত্রটীর আর সে কার্য্যকারিতা থাকিবে না। অনুকূল শক্তির বল যেমনই ক্ষয় হইয়া আসিবে, প্রতিকূল শক্তি অমনিই সগর্ব্বে মাথা খাড়া দিয়া উঠিবে। যে প্রতিকূল শক্তি এতদিন নির্জ্জীব প্রায় ছিল, কি এক ঐন্দ্রজালিক মাহাত্ম্যে সজীব হইয়া দাঁড়াইবে। তখন তাহার উদ্দাম নৃত্য দেখে কে? তখন সেই প্রতিকূল শক্তি অনুকূল শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভূত, নির্জ্জীব করিয়া ফেলিবে। তখনই বিশ্বের ধ্বংস অবস্থা। কারণ প্রতিকূল শক্তির কার্য্য রক্ষা (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) নহে। জগতের আপাত-দৃশ্যমান সৃষ্টি নষ্ট করাই সাধারণতঃ প্রতিকূল শক্তির কার্য্য; তাই উহা দেশের সমক্ষে ধূমকেতুর মত নানা উপদ্রব আনিয়া উপস্থিত করে। পাপের সৃষ্টি করিয়া আপনার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করে। এইরূপ ঘোর সঙ্কট মধ্যে মধ্যে আসিয়াই থাকে। সেই ঘোর সঙ্কট হইতে কোনমতে উদ্ধারের উপায় থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা সে উপায় অবলম্বন করেন। তখন অধর্ম্মের পরাজয় দ্বারা ধর্ম্মের জয় করা অসুরগণের নাশ দ্বারা দেবতাদের রক্ষা করা আবশ্যক হয়। তখন ভগবান নিজের শক্তি ব্যষ্টি বা সমষ্টির ভিতর দিয়া প্রকাশিত করেন। দুশ্চিকিৎস্য হইলে নিজেই শেষে আবির্ভূত হন। তারপর পরম কারুণিক শ্রীভগবান, আসুরিক শক্তিকে দুর্ব্বল, শেষে বিধ্বস্ত করিয়া দৈবী-শক্তিকে প্রবল, পরিশেষে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলেন! এইরূপে প্রতিকূল শক্তির দৌর্ব্বল্য এবং অনুকূল শক্তির প্রাবল্য সংসাধিত হইয়া সৃষ্টিরই ক্ষমতা রক্ষিত হয়। নিষ্ক্রিয় সমতার বিনাশ যখন আবশ্যক হইয়া থাকে তখনই বৈষম্যের

উদ্ভব হয়। আবার সেই বৈষম্যের পতন আবশ্যক হইলে আদর্শ সমতার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। এই আদর্শ সমতাই সৃষ্টিরক্ষার হেতু।

সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে মনে হয় বটে যে এই দ্বন্দ্ব বিশ্বের অহিত-কর; কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, পরিণামে ঐ দ্বন্দ্বই সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ধরিয়া লও, অনুকূল শক্তির পূর্ণ প্রভাব। শত্রু কেহ নাই, সম্মুখে পশ্চাতে কোন বিঘ্ন নাই। কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতেছে। সূর্য্যদেব যেমন আলোক-তাপ বিকীরণ করেন, তাই করিতে থাকিলেন; বায়ু ঠিকমত বহিতে লাগিল, মেঘ যথাযথ জল বর্ষণ করিতে থাকিল, শস্যে পূর্ণ বসুন্ধরা; তরুলতা স্বচ্ছন্দমত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; জল মৎস্য-শম্বুকাদিতে, স্থল জীবজন্তুতে পূর্ণ হইয়া গেল। অকাল মৃত্যু নাই, প্রকৃতির কোন উপদ্রব নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বংসের পর্য্যন্ত খেলা প্রত্যক্ষে আইসে না। জীব জীবকে ধরিয়া খায় না, বাতাসে ঝটিকাতে তরুলতার একটী পত্রও নষ্ট করে না। কি সুন্দর ধরার অবস্থা!

বাস্তবিকই কি তাই? ইহা আপততঃ সুখের মনে হইলেও পরিণামে কিন্তু দারুণ দুঃখই আনয়ন করে। ফলের পক্কাবস্থাই তাহার নাশের পূর্ব্ব-লক্ষণ। তরুলতায় দেশ ছাইয়া গেল, মৎস্যাদি জলজীবে জল পূর্ণ হইয়া গেল। জীবে জীবে বিশ্ব ভরিয়া গেল। তিল অবকাশ (ফাঁক্) রহিল না, এই সম্পূর্ণতা, এই পরিণতি শেষে বিষম অসামঞ্জস্য, অনাবশ্যক স্ফীতি আনিয়া দিয়া নাশের পথই দেখাইয়া দিবে। তবেই দেখ, দ্বন্দ্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য—অনুকূল শক্তির সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক সৃষ্টির ভবিষ্যৎ রক্ষা। সৃষ্টির পরিণামে মঙ্গলের জন্য এবং তার প্রকৃত রক্ষার জন্যই প্রতিকূল শক্তির প্রাবল্য ও জয়, অনুকূল শক্তির সাময়িক দৌর্ব্বল্য ও পরাভব। এই দ্বন্দ্বে উভয় শক্তির কোনটীই কখনও একেবারে নাশ প্রাপ্ত হয় না; একে অপরের অধীন হইয়া পড়ে মাত্র। কতদিনের জন্য? যতদিন, না একশক্তি পুনরায় দুর্ব্বল, কার্য্য অক্ষম হইয়া যায়।

ধ্বংস ও প্রলয় — সাধারণ ধ্বংস মাত্রেই ধ্বংস। আর বিশ্বের আত্যন্তিক নাশই প্রলয়। এক্ষণে ধ্বংসের কথা অগ্রে বলিয়া পরে প্রলয়ের কথা বলিব। এই ধ্বংস দুই প্রকার। এক নিত্য, আর নৈমিত্তিক। প্রতিনিয়তই যাহা ঘটে, তাহা নিত্য, সময়ে সময়ে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাই নৈমিত্তিক। জন্ম, স্থিতি, রক্ষা অনুকূল শক্তির ধর্ম্ম। ক্ষয়, বিপরিণাম, নাশ প্রতিকূল

শক্তির ধর্ম্ম, কি জড়, কি চেতন, সকল পদার্থেরই যেমন জন্ম, স্থিতি তেমনই বিপরিণাম, নাশ আছে। তাবৎ পদার্থরই প্রতিক্ষণে ক্ষয়, বিপরিণাম বা নাশ দৃষ্ট হয়। এই ক্ষয়, এই বিপরিণাম এই নাশই নিত্য ধ্বংসেরই পরিচয় দিতেছে। দেহ ইন্দ্রিয়, তরুলতা, গিরিনদী—তাবৎ পদার্থই প্রতিনিয়তই যেমন পুষ্ট হইতেছে, এই পুষ্টি ও ক্ষয়ের মধ্য দিয়া সকলকারই গতিও নির্দ্ধারিত হইতেছে।

বন্যা, ঝটিকা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, বিপ্লব সমস্তই সাময়িক বা নৈমিত্তিক ধ্বংসের কার্য্য। এই নিত্য ধ্বংস, নৈমিত্তিক ধ্বংসও আপাততঃ সৃষ্টিনাশের হেতু বলিয়া বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ইহাই সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বিধান করে। নিত্য ধ্বংস রোধ কর; দেখিবে নৈমিত্তিক ধ্বংস প্রতিনিয়তই ঘটিতে আরম্ভ করিবে। আবার নিত্য ও নৈমিত্তিক ধ্বংস রোধ করিয়া দেখ, প্রলয়কাল অত্যন্ত নিকট হইয়া আসিয়াছে। নিত্য ও নৈমিত্তিক ধ্বংসই আত্যন্তিক নাশ বা প্রলয় হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রলয়কে দূর হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া দিয়া আপনাদের সৃষ্টিরক্ষার উপযোগিতা প্রমাণ করিতেছে। সাধারণতঃ এই অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির দ্বন্দ্বে অনুকূল শক্তিরই জয় হইয়া থাকে। এই জয় লাভের ফল আপাততঃ বেশ লাভ-জনক বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহাই ক্রমে সৃষ্টি ক্রিয়াকে পঙ্গু ও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলে। এই পঙ্গুতা, এই বিশৃঙ্খলতা এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্যই নিত্য ও নৈমিত্তিক ধ্বংসের আবশ্যকতা. নিত্য নৈমিত্তিক ধ্বংসরূপ প্রতিকূল শক্তির সহিত দ্বন্দ্বে সাধারণতঃ অনুকূল শক্তির জয় ঘটিয়া থাকে। যতদিন সৃষ্টি বিদ্যমান, সৃষ্টির রক্ষাই যখন অভিপ্রেত, তখন মোটের উপর অনুকূল শক্তি একটু একটু করিয়া ঋদ্ধিলাভ হইবেই। বহুকাল ব্যাপী এই দ্বন্দ্বের ফলে নিত্য নৈমিত্তিক ধ্বংসরূপ প্রতিকূল শক্তি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া আসিলে পর, অনুকূলশক্তি বেশ প্রবল হইয়া উঠে। সেই সময়ে অনুকূল শক্তির সর্ব্বাঙ্গীন ঋদ্ধি দেখা যায়। পৃথিবীতে তখন সুখ ও শান্তির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বাঙ্গীন ঋদ্ধিপ্রাপ্ত অনুকূল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিকূল শক্তির বল হ্রাস পাইয়া থাকে। তখন আর তাহার বাধা দিবার শক্তি থাকে না। প্রকৃতি তখন স্থির শান্ত ভাব ধারণ করে। প্রকৃতির এই শান্ত স্থিরভাব পৃথিবীর এই নিস্তব্ধ নিরুপদ্রব অবস্থা তাহাদের আসন্ন নাশেরই পূর্ব্ব লক্ষণ। নিভিবার পূর্ব্বে

প্রদীপের শেষ শিখা ভালরূপই জ্বলিয়া উঠে। প্রকৃতির এই শান্ত স্থির ভাব অচিরভাবী ঝটিকারই সূচনা করে। বিশ্বের এই ক্ষমতাই বল, সুখ শান্তিই বল, খধূপের মত ক্ষণস্থায়ী আলোক বিতরণ করিয়া নাশপ্রাপ্ত হয়। এই স্থিরভাব, এই নিরুপদ্রব অবস্থা, স্ফীত অনুকূল শক্তির প্রচ্ছন্ন বিকারেরই পূর্ব্বলক্ষণ। এ সমতা প্রকৃত সমতা নহে। বিষমতার পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। সমতার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা আসন্ন ধ্বংসেরই পূর্ব্বসূচনা। আমাদের শাস্ত্রেই আছে পৃথিবীর সম্পূর্ণ একাকার অবস্থা আসিলে পর প্রলয় দেখা দিবে।

উৎকট ক্ষমতাই দারুণ বৈষম্য। সমস্তই একাকার; এক জাতি, এক বর্ণ, এক নীতি, এক ব্যবহার, এক আচার, এক ধর্ম্ম। সকলেই এক, সকলেই স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই, দেবতায় মানবে পার্থক্য নাই, ভাল মন্দ তারতম্য নাই। রাজা নাই, প্রজা নাই, গুরু নাই, শিষ্য নাই, প্রভু নাই, ভৃত্য নাই। বড় নাই, ছোট নাই, ধনী নাই, দরিদ্র নাই, জ্ঞানী নাই, অজ্ঞানী নাই, সবাই সমান। উপাস্য উপাসকে কোন বিভিন্নতাই নাই। স্ত্রীপুরুষে কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আপাততঃ মনে হয় ধরা যেন স্বর্গধামে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা, প্রলয় আবির্ভাবের সূচনা।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গ-সিংহাসন।

লেখক—পণ্ডিতবর শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নদীতীর। কাল—সন্ধ্যা।

অর্দ্ধ-মোহগ্রস্ত ইন্দ্র।

ইন্দ্র—একি ভ্রান্তি!

হস্ত পদ অবশ আমার;

উঠিতে ক্ষমতা নাহি আর।

চক্ষু আসে আপনি মুদিয়া।
অথচ জ্ঞানের সাড়া
পূর্ণভাবে আছে বিরাজিত।
আমি ইন্দ্র,
দূর হও মহামোহ।
আমার সকাশে
নাহি তোর কোন অধিকার।
[কিঞ্চিৎ আবিষ্টভাবে]
অ্যা ;
এখনও শুনিলে না নিদেশ আমার।
আমি ইন্দ্র স্বর্গ-অধিপতি।
ও কি ?
কেন মনোমাঝে উঠিছে সংশয় ?
আমি ইন্দ্র কি না ?
আমিই কি অমর-ঈশ্বর ?
বলো—বলো মর্ত্ত্যবাসী
স্বর্গরাজ্য আছে কি না মোর অধিকারে।

[ত্রিদিবের রাজলক্ষ্মীর ইন্দ্রের শরীরাভ্যন্তর হইতে বহিরাগমন]

কে তুমি—কে তুমি বলো মোরে,
সহসা সকাশে মোর হ'লে আবির্ভূত ?
যাচ্ঞা কিছু আছে মোর কাছে ?
চাহ কি প্রভুত্ব তুমি পশ্চিম প্রদেশে ?
ও কি ? ওকি তীব্র হাসি
খেলে যায় বঙ্কিম অধরে।

[অলক্ষ্যে নিয়তির গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান]

চিনিতে পারিলে না যে চিনিবে কিসে ?
বিধি-বিড়ম্বনে তুমি হারা'লে দিশে।
কিছু কি নেই বলার মত
সকলি যে কর্‌লে হত
ঐ চলে যায় অমরলক্ষ্মী পুণ্যের স্রোতে মিশে

ইন্দ্র—তাইত' – তাইত' হ'ল একি ?
কি দুর্দ্দৈব ঘটালে বিধাতা।
পতনের উল্টাপথে চাহি দাঁড়াইতে
কিন্তু কি দুর্দ্দম বেগে টানিছে পতন।
ত্যজ না অভাগা দীনে
হে অমর-রাজলক্ষ্মী!
এতকাল ধরি সেবিল চরণ তব
দেব পুরন্দর;
সে কি শুধু প্রাণহীন প্রতিমার পূজা ?
মায়াময়ী রমণীর মিথ্যা তোষামোদ ?
নাহি কি কোনও মূল্য তার ?
ও-কি ?
তবু শুনিলে না কথা!
গেলে চলে ?—যাও তবে
যেদিকে চাহিবে রুষ্ট আঁখিদ্বয় তব।
কিন্তু জেন মনে—
দুর্লভ হইবে ভবে
দেবেন্দ্রের সম চরণ-সেবক।
[রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান; উঠিতে যাইয়া]
এ কি ?
একি তীব্র নিদ্রা আকর্ষণ!
কে বলিবে—কিসের এ প্রেরণা বিরাট
[ইন্দ্রের মোহ নিদ্রা আকর্ষণ]

২য় দৃশ্য।

স্থান—বৃহস্পতি-নিকেতন।

বৃহস্পতি ও দেবগণ।

বরুণ—দেবেন্দ্রের নাহি সমাচার—
আজি পঞ্চম দিবস।
রাজা বিনা রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল।
কি করা কর্ত্তব্য যাচে উপদেশ
আপনার কাছে দেবতা-সমাজ।

পবন—দেব-পুরোহিত, কি করা কর্ত্তব্য ?
সম্মুখে দেখুন ঘোর বিকল্পের স্থল।
কাণ্ডারি-বিহীন তরী
যথা প্রতি তরঙ্গ-আঘাতে
সদা করে টলমল ;
তেমনি—
নৃপতি-বিহীন এই অমর প্রদেশ,
প্রতি ঘাত প্রতিঘাতে উঠিছে কাঁপিয়া।
সুযোগ পাইলে অমরারি দল,
পড়িবে প্রচণ্ডবেগে দেবের সমাজে।
সে বিক্রমে অমরার ধ্বংস সুনিশ্চয়।
চিন্ত সদুপায়—
যা'তে দেবতার সমূহ মঙ্গল।
আপনার পরে
দেব-রাজত্বের ক্ষেম করিয়া নির্ভর
নিশ্চিন্ত সতত পুরন্দর।
আজ অসুরারি-দলপতি বিনে
তাই তোমা' লভেছে শরণ
উপযুক্ত পরামর্শ আশে
দনুজারি-দল।
বৃহস্পতি—হে পবন—হে বরুণ—
হে নিখিল দেবতা-সমাজ!
সত্যই দেবতা-রাজ্য
মহা সমস্যার মাঝে
আছে দাঁড়াইয়া।
কি করা কর্ত্তব্য—প্রশ্ন করা
জিজ্ঞাসুর সাধারণ ভাব।
সমস্যার সমাধান সমূহ দুষ্কর।
অগ্নি—সেই সমাধান-আশে
এসেছেন দেবগণ পার্শ্বে আপনার।

যুক্তি-যুক্ত উপদেশ দানে
অশুভের কর-রেখা হ'তে
মুক্ত করে দিন আজি দেবতা-নিচয়ে।
বৃহ—ব্রহ্মহত্যা-পাপ-মগ্ন দেব পুরন্দর।
জগতে পাপের ফল
কাল পূর্ণ হলে, ভোগ সুনিশ্চয়।
সেই কাল পূর্ণ এতদিনে।
যতদিন পাপ-ভোগ পূর্ণ নাহি হবে,
ততদিন অজ্ঞান-আঁধারে
মগ্ন রবে অমর-ঈশ্বর।
অরাজক প্রদেশের শস্য-হানি হয়।
প্রবল সতত করে দুর্ব্বল-পীড়ন।
নৃপতি-বিহীন রাজ্যে বাস অনুচিত।
যোগ্য-ব্যক্তি-করে দেও
অমরার রাজ-সিংহাসন।
যম—গুরুদেব!
আজ্ঞা তব শুনিল এ দাস।
কিন্তু বল, বিনা শচীপতি
বসি স্বর্গ-সিংহাসনে,
কোন্ সে অমর
পালিবে স্বরগরাজ্য ন্যায়ের বিধানে?
পবন—কারার অধ্যক্ষতায় ভ্রান্ত তব মতি,
দম্ভোলীর গুণগাথা গাহ সে কারণ।
নরকে পাপের চিত্র নিরখি ভীষণ,
পুণ্যের বিমল প্রভা অন্তঃস্থল হতে
হইয়াছে অন্তর্হিত।
বুঝিয়াছি তাই অকারণে
বাসব-বন্দনা-গীতি গাহিছ সভাতে।
পরস্ত্রী শাস্ত্রের মতে মাতার সমান;
পর আরো মাতৃ-সমা গুরুর কামিনী

হরণে মানসে যার নাহি ছিল জ্ঞান,
কেমনে গাহিছ তার যশের কাহিনী।
বীরত্বও বোঝা গেছে নমুচি-নিধনে।
বাহুতে স্তম্ভিত অস্ত্র বীরপণা যার;
ধিক্, শতধিক্ তার গুণ গানে
দিতেছ বন্দীর মত পঞ্চমে ঝঙ্কার।
রয়েছেন শিখিধ্বজ বীর তারকারি,
হুতভুক হব্যবাহ দেবের আনন,
অথবা যক্ষের পতি বীর বৈশ্রবণ।
যারে ইচ্ছা প্রত্যর্পণ করো সিংহাসন॥
আমি ত হইব সুখী
সিংহাসনে হেরিলে কুমারে।
ন্যায়-ধর্ম্ম-মতে তাঁর
প্রাপ্য এই অমরার রাজ-সিংহাসন।
যথারুচি তোমাদের করো সংবিধান।

যম—জন্ম তব নীচকুলে, তাই অকারণ
পরগুণ-মৎসরতা অন্তরে তোমার॥
বংশের মতন কথা বলিলে এখন॥
আত্মছিদ্র নাহি জান। পরছিদ্র ধর;
পরস্ত্রী জননী বলে করো অহঙ্কার।
অঞ্জনার সতীধর্ম্ম হরিলে যে কালে
এ জ্ঞান তখন ছিল কোথায় তোমার?
জন্ম তব দৈত্যকুলে, কেন দেব মাঝে?
দাঁড়কাক কেন বল ময়ূরের বেশে?
যাও তুমি মিশ গিয়া দানব-সমাজে
পারো, বসো।
দৈত্য নিয়ে সিংহাসনে এসে।

পবন—কোন্—অহঙ্কারে—

কার্ত্তিক—[হাত ধরিয়া]
থাম প্রভঞ্জন,
ক্ষুব্ধ কেন তুমি দেববর।

বাসবের প্রিয়সখা বাসব-অনুজ
আত্ম কলহের মাঝে
তোমাদের মগ্ন থাকা নহে সমীচীন।
অন্তক, ধর্ম্মের ভার তোমার উপর,
কেন এ অধর্ম্মোচিত চিত্তের বিক্ষেপ?
সিংহাসন-লোভী নয় আমার অন্তর,
দেব-বংশে জন্ম, দেবের কুমার,
দেব হয়ে আত্মদ্বন্দ্ব কর কি কারণ?
ভুল দোষ;
বাঁধ পুনঃ প্রণয়ের রাখি-সূত্র করে।
সেনাপতি রাজকাজ জানিব কেমনে?
করেছি কেবল রণে সৈন্য-সঞ্চালন।
কি কাজ আমার স্বর্গ-সিংহাসনে?
উপযুক্ত অন্যে কর রাজত্বে বরণ।
বিধান-অভিজ্ঞ সূরি
রয়েছেন বৃহস্পতি দেব-পুরোহিত
দেহ ভার উপরে তাঁহার।
করিবেন যা'হয় বিহিত,
বরিবেন সিংহাসনে যোগ্য-অধিরাজে।

বৃহ—নৃপতি-উচিত গুণ দুর্লভ ভুবনে।
শত নৃপতির মাঝে লভে একজন।
নহুষ পৌরব-পতি সর্ব্বগুণাকর
তাঁহারে তোমরা বর নৃপতির পদে।

কার্ত্তিক—শুনিলে সকলে।
চল যাই পিতৃলোক—
দেবেন্দ্রের পদে বরি পৌরব নহুষে।

[সকলের প্রস্থান]

জ্ঞানানুভূতির ক্রমবিকাশ।

প্রথম প্রস্তাব

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্. এ. পি. এইচ. ডি.

অদ্বৈত বেদান্ত গভীররূপে আলোচনা করিলে একটা সত্য আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই বিশ্বটী আমাদের কল্পনা, যদিও এ কল্পনা অনাদি-কাল হইতে আছে। আচার্য্য শঙ্কর বোধ ও ইচ্ছার ভিতর একটা ভেদকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইচ্ছাস্তরে যে বিজ্ঞান সত্য, বোধস্তরে তাহা সত্য নহে। ইচ্ছা আমাদের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠে এবং এই ব্যক্তিত্ববোধের সহিত মানব, সমাজ, ঈশ্বর ও প্রকৃতির বোধ জাগিয়া উঠে। বস্তুতঃ যতদিন পর্য্যন্ত আমার আমিত্বের বোধ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভেদবুদ্ধি আমার নিকট আমি ভিন্ন প্রকৃতি ও ঈশ্বর, মানব ও সমাজের অস্তিত্ব প্রকটিত করিবে।

জ্ঞানের ব্যবহারস্তরে বৈদান্তিকগণ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদের সহিত জীব, ঈশ্বর, প্রকৃতির ভেদবোধ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানের অনবচ্ছিন্ন স্বরূপ যতদিন না আমার নিকট বিকসিত হয়, ততদিন খণ্ডজ্ঞান থাকিয়া যায়। এটা ব্যবহারিক জীবনের অনুভূতি (Intuitions of practical reason)।

এবং যতদিন এই ব্যবহার ও অনুভূতি আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, ততদিন এ বিশ্ব মিথ্যা—ভেদবুদ্ধি মিথ্যা—এই ধারণা আমরা করিতে পারি না। বেদান্তবিচার বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিলেও—অনাদি জীবনের সংস্কারের বেগ এত বেশী, ব্যক্তিগত জীবনের সুখভোগের ইচ্ছা এত প্রবল, জীবনাসক্তি (Will to live) এত দৃঢ়, যে জগতের সত্যতা বুদ্ধির নিকট নিরাকৃত হইলেও ব্যবহারে তাহার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হই।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা অজ্ঞানের ক্রীড়নক হইয়া থাকি, ততদিন জগৎকে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, অভিলাষ ফুটিতে থাকে। জ্ঞানের এই স্তরকে বেদান্তের পরিভাষায় বলা যাইতে পারে—সৃষ্টি-দৃষ্টিস্তর। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। যেখানে বেদান্ত-প্রজ্ঞা স্থিতিলাভ করে নাই, সেখানে জগতের স্বাতন্ত্র্যবোধকে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ আমাদের নিকট সাক্ষ্য দেয়। আমাদের বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ আছে তাহারা সকলই সত্য। আমার জ্ঞান বা অজ্ঞান, তাহাদের অস্তিত্বের কারণ বা বাধক হয় না। তাহারা আছে বলিয়াই আমি দেখি, এটাই সত্য। আমি দেখি

বলিয়াই তাহারা আছে, এটা সত্য নহে। এইরূপ প্রত্যেকে পদার্থের সত্বা আমার সত্বা হইতে পৃথক এবং আমার জ্ঞান হইতে তাহাদের অস্তিত্ব ভিন্ন। এই সাধারণ বিজ্ঞানের উপর সৃষ্টি দৃষ্টিবাদের ভিত্তি। বস্তুতঃ সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহে যে ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির কারণ, জীব-সৃষ্টির কারণ, সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের নিয়ামক।

আমাদের জ্ঞান তাকেই প্রকাশ করে যাহা ঈশ্বর-ইচ্ছায় অস্তিত্বলাভ করিয়াছে। ইচ্ছা, প্রযত্ন, স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি নানাবিধ বৃত্তিনিচয় এই সৃষ্টি দৃষ্টিবাদকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত এবং নানাবিধ আস্বাদে তৃপ্ত করে। যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের এই ভূমিতে স্থিতি হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানব তাহার ভোগবৈচিত্র্য বরণ করিয়া তৃপ্ত ও আনন্দিত হয়।

কিন্তু জিজ্ঞাসা মানুষের বুদ্ধিকে এই স্তর হইতে আরও উচ্চতর স্তরে বিকসিত করে। এই স্তরের সংজ্ঞা হইতেছে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ। জ্ঞানের গভীর আলোচনায় এটা স্বতঃই প্রতীত হয় যে, আমাদের সংস্কারগুলি আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের বিষয়। সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের কখনও বিষয় বোধ হয় না, তবু যে আমরা দেশ বা কালে, বিষয় বা ঘটনার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি, ইহাও একটা অজ্ঞানের বিজৃম্ভণ বা বিকার। সংস্কারগুলি আমাদেরই ভিতরে থাকে, তবু যে মনে হয় আমরা সকলই একটা বিষয় দেখি ইহার কারণ অজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে আমাদের প্রত্যেকেরই সংস্কার প্রায়ই এক রকম। বোধ-বিকাশের যে স্তরে আমরা পৌঁছিয়াছি, সেই স্তরে কতকগুলি সংস্কার আমাদের স্বভাবতঃ সম্পূর্ণরূপে এক। অতএব যখন সেই সংস্কারগুলিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের বোধ হয়, তখন এরূপ প্রতীতি হয় যে সকলেরই একটী বিষয়ে বোধ হইতেছে, আমাদের সংস্কার বা জ্ঞানের অতিরিক্ত হইয়াও (Tran-subjective) বিষয়টী নিত্যরূপে আমাদের নিকট প্রতীত হইতেছে। কিন্তু এই ঐক্যবোধের পিছনে যে সংস্কারের ঐক্য বর্ত্তমান সেটা আমরা সম্যক অনুভব করি না বলিয়াই আমাদের জ্ঞান বা সংস্কার হইতে বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লই।

বেদান্ত-প্রজ্ঞার দ্বিতীয় স্তরে এই সংস্কার বোধটী যে একমাত্র বোধ এ কথাটাই আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয়, আর এই সত্যের প্রতীতি হইলে

আমরা ইচ্ছা এবং শ্রদ্ধার স্তর হইতে, জ্ঞানের স্তরে আসিয়া পৌঁছি। এই স্তরে সমস্ত বিশ্বটা আমার সংস্কারের ভিতরে অবরুদ্ধ হয়। এখানে আমার দৃষ্টি বা জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বিষয়ই আমার নিকট সত্য নহে। আমার বিশ্ব আমারই সৃষ্টি, ঈশ্বর, জীব, জন্তু প্রকৃতি আমারই কল্পনা, আমার বীক্ষণই জগতের প্রকাশ, আমার সুষুপ্তিই জগতের প্রলয়। আমি একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্র। এখানে ইহা দ্রষ্টব্য যে দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ সাধারণ বস্তু বিচারের পথকে (Ontology) অতিক্রম করিয়া জ্ঞানবিচারেই (Epistemeology) স্থিতিলাভ করে। পদার্থ বিচারে পদার্থের নিত্যতাই দার্শনিকগণ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করেন, এবং ইহারই ফলে জীব, ঈশ্বর, প্রকৃতির নিত্যতা পদার্থবিচারের দিক দিয়া বৈদান্তিকেরা মানিয়া থাকেন কিন্তু দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদে বিচার-প্রণালীর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ প্রথমেই জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিকাশ ইত্যাদির বিচারেই প্রবৃত্ত হয়। এখানে জ্ঞান বিজ্ঞানই পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ নিত্য জ্ঞান ও সংস্কার ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরই কল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না।

প্রাচীন বেদান্তের পদার্থ-বোধ এবং বিচার স্থলে নব্য বেদান্তে জ্ঞানবোধ এবং বিচারই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দৃষ্টি সৃষ্টিবাদে দুইটী স্তর আছে, একটী স্তরে চেতন সাক্ষী সংস্কারগুলি হইতে অভিন্নরূপে প্রতীত হয়, তাহার ফলে সংস্কারগুলি হইতে আমার জ্ঞান যে একেবারেই বিভিন্ন এই বোধ পরিষ্কার হয় না। এ স্তরে কতকটা বিজ্ঞানবাদের আভাস আছে। বস্তুতঃ যদি বেদান্তপ্রজ্ঞা এবং অনুভূতির এই স্তরেই শেষস্তর হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞানবাদের (Subjective Idealism) সহিত ব্রহ্মবাদ এক হইয়া পড়িত। কিন্তু বেদান্তপ্রজ্ঞার এইশেষ স্তর নহে। ইহার উচ্চ-স্তরে সংস্কার হইতে আত্মার পার্থক্যবোধ ফুটিয়া ওঠে। এই স্তরের সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে—সাক্ষীস্তর। দৃশিস্বরূপসাক্ষী তখন সংস্কারের দ্রষ্টা হইয়া সংস্কার হইতে নিজভেদ অনুভব করে। সমস্ত সংস্কার ও জ্ঞানের ভিতর অধিষ্ঠান জ্ঞানের নিত্য প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়।

হিন্দুর পরিণাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিকদার।

আত্ম-প্রসারণই জীবন—সেই পথ আমাদের অমৃত-সমুদ্রে নিয়ে যাবে। আমাদের সহিত অন্য জাতীয়দের কত পার্থক্য। একজন ইউরোপীয় বা একজন আমেরিকান জানে যে মানুষ যাহা পারিয়াছে বা পারে নাই, সে তাহা পারিবে। সে পৃথিবী ভোগ করিতে জন্মিয়াছে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তাই পৃথিবী তাহার সেবিক ; পৃথিবী কেন, জল, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, বিদ্যুৎ তাহার সেবায় রত। আর আমাদের বিধান মানুষের স্বার্থ-পূজায় সৃষ্ট নিয়মের বন্ধনে মরিতেই মানুষের সৃষ্টি। চর্ম্মকার পুত্রের চর্ম্ম প্রস্তুতই জীবনে একমাত্র অবলম্বন অন্য প্রয়াস পাপার্হ ও দণ্ডার্হ। আমাদের দ্বারা সমাজতত্বের মূল নীতি পদ দলিত। তাই সমাজ আজ Paralysed পক্ষঘাতগ্রস্ত। জীবন্ত সমাজদেহের একস্থানে স্পর্শ করিলে তন্মুহূর্ত্তেই সর্ব্বদেহে অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। আর আমরা যে সমাজ মাতৃগর্ভে জন্মিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি তাহাকে শতধা কর্ত্তন করিয়াছি তাই এ সমাজদেহে অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে অনুভূতি উৎপাদক জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয় না। সমাজবন্ধনের প্রধানতম কারণ যাহাতে সকলে স্ব স্ব জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সহজভাবে সাধিত করিতে পারে এবং বহিঃ শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। আমাদের সমাজে জীবনের উন্নতিপথে পদে পদে বাধা সৃষ্ট। প্রকৃতি দেবী সে অত্যাচার সহ্য করেন না। সহ্য যে করেন না তার জ্বলন্ত প্রমাণ হিন্দু সমাজ। হিন্দুর বর্ত্তমানে আছে কর্ত্তনের, ধ্বংসের নীতি—সে গঠন নীতি অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে। তাই হিন্দু আজ মৃত্যুর পথে। হিন্দু, তোমার পিতৃ-পুরুষগণের সে উদার পবিত্র প্রেমের নীতি ভুলিয়া গিয়াই তোমার এহেন দুর্দ্দশা।

তোমাকে বাঁচিতে হইলে তোমার বেদ বেদান্ত দর্শনাদি নিহিত সত্যকে আবার দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। তোমার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, কবির, চৈতন্য প্রদর্শিত পথে তোমাকে চলিতে হইবে। ঐ পথই জীবনের পথ, উহাতেই মৃত সঞ্জীবনী অমৃত নিহিত। স্মরণ কর তোমার ঋষি ও অবতার পুরুষগণের পূত শিক্ষা। রামের প্রেমালিঙ্গনে বানর, ঋক্ষ, রাক্ষস চণ্ডালনামা অনার্য্যগণ

আর্য্যসহ একত্র বদ্ধ। কৃষ্ণের প্রেমে আর্য্য ও অনার্য্য একত্রীভূত। শুধু মুখে নহে কার্য্যে তিনি কি দেখাইয়াছেন দেখ, পুরাণ সাক্ষ্য দেয় যে তিনি স্বয়ং নাগ জাম্ববান প্রভৃতি অনার্য্যগণের কন্যাকে সহধর্ম্মিণীরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তৎপ্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন অনার্য্যকন্যা উলুপীসহ উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ, বৃকোদর হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসকন্যাসহ পরিণীত। বেদব্যাস অনার্য্য ধীবর কন্যার পুত্র। যে শিক্ষা বেদ বেদান্তে নিহিত যাহা খণ্ডভাবে কৃষ্ণাদির সময় আচরিত এবং পরবর্ত্তী যুগে আর্য্য হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিস্মৃত, মহাপ্রেমিক বুদ্ধের আশ্রয়ে সেই আর্য্য অনার্য্য মিলন ব্যাপকভাবে কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত। পূজনীয় সনাতন আর্য্য ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের সুপক্ক ফল বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আর্য্য অনার্য্য প্রেমের মিলনে চরিতার্থ ও মানব জীবন সুমনোহর পত্রপুষ্পে সুশোভিত, তখনই জগৎবাসী দেখিয়াছিল ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে কত উন্নত হইতে পারে। কৃষ্ণ যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন বুদ্ধের যুগে তাহা সুন্দর বৃক্ষে পরিণত। আরও পূর্ব্বে দেখি ঋষি অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে অনার্য্যগণমধ্যে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের দ্বারা দক্ষিণে একই কার্য্য সম্পাদিত।

বৌদ্ধধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে শঙ্কর বুদ্ধ শিক্ষাত্যাগী কদাচারী নামে মাত্র বৌদ্ধ লোকদিগকে আর্য্য অনার্য্য নির্ব্বিশেষে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। নির্ব্বাক্ বুদ্ধ শঙ্কররূপে সবাক্। শঙ্কর বুদ্ধ প্রচারিত তত্ত্বই প্রচার করিলেন, তাই শঙ্করকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ কহে। অন্য দিকে শাক্তগণ, শৈবগণ তান্ত্রিকগণ, বৈষ্ণবগণ, আর্য্য অনার্য্যগণকে একীভূত করণে বহুল প্রয়াস করিয়াছেন। শক্তিগ্রহণ প্রথা শৈব বিবাহ বাশিষ্ঠ্য পদ্ধতি আর্য্য অনার্য্য রক্তমিশ্রণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। নব্য স্মৃতি দ্বারা মেল বন্ধনের দ্বারা অনেক আর্য্যেতর রক্তকে বিশুদ্ধ করা হইয়াছে। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা গবেষিত হইতেছে যে বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত পাওয়া কঠিন। বাঙ্গালির রক্তে আর্য্যরক্ত অপেক্ষা আর্য্যেতর মঙ্গোলীয় দ্রাবিড়ীয় রক্তের পরিমাণ অধিক। হিন্দুধর্ম্মের আর এক মহনীয় বিশেষত্ব তাহার ক্রোড়ে মূর্খতম, হইতে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠের স্থান আছে। বৃক্ষ ও পশু পূজক হইতে অদ্বৈতবাদী নানা অধিকারীর জীবনের তৃপ্তির ও সার্থকতা লাভের উপায় ও সুযোগ দিতে একমাত্র হিন্দুই সমর্থ। তাই হিন্দুধর্ম্ম জগতের সকল মানবের সাধারণ সম্পদ হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ততম, সে সকলকে এক মাপের কোট পরায় না। ক্রমোন্নতির সহজতম উপায় ইহাতে

কেমন সুন্দরভাবে বর্ত্তমান। বিপ্লব না আনিয়া শান্তভাবে মানব জীবনকে উন্নতির চরম স্থানে নিয়ে যেতে ইহা সমর্থ। তবে যে এতদিন পৃথিবী হইতে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে কিম্বা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইতেছে না—সে পাপে আমরাই পাপী ধর্ম্ম নহে তাহার কারণ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর দ্বারা বর্ত্তমানকালে তাহার পূর্ব্বপুরুষের উদারতম শিক্ষা ত্যাগ ও স্বধর্ম্মিরেরিতার সেবা। আজ যদি হিন্দু শুধু সকলকে কৃষ্ণ বুদ্ধের আদর্শানুসারে সকলকে সামাজিক অধিকার দেব, স্পর্শদোষ দূর করে, তবে হিন্দুর অদৃষ্টাকাশ অচিরাৎ উজ্জল হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে হিন্দু যে ছুৎমার্গকে জীবনের একমাত্র উপাস্য অবলম্বন-রূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহা ইহার জীবনপথে কতটুকু প্রয়োজনীয় এবং ছুৎমার্গ কেন অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা দেখা যাক। পণ্ডিতেরা বলেন, যখন হিন্দুর চারিদিকে অনার্য্য দস্যুর উপদ্রব; তাহারা সর্ব্বদা অনিষ্ট-সাধনেতৎপর আর্য্যের গোধন পুত্র কন্যা স্ত্রী হরণে সর্ব্বদা সচেষ্ট। হিন্দুর প্রাণ বিনাশের সুযোগ পেলেই আহার্য্যে অথবা পানীয়ে অনার্য্যগণ বিষ ও অখাদ্য মিশ্রিত করিত। যজ্ঞাদি নষ্ট করিত এবং নানারূপে উপদ্রব করিত অথবা পরবর্ত্তীকালে অন্য ধর্ম্মিগণ মন্দির বিগ্রহাদি ধ্বংস করিত বা নানারূপে হিন্দুকে অত্যাচার করিত তখন এই সব স্পর্শ দোষাদির সৃষ্টি। শুধু সাময়িক প্রয়োজন আত্মরক্ষার্থে উপায়রূপে অবলম্বিত। যখনই শত্রুগণ বশ্যতা স্বীকার করিত বা বন্ধু ভাবাপন্ন হইত, তখনই স্পর্শ দোষাদি দূর করিয়া তাহাদিগকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করা হইত ইহার ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রমাণ বর্ত্তমান, এখন ত সে অত্যাচার বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। তদ্ধেতু তখনকার যাহা প্রয়োজনীয়, এখন তাহা অনাবশ্য। অনাবশ্য প্রথার সেবা মূর্খতার পরিচায়ক এবং সমাজ-জীবনের অনিষ্টকারক। হিন্দু তোমার জীবনস্রোতে ক্ষণকালের জন্য বাধা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ম্রিয়মাণ হইবার কিছুই নাই। গীতার সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। তিনি তোমাদের কার্য্যের সহায়ক। তাঁহার আগমনের সাড়া জগতে পড়িয়া গিয়াছে। তুমি ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখ, তাঁহার কার্য্যের সহায়ক হইয়া জীবনকে, সমাজকে, দেশকে, জাতিকে ধন্য কর। তাই সংকীর্ণতা ত্যাগ কর, আত্ম প্রসারণে অগ্রসর হও। সংকোচনই মৃত্যু আর প্রসারণই জীবন। ভয় নাই ক্লৈবং মাস্মগম। যাহা তোমার মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ তাহা প্রচার কর। এবার ব্যাপকভাবে সে মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। তাঁহাদের নির্দ্দেশিত আদর্শ সেবাতে তাঁদের আগমনের সার্থকতা ও পন্থানুসারিগণের জীবন কৃতার্থ।

(ক্রমশঃ)

নীলাম্বরের কথা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

শ্রীরাধাগোবিন্দচন্দ্র এম, বি, এ, এ,।

ব্রহ্মরাশির ss তারাটীর হ্রাস-বৃদ্ধির বিবরণ :—

তারিখ	সময়	উজ্জ্বলতা		পর্য্যবেক্ষক	স্থান
৩-১২-২০	০.৫	১৩.৮	অদৃশ্য	গিনোরী	ইটালী।
৫-১২-২০	০.৪	১২.০	দৃশ্য	জ্যাক্কিউস	সুইজারল্যাণ্ড।
৬-১২-২০	০.৩	১১.০	"	"	"
৭-১২-২০	০.১	১১.০	"	চন্দ্র	ভারতবর্ষ।
ঐ	০.৫	১১.০	"	গিনোরি	ইটালি।
৮-১২-২০	০.১	১০.৯	"	চন্দ্র	ভারতবর্ষ।
ঐ	০.৪	১০.৯	"	গিনোরি	ইটালি।
ঐ	০.৬	১০.৯	"	ল্যাকিনী	"
ঐ	০.৬	১০.৮	"	পিকারিং	আমেরিকা।
ঐ	০.৭	১০.৮	"	ম্যাকেটিয়ার	"
৯-১২-২০	০.২	১০.৫	" স্থূলতম	চন্দ্র	ভারতবর্ষ।
১০-১২-২০	০.২	১০.৭	"	"	"
ঐ	০.৪	১০.৭	"	জ্যাক্কিউস	সুইজারল্যাণ্ড।
১১-১২-২০	০.২	১০.৮	"	চন্দ্র	ভারতবর্ষ।
ঐ	০.৫	১০.৮	"	অলকট	আমেরিকা।
১২-১২-২০	০.৪	১০.৮	"	জ্যাক্কিউস	সুইজারল্যাণ্ড।
ঐ	০.৬	১০.৮	"	অলকট	আমেরিকা।
১৩-১২-২০	০.১	১১.০	"	চন্দ্র	ভারতবর্ষ।
১৪-১২-২০	০.২	১১.২	"	"	"
ঐ	০.৪	১১.৭	"	জ্যাক্কিউস	সুইজারল্যাণ্ড।
ঐ	০.৫	১১.৮	"	সেলটেয়ার	আমেরিকা।
১৫-১২-২০	০.৫	১১.৯	"	ক্লেমেণ্ট	ঐ
১৭-১২-২০	০.৩	১৩.৩	"	গিনোরি	ইটালি
১৯-১২-২০	০.৯	১৩.৩	অদৃশ্য	সেলটেয়ার	আমেরিকা।

৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১১দিন মাত্র এই তারাটী আমাদের ৩ ইঞ্চি দূরবীণে দৃশ্য ছিল। ১৭ই ডিসেম্বর গিনোরী তাহার বৃহত্তম দূরবীণে উহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, পরে আর কেহ উহাকে দেখিতে পান নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই তারাটী ৪ দিন মাত্র দৃশ্য ছিল, ঐ সময়ে উহার হ্রাস বৃদ্ধির বিবরণ।

তারিখ		সময়	উজ্জ্বলতা	
৩-২-২৩	রা, ঘ,	৭-০	১১·০	অদৃশ্য।
৭-২-২৩		১১-৩৬	১১·৪	দৃশ্য।
৮-২-২৩		১২-৩০	১১·২	স্থূলতম।
৯-২-২৩	”	৭-১২	১১·৪	দৃশ্য।
১০-২-২৩	”	৭-৩০	১১·৪	”
১১-২-২৩	”	৭-৪২	০১·৪	অদৃশ্য।

মিথুন রাশির U তারাটী গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অদৃশ্য ছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী যে কোন সময়ে উহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং ১৪ই তারিখে প্রায় উজ্জ্বলতম অবস্থার উপনীত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের জ্যোতিষিগণের পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই, হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ঘণ্টায় কিরূপ বৃদ্ধিলাভ করিয়া উহা উজ্জ্বলতম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। আমাদের পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

তারিখ		সময়	উজ্জ্বলতা।	
১২-২-২৩	রা, ঘ,	৭-৩০	অদৃশ্য।	
১৩-২-২৩	”	৭-১২	১২·৬	২৪ ঘণ্টার মধ্যে উজ্জ্বল হইয়াছে।
১৪-২-২৩	”	৭-১২	৯·৪	
”	”	১২-৪৮	৯·৩	
১৫-২-২৩	”	৭-৬	৯·২	উজ্জ্বলতম অবস্থা দুই দিন মাত্র।
১৬-২-২৩	”	৭-৬	৯·২	
১৭-২-২৩	”	৭৬	৯·৩	
১৮-২-২৩	”	৭-৩৬	৯·৭	
১৯-২-২৩	”	৮-৩০	৯·৮	
২১-২-২৩	”	১২-১২	১২·২	
২২-২-২৩	”	১০-১২	১২·২	অদৃশ্য

উত্তর কিরীট রাশির R তারাটী ১৯১৭ খ্রীঃ অঃ এপ্রিল মাস হইতে খ্রীঃ অঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ৬'২ স্থূলত্বে বিদ্যমান ছিল, কেবল মাত্র মধ্যে মধ্যে সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি হইত, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নহে। ১৯২১ খ্রীঃ অঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী উহার জ্যোতি হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কমিয়া ৯'৩ স্থূলত্বে পরিণত হয় পরে উহার জ্যোতি পুনঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৮ই এপ্রিল অক্টোবর তারিখে উজ্জ্বলতম অবস্থা ৬'০ স্থূলত্বে উপনীত হয়, ঐ বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে উহা আর একবার হ্রস্ব জ্যোতি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত উহা স্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

বুধরাশির SU তারাটী ১৯১৬ খ্রীঃ অঃ নভেম্বর মাসে একবার অদৃশ্য অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। সেই সময়ে উহার উজ্জ্বলতা ১৩'৫ হইতেও কম হইয়াছিল এবং প্রায় দুই মাস কাল ঐ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তৎপরে গত সাড়ে ছয় বৎসরের মধ্যে উহার জ্যোতির বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে নাই এবং উহার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ৯'৫ স্থূলত্বে বিদ্যমান আছে।

ধনু রাশির RY তারাটী গত ৫ বৎসর প্রায় অধিকাংশ সময় ৬'৩ হইতে ৭'৪ স্থূলত্বে অবস্থান করিয়াছে তন্মধ্যে ১৯১৮ খ্রীঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে একবার ৬'৩ এবং ১৯২০ খৃঃ অঃ ২৮শে এপ্রিল তারিখের ৭'৪ স্থূলত্ব উল্লেখ-যোগ্য। ১৯২১ খৃঃ অঃ ১৬ই জুন হইতে উহার জ্যোতি কমিতে আরম্ভ করে, ঐ দিন উহার জ্যোতি ৭'৯ ছিল। পরে ধীরে ধীরে কমিয়া ২৯শে সেপ্টেম্বর একবার ১২'০ স্থূলত্বে পরিণত হয়, তৎপরে ১৯২২ খ্রীঃ অঃ ৬ই এপ্রিল একবার ১০'২ স্থূলত্বে উপনীত হইয়াছিল, পরে আবার কমিয়া যায়। পরে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে উহার স্থূলত্ব ৮'৯ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ৮'৯ স্থূলত্ব হইতে উহা পুনরায় হ্রাস পাইতে থাকে এবং অদৃশ্য অবস্থায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। গত নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত উহাকে আর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় নাই। নভেম্বর মাস হইতে ঐ তারাটী সূর্য্য সান্নিধ্য নিবন্ধন পর্য্যবেক্ষণের অনুপযুক্ত আছে।

গরুড় রাশির দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ R তারা (R, Scuti) হ্রদ সর্প রাশির V তারা ও বকরাশির RS তারা ত্রয়ের হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা আছে কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য হারভার্ট মান মন্দিরের অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত যত্ন। করিতেছেন ঐ প্রকার যত্নের ফলে সম্প্রতি হ্রদ সর্প রাশির V তারার হ্রাস বৃদ্ধির কাল নিরূপিত হইয়াছে। হারভার্ট মানমন্দিরস্থ বহুরূপ তারা

পর্য্যবেক্ষক সমিতির সভাপতি ডাঃ ক্যাম্বেল ১৯০৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৯২২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ঐ তারাটীর হ্রাস বৃদ্ধির বিবরণ পর্য্যালোচনা দ্বারায় স্থির করিয়াছেন যে উহার হ্রাস বৃদ্ধির ফল কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অন্তর্গত না হইলেও উহার মধ্যে বেশ একটী শৃঙ্খলা আছে এবং কখনও হ্রাস কখনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে প্রতি ৫৩০ দিনে উহা একবার উজ্জ্বলতম জ্যোতি প্রাপ্ত হয় তাহা হইতে মাত্র ১৬ দিন ১৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে।

মার তারাটী (Mira or o ceti) ১৭ই জানুয়ারী হইতে শুধু চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আগামী ২রা এপ্রিল উহার স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবার কথা কিন্তু যেরূপ দ্রুত উহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে ১৮।২০ দিন পূর্ব্বেই মার চরম উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। আমরা উহার পর্য্যবেক্ষণের যে বিবরণ হারভার্ড মানমন্দিরে এবং ব্রিটিশ অ্যাষ্ট্রনমিক্যেল অ্যাসোসিয়েসনে পাঠাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

তারিখ	সময়	উজ্জ্বলতা	তারিখ	সময়	উজ্জ্বলতা
১৭-১-২৩	রা,ঘ,১০-৩০	৬'৭৭	৯-২-২৩	রা,ঘ, ৮-০০	৩'৭৯
২৭-১-২৩	„ ৮-০০	৫'০১	১০-২-২৩	„ ৮-০০	৩'৭৪
২৯-১-২৩	„ ৯-৩০	৬'৬০	১১-২-২৩	„ ৮-০০	৪'৫৪
৩১-১-২৩	„ ৮-০০	৪'৩৮	১২-২-২৩	„ ৭-২৪	৩'৪৭
২-২-২৩	„ ৭-০০	৪'২০	১৩-২-২৩	„ ৭-৩৬	৩'৪৫
৩-২-২৩	„ ৮-১২	৪'০৩	১৪-২-২৩	„ ৭-২৪	৩'৪৫
৪-২-২৩	„ ৭-১২	৩'৯৩	১৬-২-২৩	„ ৭-১২	৩'২৬
৮-২-২৩	„ ৭-৪৮	৩'৮৪	১৮-২-২৩	„ ৭-০০	৩'২৬
			১৯-২-২৩	„ ৮-১৮	৩'২০
			২৬-২-২৩	„ ৮-১২	২-৯৫
			২৭-২-২৩	„ ৭-৩৬	২'৮৭

ক্ষুদ্র সর্প রাশির R তারাটীও (R Hydrae) আজকাল শুধুচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ৩১শে জানুয়ারী হইতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তারাটী তাহার চরম উজ্জ্বলতা ৪'৫৩ ভোগ করিয়া হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী উহার উজ্জ্বলতা ৪'৮০ হইয়াছিল। বকরাশির চাই তারা (Chi cygni) এবং কাল পুরুষ রাশির U তারা (U. Orionis) এক্ষণে অদৃশ্য আছে।

দানব চক্ষু বা পশুরাশির Bita তারা (Algal or deta persui) সাড়ে তিন ঘণ্টায় স্থূলতম জ্যোতি হইতে হ্রস্বতম জ্যোতিতে পরিণত হয়, পুনঃ সাড়ে তিন ঘণ্টায় হ্রস্বতম জ্যোতি হইতে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হয় এবং ১৮ মিনিট হ্রস্বতম জ্যোতিতে বিদ্যমান থাকে। দানব চক্ষুর এই প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি প্রতি দুই দিন কুড়ি ঘণ্টা উনপঞ্চাশ মিনিটে ঘটিয়া থাকে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী দানবচক্ষুর হ্রাস বৃদ্ধির পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

সময়	উজ্জ্বলতা।	
রা, ঘঃ, ৬-২০	২'৩	চরম উজ্জ্বলতা
৭-১৫	২'৫	
৮-০০	২'৮	
৮-২৫	৩'০	
৯-০০	৩'২	
৯-২৫	৩'৩	হ্রস্বতম জ্যোতি
৯-৫০	৩'৪	
১০-১০	৩'৩	
১০-৪৫	৩'১	

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

কবিরাজ—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

আমি আনন্দের সহিত সকলকে জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত ঔষধটী মহামারী প্লেগের মহৌষধ। আমি যে যে ক্ষেত্রে এই ঔষধটী প্রয়োগ করিয়াছি, সর্ব্বত্রই সফলতা লাভ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সকলেই আশানুরূপ ফল পাইবেন। ঔষধটি এই—

পূর্ণ বয়স্কের জন্য—

১। উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ ১ রতি উত্তম মধুসহ মাড়িয়া কাঁচা হলুদের রসসহ সেবনীয়। প্রাতে, বৈকালে এবং রাত্রি দশটায় ঔষধের সেবনকাল।

ছোট ছেলেদের জন্য এবং বৃদ্ধাদির জন্যে রোগীর বলাবল বিচার করিয়া ঔষধের মাত্রা ব্যবস্থা করণীয়।

২। ফণী মনসা গাছের ভিতরের শাঁস বাটিয়া অগ্নিতে গরমকরতঃ ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় গলার, কুচকীর, বগলের ও অন্যান্য ফোলা গ্রন্থির উপর প্রলেপ দিয়া ভালরূপে বাঁধিয়া দিবেন। দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ ব্যবস্থা।

৩। পুরাতন গব্য ঘৃতসহ কর্পূর মিশাইয়া মস্তকে ও কপালে মালিস করিবেন।

৪। পিপাসায় বাইবিড়ঙ্গের সহ জল সিদ্ধ করিয়া উক্ত ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিতে দিবেন।

কবিরাজ শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী।
Specialist in Insanity
Malda.
(Bengal)

বিগত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যশোহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিগত ১১ই চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ৯৩।২ নং বৈঠকখানা রোডস্থিত শিবকুমার ভবনে "সনাতন ধর্ম্ম সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও তাহার সংরক্ষণের উপায় নির্ণয়। সনাতন ধর্ম্মের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রার্থনীয়। ধর্ম্মই আর্য্য জীবনের মূল।

দিন দিনই আসলের পরিবর্ত্তে নকল। বাজারে সিকি দুয়ানি আধুলি প্রভৃতি জাল হইতেছে, এমন কি সম্প্রতি রঙ্গপুর হইতে জনৈক সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন যে পোষ্টকার্ড জাল হইতেছে! কালের কি পরিবর্ত্তন।
